ছেলেদের মহাভারত

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

ছেলেদের মহাভারত

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৪২

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
আষাঢ় ১৪০২ জুন ১৯৯৫

তৃতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
ভাদ্র ১৪১৪ আগস্ট ২০০৭

প্রকাশক
হুমায়ূন কবীর
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

বানান সমন্বয়
সেলিম আলফাজ

মুদ্রণ
নিজাম প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজস
২/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলংকরণ
সৈয়দ এনায়েত হোসেন

মূল্য
একশত নব্বই টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0141-2

ভূমিকা

উনিশ শতকে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল ষোড়শ শতাব্দীর পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের হাওয়ায়। বাংলা শিশুসাহিত্যও তারই অনুবর্তী। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন সেই সময়ের আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ ও সীমানা-সন্ধানী লেখক। সমসাময়িক যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং তিনি 'বাংলার শিশুসাহিত্যকে বলিষ্ঠতা ও বৈশিষ্ট্য দিয়েছিলেন'। তাঁদের দুজনের আগে শুধুমাত্র বিদ্যাসাগরই খুঁজে পেয়েছিলেন আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের স্বকীয় পথের দিশা। আর সে-পথে এগিয়ে চলে এমন এক দূরদিগন্তবিস্তৃত সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যে খোঁজ পেয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী(১৮৬৩-১৯১৫) এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকার(১৮৬৭-১৯৩৭) যে সাম্রাজ্য অপরিমেয় রসসামগ্রীতে পরিপূর্ণ। বাংলার শিশুকিশোররা তাঁদের কল্যাণেই প্রবেশাধিকার পেতে শুরু করে সেই ঋদ্ধিমান রসসাম্রাজ্যে।

তবে উনিশ শতকে যখন ষোড়শ শতকী পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের হাওয়ায় সমগ্র বাংলাসাহিত্য আধুনিক হয়ে উঠতে শুরু করে তার আগে যে বাঙালি শিশুকিশোররা সাহিত্যের আস্বাদ পেত না, তা নয়; তারা দাদি-নানির মুখে 'বাঘের, ভূতের, সুন্দরী রাজকন্যাদের, দুষ্টু ডাকাতদের, রামায়ণের, মহাভারতের অপূর্ব সব গল্প' বা ছড়া শুনত। ছোটদেরকে দাদি-নানিরা সেই সব গল্প শোনাতেন কখনো ঘুম পাড়ানোর সময়, কখনোবা 'রাতের রান্না শেষ হতে দেরি হলে' তাদের জাগিয়ে রাখার জন্য। তা ছাড়া যাত্রা, কবির লড়াই, পাঁচালী, পালাগান ছিল মধ্যযুগের বাঙালিদের জীবনে বিনোদনের মাধ্যম। এইসব মাধ্যমের লক্ষ্য বড়রা থাকলেও ছোটরাও তার ভাগ পেত। তার কিছুটা বোদগম্য হত তাদের, বুঝত না অনেকটুকুই। সম্ভ্রান্ত পরিবারে বড়রা হয়ত রামায়ণ-মহাভারত সুর করে পড়তেন—সে-সবেরও ভাগ পেত ছোটরা। কিন্তু এ-সবের কোনো কিছুই নিখাদভাবে ছোটদের লক্ষ্য করে, তাদের উপযোগী করে, ভেবেচিন্তে রচনা করা হত না। সুতরাং বলা যায় যে বাংলাসাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা ও সত্যিকারের বাংলা শিশুসাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে হাতধরাধরি করে। কেবল শিশুসাহিত্যের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ, বিষয় ও আঙ্গিকেরই নির্ণয় তথা সীমানা-সন্ধানই উপেন্দ্রকিশোর-যোগীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নয়। বাঙালির সমৃদ্ধ জাতীয় চেতনাকে শিশুসাহিত্যের অভ্যন্তরে চারিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে তাঁরা গভীর স্বাজাত্যবোধেরও পরিচয় দিয়েছিলেন। *ছেলেদের রামায়ণ*, *ছেলেদের মহাভারত*, *মহাভারতের কথা*, *টুনটুনির বই*, *ছোট্ট রামায়ণ* প্রভৃতি বই উপেন্দ্রকিশোরের এই স্বাজাত্যচেতনা থেকেই

জাত; শিশুসাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে ছোটদের জন্য লেখাগুলো তাদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে তাদেরই মনের মত করে। তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে ছবি খুব ভালোবাসে ছোটরা। অথচ তখন ভারতবর্ষে ছবি ছাপার উন্নত ব্যবস্থা ছিল না। এক পর্যায়ে এই অনুভূতিই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে ছবির মুদ্রণ ব্যবস্থা উন্নয়নের গবেষণায় ব্রতী হতে। গবেষণার এক পর্যায়ে তিনি সাফল্যও লাভ করেন। তাঁর গবেষণা এতটাই অগ্রসর হয়েছিল যে তাঁর এতদ্বিষয়ক গবেষণা বিলেতের বিখ্যাত বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা 'পেনরোজ অ্যানুয়েল'-এ সাদরে প্রকাশিত হত।

ছোটদের জন্য বিভিন্ন রচনা সে-সময় যে-ভাবে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ পেত তাতে রচনাগুলো ছোটদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠত না। সেজন্যে উপেন্দ্রকিশোর নিজেই প্রকাশ করেন 'সন্দেশ' পত্রিকা। 'সন্দেশ' পত্রিকায় ছোটদের জন্য লেখাগুলো ছোটদের মনের মত করে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তিনি নিজেও সে-পত্রিকায় ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করেন বিচিত্র বিষয় নিয়ে। উপেন্দ্রকিশোরের রচনার বিষয়বৈচিত্র্য ও 'সন্দেশ' পত্রিকার বিষয়বৈচিত্র্য যুগপৎ আকৃষ্ট করতে থাকে ছোটদের। উপেন্দ্রকিশোরের লেখা গ্রহ-নক্ষত্রের কথা, পশু-পাখি-গাছপালার কথা, প্রাচীন কালের কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাহিনী, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণ-কাহিনী, নানান আবিষ্কারের কাহিনী ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ক রচনার কারণে বাংলা শিশুসাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে এইসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে; বলা চলে বাংলা শিশুসাহিত্যের সীমানাও সেই সঙ্গেই সম্প্রসারিত ও চিহ্নিত হতে থাকে। আর তাই উপেন্দ্রকিশোরকে বাংলা শিশুসাহিত্যের সীমানা-সন্ধানী লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

ছেলেদের মহাভারত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় প্রকাশিত বই। বইটির প্রকাশকাল আনুমানিক ১৮৯৪ সাল। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই ছেলেদের রামায়ণ। পণ্ডিতদের মতে সংস্কৃত ভাষাতে মহাভারতের আগেই রামায়ণ রচিত হয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোরও ছেলেদের মহাভারত—এর আগেই ছেলেদের রামায়ণ রচনা করেছেন। দুটি গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য রয়েছে। রামায়ণের ঘটনা এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তাতে প্রাধান্য পেয়েছে 'ব্যক্তিগত আদর্শবাদ'। পড়তে গিয়ে রামের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পাঠক একাত্ম হয়ে পড়েন। রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গে লীলা মজুমদারের উক্তি প্রাসঙ্গিক বিধায় উদ্ধৃত করছি :

> 'ভক্তরা রামায়ণকে বেদের মতো শ্রদ্ধা করে, দেবতা বলে রামের বন্দনা করেন। কাহিনীর মধ্যে আগাগোড়া একটা সংসারাতীত এবং প্রবল ধর্মভাব দেখা যায়।
>
> *মহাভারত* এর থেকে একটু আলাদা। এই গ্রন্থের বর্ণনা থেকে পাঠকরা পান সমাজ ও রাজনীতির জটিল চিন্তাসমূহকে। পাণ্ডবেরা নানান দেবতার পুত্র বলে পরিচিত, তাঁদের নানা দুঃখে কষ্টে সকলেরই সহানুভূতি হয়, কিন্তু দেবতা বলে তাঁদের কেউ পূজা করে বলে শোনা যায় না। মহাভারতের কাহিনী অনেকটা সাধারণ মানুষের গল্প।
>
> মনে হয় এ-গ্রন্থ কোনো এক জন মানুষের রচনাও নয়, আগাগোড়া এক

সময়ও লেখা নয়। তিন চার হাজার বছর আগে ভারতের ইতিহাসের যেন কয়েকটি অধ্যায়। এমনি বিশাল এর পটভূমিকা যে, সব স্তরের মানুষই কাহিনীতে স্থান পেয়েছে। অজস্র ছোট-ছোট ঘটনা আছে, সেগুলিকে সহজেই মূল ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে মনে হয়। বহু মনস্তত্ত্ব, মতবাদ স্থান পেয়েছে। ন্যায়-অন্যায় কীভাবে এক সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার চমৎকার চিত্র দেখা যায়। কী বৈচিত্র্য ভারতের জীবনে, কত ভিন্ন জাতির সংঘাত, কত পরস্পরবিরোধী মনোভাব। কত দোষে-গুণে, ভালোয়-মন্দে মেশানো মহাভারতের চরিত্রগুলি।

মহাভারতের ঘটনাবলীর বিশালতা-জটিলতা এবং গভীরভাবে খুব সরলভাবে উপস্থাপন করা খুবই কঠিন কাজ। পূর্বোল্লিখিত নানা ধরনের জটিল ধাঁধার কারণে মহাভারত পড়তে গিয়ে বয়স্কজনেরাই পথ হারিয়ে ফেলেন, অথচ সেই জটিল ঘটনা ও চিন্তাপ্রবাহকে কী অনায়াসে আর সরলভাবেই না উপস্থাপন করেছেন উপেন্দ্রকিশোর। অনেক শিক্ষিত বাঙালি পাঠকই হয়ত মহাভারতের বিশালতার কথা চিন্তা করে এর রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকতেন যদি উপেন্দ্রকিশোরের এই বই রচিত-প্রকাশিত না হত। *ছেলেদের মহাভারত*-এর রচনারীতি যেমন সরল, তেমনি উদ্দীপক; *ছেলেদের মহাভারত* পাঠকদের পূর্ণাঙ্গ মহাভারত পাঠে উদ্দীপিত করে।

ছেলেদের মহাভারত রচনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথও খুবই উৎসাহী ও সক্রিয় সহযোগী ছিলেন। বাংলা ১৩১৫ সালে প্রকাশিত *ছেলেদের মহাভারত* বইয়ে গ্রন্থকারের নিবেদন-এ উপেন্দ্রকিশোর জানাচ্ছেন, 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে আমি বিশেষভাবে ঋণী। লিখিবার সময় তাঁহার নিকট উৎসাহ পাইয়াছি, এবং পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত তিনি সংশোধন করিয়া দেওয়াতে পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।'

বাংলা শিশুসাহিত্যের চিরায়ত এই গ্রন্থটি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা সিরিজের আওতায় প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

আহমাদ মাযহার

আদিপর্ব

এখন আমরা যাহাকে দিল্লী বলি, সেই দিল্লীর কাছে অনেক দিন আগে হস্তিনা বলিয়া একটি নগর ছিল।

এই হস্তিনার রাজা বিচিত্রবীর্যের ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু নামে দুই পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বয়সে বড় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অন্ধ ছিলেন। অন্ধ যে, সে রাজ্য পায় না। কাজেই বয়সে বড় হইয়াও ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারিলেন না ; রাজা হইলেন ছোট ভাই পাণ্ডু।

রাজ্য না পাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত হইয়াছিলেন বৈকি। তবুও যদি পাণ্ডুর ছেলে হওয়ার আগে তাঁহার ছেলে হইত, তবু সে দুঃখ তিনি সহিয়া থাকিতে পারিতেন ; কারণ তাঁহাদের মধ্যে যে বড়, তাহারই রাজ্য পাইবার কথা ছিল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের কপালে তাহাও হইল না; পাণ্ডুর আগে ছেলে হইল। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা যখন বুঝিল তাহারা রাজ্য পাইবে না, তখন হইতেই তাহারা প্রাণ ভরিয়া পাণ্ডবদিগকে (অর্থাৎ পাণ্ডুর ছেলেদিগকে) হিংসা করিতে লাগিল।

ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের মধ্যে দুর্যোধন সকলের বড়, তারপর দুঃশাসন, তারপর আরও আটানব্বই জন। সর্বসুদ্ধ তাহারা একশত ভাই। ইহা ছাড়াও দুঃশলা নামে তাহাদের একটি বোনও আছে।

পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র। সকলের বড় যুধিষ্ঠির, তারপর ভীম, তারপর অর্জুন, তারপর নকুল ও সহদেব নামে দুইটি যমজ ভাই। ইঁহারা এক মায়ের ছেলে নহেন। পাণ্ডুর দুই রানী ছিলেন, বড়র নাম কুন্তী, ছোটোর নাম মাদ্রী। যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুন, ইঁহারা কুন্তীর ছেলে ; নকুল ও

সহদেব মাদ্রীর ছেলে। দুই মা হইলে কী হয়? ইহাদের মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল, তেমন ভালোবাসা এক মায়ের ছেলেদের ভিতরেও কম দেখা যায়।

এক-একজন দেবতা পাণ্ডুকে এই সকল পুত্রের এক-একটি দিয়াছিলেন। ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছিলেন, পবন ভীমকে দিয়াছিলেন, ইন্দ্র অর্জুনকে আর অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবতা নকুল ও সহদেবকে। এইজন্য লোকে বলে যে, যুধিষ্ঠির ধর্মের পুত্র, ভীম পবনের পুত্র, অর্জুন ইন্দ্রের পুত্র, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পুত্র। এই সকল দেবতা ইহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

কিন্তু হায় ! এই পৃথিবীতে অল্প দিনই ইহারা সুখে কাটাইতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডু ইহাদের খুব ছোট রাখিয়া হঠাৎ মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় মাতা মাদ্রী তাঁহার কাছে ছিলেন, তিনি মনের দুঃখ সহিতে না পরিয়া পাণ্ডুর চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়া সেই দুঃখ দূর করিলেন। ইহার পর আর এমন কেহই রহিল না যে আপনার বলিয়া মা কুন্তী আর পাঁচটি ভাইয়ের দিকে চায়।

যাহা হউক, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গে রহিলেন। একশ পাঁচটি ছেলের একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খেলা, সবই একসঙ্গে হইতে লাগিল।

খেলার সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা ভীমের হাতে বড়ই নাকাল হয়। ভীমের জ্বালায় উহারা ভালো করিয়া খেলিতে পায় না। খেলা আরম্ভ করিলেই ভীম কোথা হইতে আসিয়া তাহাদের মাথায়-মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়া দেন। উহারা একশ ভাই, ভীম একলা। তবুও উহারা কিছুতেই তাঁহাকে আঁটিতে পারে না। তিনি তাহাদিগকে আছড়িয়া ফেলিয়া চুল ধরিয়া এমনি টান দেন যে, বেচারারা তাহাতে চেঁচাইয়া অস্থির হয়। জলে নামিয়া খেলা করিতে গেলে তিনি তাহাদের দশজনকে একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া ডুব দেন, আর তাহারা আধমরা না হইলে ছাড়েন না। বেচারারা হয়ত ফল পাড়িবার জন্য গাছে উঠিয়াছে, এমন সময় ভীম আসিয়া সেই গাছে লাথি মারিতে থাকেন। লাথির চোটে গাছ এমনি নড়িয়া উঠে যে, ফলের সঙ্গে সঙ্গে উহারাও মাটিতে পড়িয়া যায়। কাজেই উহারা ভীমকে বড়ই হিংসা করে, আর তাঁহার কাছে বড় একটা ঘেঁসে না।

ভীমকে যতই দেখে, দুর্যোধনের মনে ততই ভয় হয়, আর ততই তাহার দুষ্টবুদ্ধি বাড়িয়া উঠে। সে কেবল ভাবে, 'এই ভীমটাকে বড় হইতে দিলেই তো আমাদের সর্বনাশ ! সুতরাং এইবেলা এটাকে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে চলিতেছে না। ভীম মরিলে আর চারিটা ভাইকে বাঁধিয়া রাখিলেই চলিবে।'

দুষ্ট বসিয়া-বসিয়া খালি ঐরূপ ভাবে। তারপর একদিন সে সকলকে বলিল, 'চল আজ গঙ্গাস্নানে যাই।' এই সহজ কথাটার ভিতরে কী ভয়ানক ফন্দি রহিয়াছে, তাহা তো পাণ্ডবেরা জানেন না। তাঁহারা কেবল জানেন যে, গঙ্গায় ঝুটোপাটি করিয়া স্নান করিতে যার-পর-নাই আরাম। সুতরাং গঙ্গাস্নানের কথা শুনিয়া সকলে 'যাইব, যাইব' বলিয়া প্রস্তুত হইলেন।

প্রমাণকোটিতে গঙ্গাস্নানের আায়োজন হইল। প্রমাণকোটি অতি চমৎকার স্থান। গঙ্গার ধারে বাগান আর সুন্দর বাড়ি। জলযোগের আয়োজনটিও সেখানে ভালোমতো হইয়াছে। কাজেই ছেলেদের আনন্দের আর সীমা নাই। বেশি খুশি অবশ্য মিঠাই দেখিয়া। মিঠাই যে তাঁহারা কী আনন্দ করিয়া খাইলেন তাহা কী বলিব ! আবার শুধু নিজে খাইয়া তৃপ্তি হয় না ; যেটা ভালো লাগে সেটা ভাইদের মুখে তুলিয়া দেওয়া চাই।

তাহা দেখিয়া দুর্যোধন ভাবিল, 'এইবার আমার সুবিধা !' তারপর মিষ্ট-মিষ্ট কথা বলিয়া,

আর যার-পর-নাই আদর দেখাইয়া হাসিতে-হাসিতে দুরাত্মা বিষ-মাখানো সন্দেশ ভীমের মুখে তুলিয়া দিল। ভীম কি তাহা জানেন? তিনি সন্দেশের সঙ্গে বিষ খাইয়া ফেলিলেন, কোনো সন্দেহ করিলেন না।

তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান চলিল। শেষে ঝুটোপাটিতে ক্লান্ত হইয়া আর সকলেই কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘরে গেলেন, গেলেন না শুধু ভীম। বিষের তেজে, আর তাহার উপর পরিশ্রমে তিনি এতই দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে গঙ্গার ধারে একটু না শুইয়া থাকিতে পারিলেন না।

সেইখানে ভীম যখন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন, দুর্যোধন ছাড়া আর কেহই জানিতে পারে নাই। ভীম অজ্ঞান হইতেই সেই দুষ্ট লতা দিয়া তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিল।

ভীম জলে ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু ভগবান যাঁহাকে রাখেন, হাজার দুষ্ট লোক মিলিয়াও তাঁহাকে মারিতে পারে না। ভীম ডুবিলেন বটে, আর অন্য স্থানে পড়িলে তিনি মরিয়াও যাইতেন, তাহাতে ভুল নাই। কিন্তু তাঁহাকে যেখানে ফেলিয়াছিল, ঠিক সেইখান দিয়া ছিল পাতালে যাওয়ার পথ ; সেখানে সাপেরা আর তাহাদের রাজা বাসুকি থাকেন। ভীম সেই পাতালের পথ দিয়া ডুবিতে-ডুবিতে একেবারে সেই সাপের দেশে গিয়া পড়িয়াছেন। আর পড়বি তো পড়—একেবারে কতকগুলি সাপের ঘাড়ে। সে বেচারারা তাঁহার চাপে তখন চেপ্টা হইয়া গেল। তখন যে ভারি একটা গোলমাল হইল তাহা বুঝিতেই পার! সাপের দল মহা রাগে আসিয়া ভীমকে যে কী ভয়ানক কামড়াইতে লাগিল তাহা আর বলিবার নয়।

ইহাতে কিন্তু ভীমের লাভই হইল ; কেননা ভীমকে যে বিষ খাওয়ানো হইয়াছিল, সাপের বিষই হইতেছে তাহার ঔষধ। কাজেই সাপের কামড়ে ভীমের গায়ের বিষ কাটিয়া গেল। ভীম চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া দেখেন, এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! তখন তিনি দুই মিনিটের মধ্যে বাঁধন ছিঁড়িয়া, কিল-চড়ের ঘায় সাপের বাছাদের কী দুর্দশাই করিলেন! সে কিল যাহারা খাইল, তাহারা তো মরিয়াই গেল। যাহারা পলাইতে পারিল তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে তাহাদের রাজা বাসুকিকে গিয়া বলিল, 'রাজামহাশয়, সর্বনাশ। একটা মানুষের ছেলে আসিয়া সব মাটি করিল! আপনি শীঘ্র আসুন।'

একথা শুনিয়া বাসুকি ছুটিয়া দেখিতে আসিলেন ব্যাপারখানা কী। আসিয়া দেখেন, কী আশ্চর্য! এ যে ভীম!—'আরে তাই তো! ও ভীম, তুমি যে আমার নাতির নাতি! এস ভাই, কোলাকুলি করি!' এই বলিয়া বাসুকি ভীমকে জড়াইয়া ধরিয়া কতই আদর করিলেন, আর ধনরত্নই বা তাহাকে কত দিলেন।

শুধু তাহাই নহে, ইহার উপর আবার অমৃত। বাসুকির বাড়িতে অমৃতের ভাণ্ডার ছিল চৌবাচ্চার পর চৌবাচ্চা সারি সারি সাজানো, তাহা ভরিয়া খালি অমৃত রহিয়াছে। সাপেরা ভীমকে সেই অমৃতের কাছে নিয়া বলিল, 'যত ইচ্ছা খাও।'

ভীম এক নিঃশ্বাসে এক চৌবাচ্চা খালি করিয়া দিলেন। তারপর আর এক নিঃশ্বাসে আর এক চৌবাচ্চা। আর এক নিঃশ্বাসে আর এক চৌবাচ্চা। এমনি করিয়া আট চৌবাচ্চা অমৃত খাইয়া ফেলিলেন, আর পেটে ধরে না। যেমন খাওয়া তেমন বিশ্রামটি তো চাই। ভীম আট চৌবাচ্চা অমৃত খাইয়া আটদিন যাবৎ কেবল ঘুমাইলেন।

যুধিষ্ঠির স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিবার সময় ভীমকে দেখিতে পাইলেন না বটে ; কিন্তু সেজন্য

তখন তাঁহার মনে বেশি চিন্তা হইল না। তিনি ভাবিলেন, হয়ত ভীম আগেই চলিয়া আসিয়াছেন। বাড়ি ফিরিয়া মাকে প্রণাম করিয়া যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, ভীম যে আমাদের আগেই চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকে তো দেখিতেছি না! তুমি কি তাহাকে কোথাও পাঠাইয়াছ?'

একথা শুনিয়া কুন্তী নিতান্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন, 'সে কী কথা বাবা! আমি তো ভীমকে দেখিতে পাই নাই! হায় হায়! কী হইবে? শীঘ্রই তাহার খোঁজ কর!'

তখনি বিদুরকে ডাকানো হইল। বিদুর যুধিষ্ঠিরের কাকা হন। এমন সরল সাধু লোক পৃথিবীতে খুব কমই জন্মিয়াছেন। বিদুর আসিলে কুন্তী সকল কথা তাঁহাকে জানাইয়া শেষে বলিলেন, 'বুঝি বা দুর্যোধনই আমার ভীমকে মারিয়া ফেলিল! ও দুষ্ট ভীমকে বড়ই হিংসা করে।'

বিদুর বলিলেন, 'বৌদিদি, চুপ চুপ! আপনার একথা দুর্যোধন শুনিতে পাইলে বড়ই বিপদ ঘটাইবে। ভীমের জন্য আপনি কোনো চিন্তা করিবেন না। আমি ব্যাসদেবের মুখে শুনিয়াছি যে, আপনার ছেলেরা অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিবে। ব্যাসের কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? আপনার কোনো ভয় নাই। নিশ্চয়ই ভীম ফিরিয়া আসিবে।' এই বলিয়া বিদুর চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় কুন্তী আর তাঁহার পুত্রগণের মনের দুঃখ ঘুচিল না।

এদিকে ভীমও আটদিনের লম্বা ঘুমের শেষে জাগিয়া উঠিয়াছেন। অমৃত খাইয়া তাঁহার শরীরে দশ হাজার হাতির বল হইয়াছে। সাপেরা তাঁহাকে স্নান করাইয়া, সাদা কাপড় আর সাদা মালা পরাইয়া, পায়স রাঁধিয়া খাওয়াইয়া, পরম আদরের সহিত প্রমাণকোটির স্নানের জায়গায় রাখিয়া গেল। সেখানে আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি আসিলেন।

মরা ছেলে বাঁচিয়া উঠিলে মা-বাপ যেমন খুশি হয়, ভীমকে পাইয়া সকলে তেমনি খুশি হইলেন। তারপর তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'ভাই, সাবধান! এসব কথা যেন আর কেহ না জানে।'

তখন হইতে পাঁচ ভাই যার-পর-নাই সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন আর দুর্যোধনের মামা শকুনি কত রকমে যে তাঁহাদিগকে হিংসা করেন, তাঁহারা সে-সব জানিতে পারিয়াও চুপ করিয়া থাকেন। এইরূপ করিয়া দিন যাইতে লাগিল।

শিশুকাল হইতেই লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের ছেলেরা ধনুর্বিদ্যা (অর্থাৎ ধনুক দিয়া তীর ছোঁড়া) শিখিতে আরম্ভ করে। যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতি সকলে একসঙ্গে কৃপাচার্য নামক একজন খুব ভালো শিক্ষকের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন ছেলেরা শহরের বাহিরে একটা লোহার গোলা লইয়া খেলা করিতেছিল। খেলিতে-খেলিতে গোলাটা একটা শুকনো কুয়ার ভিতর পড়িয়া গেল। ছেলেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাহা তুলিতে পারিল না। গোলা তুলিতে না পারিয়া অপ্রস্তুত হইয়া তাহারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছে, এমন সময় সেইখান দিয়া একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন। ছিপছিপে কালো-হেন লোকটি, পাকা চুল, হাতে তীর-ধনুক। ছেলেদের দুর্দশা দেখিয়া তিনি হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'দুয়ো! দুয়ো! তোমরা ক্ষত্রিয় হইয়া এই গোলাটা তুলিতে পরিলে না! দুয়ো! দুয়ো! আমাকে কী খাইতে দিবে বল, আমি গোলা তুলিয়া দিতেছি। গোলাও তুলিব, আর আমার এই আংটি কুয়ায় ফেলিতেছি, তাহাও তুলিব।' এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার আংটিটিও কুয়ায় ফেলিয়া দিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি যদি গোলাটা তুলিতে পারেন, তবে চিরকাল খাইতে পাইবেন।'

ব্রাহ্মণ হাসিতে-হাসিতে একমুঠা শর লইলেন। তারপর একটি শর গোলায় বিঁধাইয়া সেই শরের পিছনে আর একটি শর বিঁধাইয়া, তাহার পিছনে আবার আর একটি—এমনি করিয়া কুয়ার মুখ অবধি লম্বা একটি লাঠি প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। সেই লাঠি ধরিয়া গোলা টানিয়া তুলিতে আর কতক্ষণ লাগে!

ছেলেরা আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'আচ্ছা, আংটিটি তুলুন তো!' ব্রাহ্মণ তীর ধনুক লইয়া দেখিতে-দেখিতে আংটিটিও তুলিয়া আনিলেন। ছেলেরা তো অবাক! তখন তাহারা হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তারপর বলিল, 'আপনি নিশ্চয় কোনো মহাপুরুষ হইবেন। বলুন আপনি কে, আর আমরা আপনার কোন্ কাজ করিব।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না। তোমরা তোমাদের ঠাকুরদাদা মহাশয়ের নিকট গিয়া বল যে, এইরকম এক বুড়ো ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন।'

অমনি সকলে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের ঠাকুরদাদা ভীষ্মের নিকট সংবাদ দিল। ভীষ্ম সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, 'বুঝিয়াছি, দ্রোণাচার্য আসিয়াছেন। এ আর কাহারও কর্ম নহে।' ভীষ্মের অনেকদিন হইতেই ইচ্ছা, ছেলেদিগকে দ্রোণাচার্যের হাতে দেন। সেই দ্রোণাচার্য আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত। ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়া ভীষ্ম তাঁহাকে পরম আদরের সহিত বাড়িতে লইয়া আসিলেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ ইঁহারা অতি মহৎ লোক ছিলেন। ইঁহাদের খালি নাম পরিচয় শুনিলে হইবে না, উঁহাদের কথা আরও বেশি করিয়া জানা চাই। দেবতাদের মধ্যে আটজনকে বসু বলে। এই বসুরা একবার তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে লইয়া সুমেরু পর্বতের কাছে একটি সুন্দর বনে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই বনে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম ছিল। বশিষ্ঠের একটি গাই ছিল, তাহার নাম নন্দিনী। এমন একটি গরু আর কখনো হয় নাই, হইবেও না। যত দুধ চাই, নন্দিনী তত দুধই দিত। তার সে আশ্চর্য দুধ একবার খাইলে দশ হাজার বৎসর সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকা যাইত।

বসুদের মধ্যে একজনের নাম দ্যু। তাঁহার স্ত্রীর বড়ই ইচ্ছা হইল গাইটি লইয়া যাইবেন। উনশীর রাজার কন্যা জিতবতী তাঁহার সখি। সখিকে একবার এই গরুর দুধ খাওয়াইতে পারিলে তিনি দশ হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিবেন। আহা, তাহা হইলে কী সুখের কথাই হইবে!

দ্যু-র স্ত্রী যতই একথা ভাবেন, ততই তাঁহার গাইটির জন্য মন পাগল হয়, আর ততই তিনি তাঁহার স্বামীকে পীড়াপীড়ি করেন, 'ওগো, লইয়া চল। লইয়া চল গাইটি আর বাছুরটি।'

ইহার কথায় শেষে বসুরা আট ভাই মিলিয়া বাছুর-সুদ্ধ গাইটিকে চুরি করিলেন।

বশিষ্ঠ ফল-মূল আনিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি নন্দিনীকে লইয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু মুনিরা ধ্যানে সকল কথা জানিতে পারেন। কাজেই তাঁহার চোর ধরিতে বেশি বিলম্ব হইল না। তিনি বসুদিগকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, 'তোরা দেবতা হইয়া এমন কর্ম করিলি, এজন্য তোরা মানুষ হইয়া পৃথিবীতে জন্মাইবি।'

বসুদের আটজনের মধ্যে দ্যু-রই অধিক দোষ ছিল, অন্যদের দোষ তত নহে। তাই শেষে বশিষ্ঠ দয়া করিয়া বলিলেন, 'অপর সাতজন এক বৎসর মানুষ থাকিয়াই আবার দেবতা হইতে পারিবে, কিন্তু দ্যু-কে যত বৎসর মানুষ বাঁচে, তত বৎসরই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে।'

এখন বসুরা তো নিতান্ত সঙ্কটে পড়িলেন। মুনির কথা মিথ্যা হইবার নহে, কাজেই তাঁহাদিগকে মানুষ হইয়া জন্মিতে হইবে। সুতরাং আর উপায় না দেখিয়া তাঁহারা গঙ্গাদেবীকে বলিলেন, 'মা, পৃথিবীতে যদি জন্মিতেই হয়, তবে যে-সে বাপ-মায়ের ছেলে হইয়া যেন আমরা না জন্মাই, এমনি করিয়া দাও। হস্তিনার রাজা প্রতীপের শান্তনু নামক অতিশয় ধার্মিক পুত্র হইবেন, আমরা তাঁহারই পুত্র হইব। আর আমাদের মা হইবে তুমি নিজে। আমাদের জন্য, মা, তোমাকে মানুষ হইয়া পৃথিবীতে যাইতেই হইতেছে। তোমার সঙ্গে আমাদের এই কথা রহিল যে, আমাদের জন্মের পরেই তুমি আমাদিগকে জলে ফেলিয়া দিবে।'

বসুগণের মিনতি দেখিয়া গঙ্গা তাঁহাদের কথায় রাজি হইলেন।

পরম ধার্মিক রাজা প্রতীপ গঙ্গার ধারে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গাদেবী একটি পরমা সুন্দরী কন্যা হইয়া তাঁহার কোলে গিয়া বসিলেন। প্রতীপ চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া নিতান্ত আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে মা, বৌমার মতোন আসিয়া আমার কোলে বসিলে? আমার পুত্র হইলে তাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব।' গঙ্গা বলিলেন, 'আচ্ছা দিবেন, কিন্তু আমার একটি কথা রাখিতে হইবে। আমি যখন যাহা করিব, হাজার মন্দ বোধ হইলেও আপনার পুত্র তাহাতে বাধা দিতে বা তাহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে পারিবে না।'

রাজা একথায় সম্মত হইবামাত্র গঙ্গা আকাশে মিলাইয়া গেলেন।

প্রতীপের পুত্র হইলে তাঁহার নাম শান্তনু রাখা হইল। শান্তনু দেখিতে যেমন সুন্দর ছিলেন, ধর্মে-বিদ্যায়-স্বভাবে এবং অন্য সকল গুণেও তেমনি। তাহা দেখিয়া প্রতীপ মনের সুখে তাঁহার হাতে রাজ্যের ভার দিয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তাঁহাকে বলিলেন, 'বাবা, একটি দেবতার মেয়ে আমার বৌমা হইতে রাজি হইয়াছিলেন। তাঁহার দেখা পাইলে তাঁহাকে বিবাহ করিবে, আর তাঁহার মন বুঝিয়া সর্বদা চলিতে চেষ্টা করিবে। তাঁহার কোনো কাজে কখনো বাধা দিও না, বা অসন্তুষ্ট হইও না।'

যুদ্ধের কাজটা রাজাদের খুব ভালো করিয়াই শিখিতে হয়, আর সর্বদা তাহার অভ্যাস রাখিতে হয়। এইজন্য শিকার তাঁহাদের একটা খুব দরকারী কাজের মধ্যে। শান্তনু শিকার করিতে বড় ভালোবাসিতেন। একদিন শিকার করিতে করিতে তিনি গঙ্গার ধারে আসিয়া একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। এমন সুন্দর মানুষ তিনি আর কখনো দেখেন নাই। তাঁহার এত ভালো লাগিল যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শান্তনু বলিলেন, 'আপনি কি দেবতা, না মানব, না অপ্সরা, না যক্ষ? আপনাকে আমার রানী করিতে পারিলে বড়ই সুখী হইব।'

সেই মেয়েটি আর কেহই নহেন, গঙ্গা। গঙ্গা বলিলেন, 'মহারাজ, আমি আপনার রানী হইব ; কিন্তু আমার একটি নিয়ম আছে—আমার কোনো কাজে আপনি বাধা দিতে পারিবেন না বা অসন্তোষ দেখাইতে পারিবেন না। যদি কখনো বাধা দেন বা অসন্তুষ্ট হন, তবে তখনই আমি চলিয়া যাইব।'

শান্তনু এই নিয়মে রাজি হইয়া পরমা সুন্দরী রানী লইয়া ঘরে ফিরিলেন। তারপর তাঁহাদের দিন খুবই সুখে যায়।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা ভারি দুঃখের বিষয় হইয়া উঠিল। রাজার দেবকুমারের মতোন সুন্দর

এক-একটি ছেলে হয়, আর অমনি রানী তাঁহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেন। দুঃখে রাজার বুক ফাটিয়া যায়, তবুও কিছু বলিবার সাহস পান না, পাছে রানী বলেন, 'আমি চলিলাম।'

একটি নয়, দুটি নয়, রানী ক্রমে সাতটি ছেলে এইভাবে জন্মের পরে গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন। সাতবার রাজা চুপ করিয়া দুঃখ সহ্য করিলেন। তারপর যখন আর একটি ছেলে হইল, তখন রানী হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার প্রাণে আর কত সহ্য হইবে? এই একটি ছেলেকে রাখিতে পারিলেও বুঝি তাঁহার প্রাণ একটু শীতল হয়। এই ভাবিয়া তিনি সকল কথা ভুলিয়া এবারে রানীকে বাধা দিলেন। বলিলেন, 'হায় হায়, এটিকে মারিও না! কেন তুমি এত নিষ্ঠুর হইলে? এমন পাপ কি করিতে আছে?'

রানী বলিলেন, 'মহারাজ, এই লও তোমার ছেলে। কিন্তু নিয়মের কথা মনে আছে তো? আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক!'

তখন গঙ্গা তাঁহার নিজের কথা আর আটজন বসুর কথা রাজাকে বুঝাইয়া বলিয়া আর ছেলেটি তাঁহাকে দিয়া আকাশে মিলাইয়া গেলেন। সে ছেলেটির দেবব্রত আর গাঙ্গেয় এই দুই নাম রাখা হইল। দেবব্রত খুব ছোট থাকিতেই শান্তনু তপস্যা করিতে বনে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গার ধারেই সেই বন। সেখানে অনেক বৎসর ধরিয়া শান্তনু তপস্যা করিলেন। ততদিনে দেবব্রত বেশ বড় হইয়া উঠিলেন। রূপে-গুণে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে এই পৃথিবীতে দেবব্রতের সমান কেহ রহিল না।

এমন সময় একদিন দেবব্রত হরিণ শিকারে বহির হইয়াছেন। আর একটা হরিণ তাঁহার তীর খাইয়া পলায়ন করাতে, তাহাকে ধরিবার জন্য তিনি ভয়ানক তীর ছুড়িয়া গঙ্গার জল প্রায় শুষিয়া ফেলিয়াছেন।

সেইখানে শান্তনু থাকেন। হঠাৎ গঙ্গার জল কেন শুকাইয়া গেল, তাহা জানিতে গিয়া দেবব্রতের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। কিন্তু দেবব্রত তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। যাহা হউক, শান্তনুর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সুন্দর কুমারটি কে। তিনি গঙ্গাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার পুত্রকে আবার দেখাও।'

'তখন গঙ্গা দেবব্রতকে শান্তনুর নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, এই তোমার সেই পুত্র। এ এখন বড় হইয়াছে। এই কুমার দেবতাদের অতিশয় প্রিয়পাত্র। বশিষ্ঠের নিকট সকল বেদ আর বৃহস্পতি ও শুক্রের নিকট সকল শাস্ত্র পড়িয়াছে। পরশুরাম ধনুর্বিদ্যা যত জানেন, সব ইহাকে শিখাইয়াছেন। ইহাকে লইয়া তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও।'

এমন সুন্দর পুত্র পাইয়া রাজা মনের সুখে আবার রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, আর কিছুদিন পরেই তাঁহাকে যুবরাজ করিয়া দিলেন।

ইহার মধ্যে একদিন শান্তনু বনের ভিতর বেড়াইতে গিয়া দেবতার মতো সুন্দরী একটি কন্যা দেখিতে পাইলেন। সেই কন্যার দেহের এমনি অপরূপ সৌরভ যে, সমস্ত বন তাহাতে ভরিয়া গিয়াছে। রাজা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?'

কন্যা বলিল, 'আমি জেলের মেয়ে।'

মেয়েটির নাম সত্যবতী। আসলে সে জেলের নিজের মেয়ে নহে; জেলে তাহাকে একটা মাছের পেটের ভিতরে পাইয়া মানুষ করিয়াছিল। লোকে জানে যে, সে জেলেরই মেয়ে।

যাহা হউক, রাজা অবিলম্বে সেই জেলের কাছে গিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার মেয়েকে

বিবাহ করিতে চাই।'

জেলে বলিল, 'ইহার যে ছেলে হইবে, তাহাকে যদি আপনার সমস্ত রাজ্য দেন, তবে বিবাহ দিব, নহিলে দিব না।'

যদিও সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিতে রাজার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তথাপি দেবব্রতকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও রাজ্য দিতে তিনি কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং সত্যবতীকে না লইয়া নিতান্ত দুঃখের সহিত তাঁহাকে ঘরে ফিরিতে হইল। সে দুঃখ এতই যে, তিনি তাহাতে দিন-দিন রোগা হইয়া যাইতে লাগিলেন।

দেবব্রত ভাবিলেন, 'তাই তো, বাবাকে কেন এমন দেখিতেছি?' একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, কী হইয়াছে?'

রাজা বলিলেন, 'আর কী হইবে বাবা? তোমার জন্যই ভাবি। তোমার পাছে কোনো অসুখ হয়; তাই আমার চিন্তা।'

দেবব্রত বুড়া মন্ত্রীকে বলিলেন, 'মন্ত্রীমহাশয়, বাবার তো বড়ই অসুখ।' মন্ত্রী সকল কথাই জানেন। তিনি সেই জেলের মেয়ের কথা দেবব্রতকে বলিলেন।

একথা শুনিবামাত্র অমনি দেবব্রত সবান্ধবে সেই জেলের নিকট গিয়া বলিলেন, 'আমার পিতার সহিত আপনার মেয়ের বিবাহ দিন।'

জেলে দেবব্রতকে অতিশয় আদর করিয়া বলিল, 'রাজপুত্র, আপনি যাহা বলিলেন, আমার পক্ষে তাহার চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কী হইতে পারে? কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে, এই বিবাহ হইলে শেষে একটা বিষম ঝগড়া-ঝাটির কারণ হইবে। আপনার মতো বীরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কী আর কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে?'

দেবব্রত বুঝিলেন যে, পাছে রাজ্য লইয়া সত্যবতীর ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার ঝগড়া হয়, জেলে সেই ভয় করিতেছে। তিনি তখনি বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আপনার নাতিদের ঝগড়া হইবার কোনো ভয় থাকিবে না কারণ আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি রাজ্য লইব না, আপনার নাতিই আমাদের রাজা হইবে।'

জেলে বলিল, 'রাজপুত্র, আপনি অতি মহাশয় লোক। আপনি যে আপনার কথামতো কাজ করিবেন, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আপনার ছেলেরা তো একথায় রাজি না হইতেও পারেন।'

দেবব্রত বলিলেন, 'আমার যদি ছেলেই না হয়, তবে তো আর সে রাজ্য চাহিতে আসিবে না। আমি আবার এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি বিবাহ করিব না।'

একথায় জেলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিল, 'তবে আপনার পিতাকেই মেয়ে দিব।'

এদিকে আকাশ হইতে দেবতারা দেবব্রতের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর তিনি যে ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার নাম দিলেন 'ভীষ্ম' অর্থাৎ ভয়ানক লোক। তখন হইতে সকলে তাঁহার দেবব্রত নাম ছাড়িয়া তাঁহাকে ভীষ্ম বলিয়া ডাকিত।

জেলের অনুমতি লইয়া ভীষ্ম সত্যবতীকে বলিলেন, 'মা, রথে উঠুন, ঘরে যাই।'

এইরূপে ভীষ্ম সত্যবতীকে আনিয়া পিতার সহিত বিবাহ দিলেন। শান্তনু তাঁহার এই কাজে কত খুশি হইলেন, বুঝিতে পার। তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া বর দিলেন, 'তোমার মরিতে ইচ্ছা না হইলে কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না।'

সত্যবতীর চিত্রাঙ্গদ আর বিচিত্রবীর্য নামে দুটি পুত্র জন্মিবার পর শান্তনুর মৃত্যু হয়। তখন চিত্রাঙ্গদ বড় হইয়াছেন, বিচিত্রবীর্য শিশু। ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদকে রাজা করিলেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই এক গন্ধর্বের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইল। বিচিত্রবীর্যের তখনো রাজা হওয়ার বয়স হয় নাই ; কাজেই ভীষ্ম তাঁহার হইয়া রাজ্যের কাজ দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে বিচিত্রবীর্যের বিবাহের বয়স হইল। ভীষ্ম শুনিতে পাইলেন যে, কাশীরাজের তিন কন্যা, অম্বা, অম্বিকা আর অম্বালিকার স্বয়ংবর হইবে। স্বয়ংবর কী? না, নিজে দেখিয়া বিবাহ করা। দেশ–বিদেশের রাজাদিগকে ডাকিয়া মস্ত সভা হয়; কন্যা মালা হাতে সেই সভাতে আসিয়া যাঁহার গলায় সেই মালা পরাইয়া দেন তাঁহার সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ হয়। ইহারই নাম 'স্বয়ংবর'। স্বয়ংবরের কথা শুনিয়া ভীষ্ম ভাবিলেন যে, তিনটি মেয়েকে আনিয়া তাঁহার ভাইয়ের সহিত বিবাহ দিবেন।

কাশীরাজের বাড়িতে স্বয়ংবরের সভা আরম্ভ হইয়াছে। আর তাঁহার কন্যাদের রূপগুণের কথা শুনিয়া ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজাই তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার আশায় সেখানে আসিয়াছেন। এমন সময় ভীষ্ম তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ' আমি আমার ভাইয়ের জন্য এই মেয়ে তিনটিকে চাহিতেছি। ক্ষত্রিয়ের মেয়েদের যে কেবল স্বয়ংবর করিয়াই বিবাহ হয় তাহা তো নহে, বিবাহ অনেক রকমেই হইতে পারে। তাহার মধ্যে জোর করিয়া মেয়ে লইয়া গিয়া বিবাহ দিতে পারিলেই লোকে খুব ভালো বলিয়া থাকে। সুতরাং এই দেখ, আমি জোর করিয়া মেয়ে লইয়া যাইতেছি। তোমরা পার তো আমাকে আটকাও।'

এই বলিয়া তিনি মেয়ে তিনটিকে রথে তুলিয়া চলিলেন। রাজারা সকলে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাদিগকে রাখিতে পারিলেন না। সে সময়ে রাজা শাল্ব প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্মের হাতে তাঁহার খুবই দুর্দশা হইল।

তারপর ভীষ্ম সেই তিনটি মেয়েকে যার–পর–নাই আদরের সহিত বাড়িতে আনিয়া বিচিত্রবীর্যের সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময় অম্বা বলিলেন, আমি শাল্বকে ভালোবাসি, আর মনে–মনে তাঁহাকেই বিবাহ করিয়াছি।'

একথায় অম্বাকে ছাড়িয়া দিয়া অম্বিকার আর অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হইল। সেই অম্বিকার ছেলে ধৃতরাষ্ট্র আর অম্বালিকার ছেলে পাণ্ডু। ভীষ্ম এমনি মহাপুরুষ ছিলেন।

আর দ্রোণও নিতান্ত কম লোক ছিলেন না। দ্রোণ অর্থাৎ কলসির ভিতর জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম দ্রোণ, তিনি ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। দ্রোণ অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন, সকল রকম বিদ্যা, বিশেষত ধনুর্বিদ্যা খুব ভালোরূপেই শিখিয়াছিলেন। তারপর পরশুরামের নিকট তাঁহার সমস্ত অস্ত্র পাইয়া তিনি এমন হইয়াছিলেন যে, যুদ্ধে তাঁহার সামনে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না।

পাঞ্চাল দেশের রাজা পৃষতের পুত্র দ্রুপদের সহিত দ্রোণের ছেলেবেলায় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তখন দ্রুপদ দ্রোণকে বলিয়াছিলেন, 'বন্ধু, আমি রাজা হইলে, সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার যাহা কিছু সব তোমারও হইবে।' সেই ছেলেবেলার কথা দ্রোণের মনে ছিল।

বড় হইয়া দ্রোণ কৃপাচার্যের ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং অশ্বত্থামা নামে তাঁহার একটি পুত্র

হয়। দ্রোণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন ; ছেলেকে দুধ কিনিয়া খাওয়াইবার শক্তি তাঁহার ছিল না ; অন্য ছেলেদিগকে দুধ খাইতে দেখিয়া একদিন অশ্বত্থামা কাঁদিতে লাগিলেন। সেই ছেলেরা পিটালি-গোলা জল আনিয়া তাঁহাকে বলিল, 'এই দুধ খাও।' অশ্বত্থামা সেই পিটালির জল খাইয়াই 'দুধ খাইয়াছি' বলিয়া নাচিয়া অস্থির। তখন ছেলেরা হাততালি দিয়া বলিল, 'ছিঃ-ছিঃ! তোর বাপের পয়সা নাই, তোকে দুধ কিনিয়া দিতে পারে না!'

ইহাতে দ্রোণের মনে খুব কষ্ট হওয়ায় তিনি দ্রুপদের সেই ছেলেবেলার কথাগুলি মনে করিয়া ভাবিলেন, 'একবার বন্ধুর কাছে যাই, এ দুঃখ দূর হইবে।'

দ্রোণ অনেক আশা করিয়া দ্রুপদের কাছে গেলেন। কিন্তু দ্রুপদ আর সে-দ্রুপদ নাই ; বড় হইয়া রাজ্য পাইয়া তিনি আর-একরকম হইয়া গিয়াছেন।

দ্রোণ বলিলেন, 'বন্ধু, সেই যে তুমি বলিয়াছিলে রাজা হইলে আমাকে কত সুখে রাখিবে, তাই আমি আসিয়াছি।'

দ্রুপদ বলিলেন, 'বল কী ঠাকুর! আমি রাজা, আর তুমি ভিখারী। তুমি নাকি আবার আমার বন্ধু! ছেলেবেলায় তোমাকে কী বলিয়াছি তাহা কে মনে রাখিয়াছে? চাও তো তোমাকে একবেলা চারিটা খাইতে দিতে পারি।'

এইরূপ অপমান পাইয়া দ্রোণ সেখান হইতে হস্তিনায় চলিয়া আসিলেন, আর মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ইহার শোধ লইতে হইবে।

হস্তিনায় আসিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির, দুর্যোধন প্রভৃতির গুরু হইলেন। তাঁহাদিগকে তিনি বলিলেন, 'বাছাসকল, আমি খুব ভালো করিয়া তোমাদিগকে ধনুর্বিদ্যা শিখাইব। কিন্তু শেষে তোমাদিগকে আমার একটা কাজ করিয়া দিতে হইবে।'

একথায় সকলেই চুপ করিয়া রহিল, কেবল অর্জুন বলিলেন, 'হ্যাঁ গুরুদেব, আপনার কাজ অবশ্যই করিয়া দিব।'

আহা, এই কথাগুলি না জানি বুড়ার কাছে কতই মিষ্ট লাগিয়াছিল! তিনি অর্জুনকে জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে তাঁহাকে ভিজাইয়া দিলেন। রাজপুত্রদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। দ্রোণের কাছে শিক্ষা পাইবার লোভে বাহিরেরও দু-একটি রাজপুত্র আসিলেন। আর একটি ছেলে আসিলেন, তাঁহার নাম কর্ণ। লোকে বলে কর্ণ অধিরথ নামক এক সারথির ছেলে।

কর্ণের সঙ্গে প্রথমেই অর্জুনের শত্রুতা হইয়া গেল। কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে বড়ই রেষারেষি করেন, আর দুর্যোধনের সঙ্গে জুটিয়া যুধিষ্ঠির আর তাঁহার ভাইদিগকে অপমান করেন।

যাহা হউক, অর্জুনের সমান কেহই শিখিতে পারিল না। শিখিবার জন্য তাঁহার যত্ন দেখিয়া দ্রোণ বলিলেন, 'তোমাকে এমন ভালো করিয়া শিখাইব যে, তোমার সমান বীর আর পৃথিবীতে কেহ থাকিবে না।'

ছেলেদের শিক্ষা বেশ ভালো করিয়াই হইল। দুর্যোধন আর ভীম গদা খেলায় খুব মজবুত হইলেন, নকুল আর সহদেব খড়্গে, রথ চালাইতে যুধিষ্ঠির, আর ধনুকে যে অর্জুন, তাহা বুঝিতেই পার। ভীম আর অর্জুনের ক্ষমতা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আর হিংসায় বাঁচে না।

ইহাদের পরীক্ষা লইবার জন্য দ্রোণ চুপি-চুপি এক কারিগরকে দিয়া একটি নীল পক্ষী-প্রস্তুত করাইলেন। তারপর সেটাকে এক গাছের আগায় রাখাইয়া, রাজপুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা তীর ধনুক লইয়া প্রস্তুত হও। এক-একবার এক-একজনকে আমি তীর

ছুঁড়িতে বলিব। আমার কথা শেষ হইতে-না-হইতে তাহাতে ঐ পাখিটার মাথা কাটিয়া ফেলিতে হইবে।'

সকলের আগেই যুধিষ্ঠিরের ডাক পড়িল। যুধিষ্ঠির ধনুক উঠাইয়া পাখির দিকে তাকাইয়া প্রস্তুত।

দ্রোণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী দেখিতেছ?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'গাছ দেখিতেছি, আপনাদের সকলকে দেখিতেছি, আর পাখিটাকে দেখিতেছি।'

ইহাতে এই বোঝা গেল যে, যুধিষ্ঠিরের নজর ঠিক হয় নাই, তিনি এদিক-ওদিক তাকাইতেছেন। কাজেই একথা শুনিয়া দ্রোণ মুখ সিঁটকাইয়া বলিলেন, 'তবে তুমি পারিবে না, তুমি সরিয়া দাঁড়াও।'

এইরূপে এক-একজন করিয়া সকলেই আসিলেন, সকলেই লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া গেলেন।

শেষে আসিলেন অর্জুন। তাঁহাকেও দ্রোণ ধনুক উঠাইয়া পাখির দিকে তাকাইতে বলিয়া তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী দেখিতেছ?'

অর্জুন বলিলেন, 'আমি কেবল পাখিই দেখিতে পাইতেছি, আর তো কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।'

দ্রোণ বলিলেন, 'সমস্ত পাখিটাই দেখিতে পাইতেছ?'

অর্জুন বলিলেন, 'না, পাখির কেবল মাথাটুকু দেখিতেছি, আর কিছু না।' এইবার দ্রোণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তবে তীর ছাড়।'

কথাটা ভালো করিয়া শেষ হইতে-না-হইতেই অর্জুন তীর ছাড়িয়া দিলেন, আর কাটা মাথাসুদ্ধ পাখিও মাটিতে পড়িয়া গেল।

এমন আশ্চর্য শিক্ষা কি সকলের হয়? দ্রোণের আনন্দ আর ধরে না। তিনি অর্জুনকে বুকে চাপিয়া মনে মনে ভবিতে লাগিলেন, 'আমার পরিশ্রম সার্থক হইল! অর্জুন আমার কাজ করিয়া দিতে পারিবে।'

আর একদিন স্নানের সময় দ্রোণকে কুমিরে ধরিল। সে ভয়ংকর কুমির দেখিয়া রাজপুত্রদের বুদ্ধিসুদ্ধি কোথায় যে চলিয়া গেল, তাঁহারা খালি ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন; নড়িবার-চড়িবার ক্ষমতা রহিল না। অর্জুন কিন্তু ইহার মধ্যে ঝকঝকে পাঁচটি বাণ মারিয়া কুমিরকে খণ্ড-খণ্ড করিয়াছেন।

দ্রোণ ইচ্ছা করিলেই কুমিরকে মারিয়া চলিয়া আসিতে পারিতেন। কিন্তু রাজপুত্রদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহা না করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, 'রাজপুত্রগণ, বাঁচাও!' অর্জুনের বুদ্ধি আর সাহস দেখিয়া তিনি তাঁহাকে 'ব্রহ্মশিরা' নামক একটি আশ্চর্য অস্ত্র উপহার দিলেন। এটি বড় ভয়ংকর অস্ত্র। তাই দ্রোণ অর্জুনকে সেই অস্ত্র ছাড়িবার আর থামাইবার সংকেত শিখাইয়া দিয়া, তারপর সাবধান করিয়া দিলেন, 'দেখিও যেন মানুষের উপর এ অস্ত্র কদাচ ছাড়িও না, তাহা হইলে সব ভস্ম হইয়া যাইবে। কোনো দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ হইলেই এ অস্ত্র ছাড়িতে পার।'

অর্জুন গুরুকে প্রণাম করিয়া জোড়হাতে অস্ত্রখানি লইলেন।

এমনি করিয়া রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হইল। সকলেই বড় বড় বীর হইয়াছেন। এখন

সকলকে ডাকিয়া ইঁহাদের বিদ্যার পরীক্ষা দেখাইবার সময় উপস্থিত। পরীক্ষার আয়োজন খুব ধুমধামের সহিত হইতে লাগিল। একদিকে প্রকাণ্ড মাঠে শতশত রাজমিস্ত্রী খাটিতেছে, আর একদিকে পরীক্ষার সংবাদ লইয়া দূতেরা দেশ-বিদেশে ঢোল পিটাইয়া ফিরিতেছে। লোকের উৎসাহের আর সীমা নাই। বুড়া ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত বলিলেন, 'এতদিনে অন্ধ বলিয়া আমার মনে দুঃখ হইতেছে, এমন খেলা আমি দেখিতে পাইলাম না!'

পরীক্ষার দিন উপস্থিত। লোকজন যে কত আসিয়াছে তাহার সীমাসংখ্যা নাই। নিশানে, ঝালরে, মণি-মুক্তায় সভাটি ঝলমল করিতেছে। খেলার জায়গা, অস্ত্র রাখিবার জায়গা, বাজনাদারদের জায়গা, স্ত্রীলোকদের বসিবার জায়গা, রাজ-রাজড়াদের বসিবার জায়গা, সাধারণ লোকের বসিবার জায়গা—সব এমন করিয়া সাজানো আর গুছানো যে, দেখিলে আশ্চর্য বোধ হয়। লোকের কোলাহল আর বাজনার শব্দ মিশিয়া সমুদ্রের গর্জনকে হারাইয়া দিতেছে। সভার মধ্যে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, কৃপাচার্য এবং আরো সকলে আসিয়াছেন। মেয়েদের জায়গায় কুন্তী,গান্ধারী (দুর্যোধনের মা) প্রভৃতি সকলের দাসী চাকরানী লইয়া উপস্থিত। এমন সময় দ্রোণাচার্য তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গভূমি অর্থাৎ খেলার জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চুল সাদা, দাড়ি সাদা, ধুতি সাদা, চাদর সাদা। বুকের উপর সাদা পৈতা, গলায় সাদা ফুলের মালা, গায়ে শ্বেতচন্দন।

তারপর সকলের আগে দেবতার পূজা হইলে, চাকরেরা অস্ত্রশস্ত্র আনিয়া রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিল।

এদিকে রাজপুত্রেরা সাজগোজ করিয়া প্রস্তুত। প্রত্যেকের পরনে সুন্দর দামী পোশাক, কোমরে কোমরবন্ধ, আঙুলে আঙুলপোষ (অর্থাৎ আঙুল বাঁচাইবার জন্য চামড়ার ঢাকনা), হাতে ধনুক, পিঠে তূণ। যুধিষ্ঠির সকলের বড় বলিয়া সকলের আগে, তারপর যিনি যত ছোট তিনি তত পিছনে এমনি করিয়া তাঁহারা রঙ্গভূমির দিকে আসিতে লাগিলেন। রাজপুত্রদের সুন্দর পোশাক আর উজ্জ্বল চেহারা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল, তারপর তাঁহারা নানারকম অস্ত্র ছুড়িতে আরম্ভ করিলে অনেকে খুব ভয়ও পাইল।

সেদিন দুর্যোধনের আর ভীমের গদার খেলা বড়ই অদ্ভুত হইয়াছিল এমন খেলা আর কেহ কখনো দেখে নাই। তাঁহারা বাহবাও পাইয়াছিলেন যতদূর পাইতে হয়। এদিকে তাঁহাদের হাতির মতো গর্জন শুনিয়া দ্রোণ একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার পরেই হয়ত ইহারা চটিয়া গিয়া মুশকিল বাধাইবেন। কাজেই তাড়াতাড়ি ইঁহাদিগকে থামাইয়া দিতে হইল।

তারপর অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া লোকের আনন্দ আর ধরে না। কেহ বলে, 'আরে, ঐ অর্জুন!' কেহ বলে, 'ইনি ভারি যোদ্ধা!' কেহ বলে, 'ইনি বড়ই ধার্মিক!'

অর্জুন কী আশ্চর্য খেলাই দেখাইলেন! একবার অগ্নি-বাণে ভীষণ আগুন জ্বালিয়া তিনি সকলের ত্রাস লাগাইয়া দিলেন। তাহার পরেই আবার বরুণ-বাণে জলের বন্যা বহাইয়া আগুন নিভাইয়া ফেলিলেন; এখন সকলে তল না হইলে বাঁচে! তখনই আবার বায়ু-বাণ ছুটিল; অমনি জল উড়িয়া গিয়া সব পরিষ্কার ঝরঝরে। পর্জন্যাস্ত্রে তার পরের মুহূর্তেই মেঘ আসিয়া আকাশ অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

ভৌমাস্ত্র মারিয়া তিনি মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। পর্বতাস্ত্র মারিয়া কোথা হইতে এক বিশাল পর্বত আনিয়া ফেলিলেন। তারপর যখন অন্তর্ধান-অস্ত্র মারিলেন, তখন আর কেহই

তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কত আর বলিব ! অর্জুন সবাইকে অবাক করিয়া তবে ছাড়িলেন।

এইরূপে খেলা প্রায় শেষ হইয়াছে, বাজনা থামিয়াছে, সকলে বাড়ি যাইবে, এমন সময় ফটকের কাছে ও কীসের গর্জন? সকলে বলিল, 'এ কি বাজ্র পড়িল? না পর্বত ফাটিল?'

বাজও পড়ে নাই, পর্বতও ফাটে নাই। উহা কর্ণের হুংকার, আর কিছুই নহে। কর্ণকে যেমন-তেমন লোক মনে করিও না। কেহ বলে তিনি সূর্যের পুত্র, কেহ বলে অধিরথ নামক সারথির পুত্র। কিন্তু তিনি আসলে কুন্তীর পুত্র, অধিরথের নহেন। কুন্তী কর্ণের মা হইয়াও তাঁহার প্রতি মায়ের কাজ করেন নাই, জন্মিবার পরেই তিনি তাঁহাকে ফেলিয়া দেন।

সেই শিশুটিকে অধিরথ কুড়াইয়া পাইয়া তাহার স্ত্রী রাধার নিকট আনিয়া দিল, আর দুইজনে মিলিয়া পরম যত্নে তাঁহাকে মানুষ করিতে লাগিল। নিজেদের ছেলেপিলে নাই; তাই এমন সুন্দর শিশুটিকে পাইয়া তাহারা ভাবিল, যেন দেবতা দয়া করিয়া তাহাদিগকে একটি পুত্র দিলেন। তখন হইতে লোকে ভাবে যে, কর্ণ অধিরথ আর রাধার ছেলে। কর্ণও ইহাদিগকে পিতা-মাতার মতো মান্য করেন আর ভালোবাসেন। তিনি জানেন না যে, তিনি যুধিষ্ঠিরের ভাই।

জন্মাবধি কর্ণের কানে কুণ্ডল আর পরনে কবচ—অর্থাৎ বর্ম বা যুদ্ধের পোশাক। দেখিতে তিনি খুব উচু, খুব সুন্দর, আর খুবই ফরসা, গায়ে সিংহের মতো জোর। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে 'ইনি কে', 'ইনি কে' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কর্ণ বড়ই অহংকারী। আর জানই তো, অর্জুনের সঙ্গে তাঁহার কেমন শক্রতা। তাই তিনি অর্জুনের প্রশংসা সহিতে না পারিয়া রাগের ভরে নিজের ক্ষমতা দেখাইতে আসিয়াছেন। আর যথার্থই তাঁহার ক্ষমতা কম ছিল না। কারণ অর্জুন যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তিনিও করিয়া দেখাইলেন। তারপর তিনি বলিলেন, 'আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিব।' ইহাতে সভার মধ্যে ভারি একটা হুলস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। একদিকে দুর্যোধন কর্ণকে প্রশংসা করিতেছেন আর পাণ্ডবদিগকে অপমানের কথা বলিতেছেন, অপরদিকে অর্জুন তাহা সহিতে না পারিয়া রাগে কাঁপিতেছেন। একটা খুনোখুনি না হইয়া যায় না। নিজের দুই পুত্রের অমন ভাব দেখিয়া ভয়ে আর দুঃখে কুন্তী ইহার মধ্যে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন!

এমন সময় কৃপাচার্য কর্ণকে বলিলেন, 'বাপু, যুদ্ধ যে করিবে তাহা তো বুঝিলাম। কিন্তু রাজার ছেলে তো আর যাহার তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না। আগে বল দেখি, তুমি কোন্ রাজার বংশে জন্মিয়াছ আর তোমার বাপ-মায়ের বা কী নাম?'

কৃপের কথা শুনিয়া লজ্জায় কর্ণের মাথা হেঁট হইল। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন বলিলেন, 'রাজা হইলেই তো যুদ্ধ হইতে পারে, আচ্ছা, আমি এখনই কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যের রাজা করিয়া দিতেছি।' তখনই জল আসিল, ব্রাহ্মণ আসিল; আর তখনি কর্ণকে স্নান করাইয়া, ছাতা ধরিয়া, খৈ ছড়াইয়া, চামর দুলাইয়া, সোনা আর ফুল দিয়া জয়-জয় শব্দে রাজা করিয়া দেওয়া হইল। কর্ণ ইহাতে চিরদিনের তরে দুর্যোধনের বন্ধু হইয়া গেলেন।

এদিকে সেই সারথি অধিরথ সংবাদ পাইয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে পাগলের মতো সেখানে ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া কর্ণ তাঁহার সেই রাজার সাজসুদ্ধ উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রণাম করিতে গেলেন, কিন্তু অধিরথ ব্যস্ত হইয়া নিজের চাদর দিয়া পা ঢাকিয়া রাখিল। তারপর 'বাপ' বলিয়া কর্ণকে আদর করিতে করিতে বুড়া চোখের জলে তাঁহার গা ভাসাইয়া দিল।

তাহা দেখিয়া ভীম বলিলেন, 'সারথির ছেলে, তুই অর্জুনের হাতে প্রাণটা কেন দিতেছিস? ততক্ষণ রাশ ধর গিয়ে যা!'

তখন রাগে কর্ণের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। দুর্যোধন পাগলা হাতির মতো ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'কর্ণ রাজা হওয়াতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তবে আসিয়া যুদ্ধ কর।'

ভাগ্যিস তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, নহিলে সেদিন কী হইত কে জানে! সন্ধ্যা হওয়ায় কাজেই সকলকে ঘরে ফিরিতে হইল, বিপদও কাটিয়া গেল।

শিক্ষা শেষ হইলে গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়। রাজপুত্রদেরও শিক্ষা শেষ হইয়াছে, এখন দক্ষিণা দিবার সময়। দ্রোণ রাজপুত্রদিগকে বলিলেন, 'তোমরা পঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদকে আনিয়া দাও, উহাই আমার দক্ষিণা।'

সেকথায় রাজপুত্রেরা তখনি দ্রোণকে লইয়া দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিলেন। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ইহাদিগকে পাণ্ডবদের আগে যুদ্ধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত দেখা গেল। ইচ্ছা যে, বাহাদুরিটা তাঁহাদেরই হয়। পাণ্ডবদের তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না, কাজেই তাঁহারা দ্রোণের সঙ্গে একটু পিছনে থাকিলেন। কিন্তু দুর্যোধনেরা অনেক যুঝিয়াও বেশি কিছু করিতে পারিলেন না এবং পঞ্চালেরাই যেন 'মার-মার' করিয়া খুবই তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাদের গর্জন এমনই ভয়ংকর হইয়া উঠিল যে, তাহা শুনিয়া অর্জুন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। দ্রোণকে লইয়া পাণ্ডবেরা যুদ্ধে নামিলেন; কিন্তু দ্রুপদের লোকেরা তবুও ভয় পাইল না। ভীমের গদায় কত হাতি-ঘোড়ার মাথা ফাটিল, রথ চুরমার হইল, সৈন্য পিষিয়া গেল। অর্জুনের বাণেও কত হাতি-ঘোড়া সিপাহী-সৈন্য কাটিল, তাহার লেখাজোখা নাই। কিন্তু দ্রুপদ কাবু হওয়া দূরে থাক, বরং ভীম-অর্জুনকে প্রশংসা করিয়া আরো ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেনাপতিরাও কম যুদ্ধ করিলেন না।

যাহা হউক, অর্জুনের হাতে ক্রমে-ক্রমে সকলকেই জব্দ হইতে হইল। শেষে রহিলেন কেবল দ্রুপদ। তাঁহার ধনুক, নিশান সারথি সব গিয়াছে। তখন অর্জুন ধনুক বাণ ফেলিয়া তলোয়ার হাতে সিংহনাদ পূর্বক এক লাফে তাঁহার রথে উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদ মন্ত্রীসহ ধরা পড়িলেন, তাঁহার লোকজন পলাইয়া গেল, কাজেই যুদ্ধও মিটিল। ভীমের কিন্তু এমন একটুখানি যুদ্ধ একেবারে ভালো লাগিল না, তাঁহার ইচ্ছা আরো অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন।

দ্রুপদকে দ্রোণের নিকট উপস্থিত করা হইলে দ্রোণ তাঁহাকে বলিলেন, 'দ্রুপদ, তোমার রাজ্যও গিয়াছে, নগরও গিয়াছে; তোমার প্রাণ অবধি আমাদের হাতে। এখন আমাদের বন্ধু তার খাতিরে তুমি কী চাহ বল।'

তারপর তিনি হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'ভয় নাই, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষমা করাই আমাদের স্বভাব। তাহা ছাড়া শিশুকাল হইতে তোমাকে ভালোবাসি; এখন তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুতাই করিতে চাহি। তোমার রাজ্য এখন আমার হাতে, আমি তাহার অর্ধেক তোমাকে দিয়া অর্ধেক রাখিব। কেননা, আমার একটু রাজ্য না থাকিলে আবার তুমি বলিবে, 'তুই গরিব, তোর সাথে বন্ধুতা করিব না।" এখন হইতে গঙ্গার দক্ষিণ ধারে তোমার, উত্তর ধারে আমার অধিকার হইল। কী বল?'

দ্রুপদ আর কী বলিবেন? এইটুকু যে পাইয়াছেন, এই তো ঢের বলিতে হইবে। কাজেই তিনি সবিনয়ে দ্রোণকে ধন্যবাদ দিয়া দুঃখের সহিত ঘরে ফিরিলেন। সেই অবধি তাঁহার এই চিন্তা

হইল যে, কী করিয়া দ্রোণকে মারিতে পারা যায়।

ইহার পর এক বৎসর চলিয়া গেল, ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করিলেন। যুধিষ্ঠির এমনই ধার্মিক, সরল, দয়ালু আর শান্ত ছিলেন যে, তাঁহার গুণে রাজ্যের সকল লোক মোহিত হইয়া গেল। এদিকে ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব মিলিয়া বাহিরের শত্রুদিগকে এমনি শাসনে রাখিলেন যে, তাঁহারা আর মাথা তুলিতে সাহস পায় না। আর তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে এমন হিংসা হইল যে, রাত্রিতে তাঁহার আর ঘুম হয় না।

শেষে আর থাকিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার মন্ত্রী কণিককে ডাকাইয়া বলিলেন, 'মন্ত্রী, এই পাণ্ডবদের বাড়াবাড়ি তো আর আমি সহিতে পারিতেছি না। বল দেখি ইহার উপায় কী?'

কণিক বলিলেন, 'মহারাজ, ইহারা আর বেশি বড় না হইতেই এইবেলা ইহাদিগকে মারিয়া ফেলুন।'

একদিকে কণিকের এইরূপ পরামর্শ, আর একদিকে দুর্যোধনের পীড়াপীড়ি। রাজ্যের লোকেরা খালি যুধিষ্ঠিরই বলে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, ভীষ্ম রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছেন; কাজেই সকলে এমন গুণবান যুধিষ্ঠিরকে পাইয়া তাঁহাকে রাজা করিতে চাহিতেছে। এ সকল কথা যেন কাঁটার মতো দুর্যোধনের বুকে যাইয়া বিঁধিতে লাগিল। তিনি কর্ণ, শকুনি (দুর্যোধনের মামা) ও দুঃশাসন প্রভৃতিকে লইয়া পরামর্শ করিলেন যে, পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিতে হইবে।

এইরূপ যুক্তি আঁটিয়া দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'বাবা, আর তো সহ্য হয় না। আপনি আর ভীষ্ম থাকিতে ইহারা নাকি যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিতে চাহে। পাণ্ডবদের কাছে হাতজোড় করিয়াই কি শেষটা আমাদের থাকিতে হইবে? তাহা হইলে আর নরকে যাওয়ার বাকি কী রহিল? বাবা, এ অপমান হইতে কি রক্ষা পাওয়া যায় না?'

দুর্যোধনের কথায় ধৃতরাষ্ট্রের মন আরো খারাপ হইয়া গেল। তখন দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন ইহারা বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি একটিবার যদি বুদ্ধি করিয়া ইহাদিগকে বারণাবতে পাঠাইতে পারেন, তবেই আমাদের আপদ দূর হয়।'

ধৃতরাষ্ট্রের ইহাতে খুবই মত। ভয় শুধু এই যে, পাছে ইহাতে রাজ্যের লোক চটিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে আসে। তাহাতে দুর্যোধন বলিলেন, 'ভয় কী? টাকাকড়ি তো সব আমাদেরই হাতে। আমরা টাকা দিয়া সকলকে বশ করিব। একটিবার কুন্তী আর তাঁহার পাঁচটা ছেলেকে বারণাবতে পাঠাইয়া দিন। তারপর আমরা সব হাত করিয়া লইতে পারিলে যেন উহারা ফিরিয়া আসে।'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'আমারও তো তাহাই মনে হয়। কিন্তু কাজটা কিনা ভালো নয়, তাই ভয় করি, পাছে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপ ইহারা চটিয়া মুশকিল বাধান।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'ভীষ্মের কাছে তো আমরা যেমন পাণ্ডবরাও তেমনি, অশ্বত্থামা আমার পক্ষের লোক, কাজেই তাহার বাবা দ্রোণ আর মামা কৃপাচার্যও আমাদের পক্ষেই থাকিবেন। তারপর একা বিদুর আমাদের কী করিবেন।

এইরকম তাহাদের পরামর্শ হয়; আর এদিকে টাকা দিয়া লোকজনকে বশ করিবার চেষ্টাও চলে। তারপর একদিন ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শে তাঁহাদের লোকেরা সভায় বসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বারণাবত যে কী চমৎকার জায়গা, কী বলিব। আর সেখানকার শিবের মন্দিরে এই সময় বড়ই ধুমধাম; দেশ-বিদেশের লোক পূজা করিতে আসিয়াছে।'

এই সকল কথা শুনিয়া পাণ্ডবদের বারণাবত যাইতে খুব ইচ্ছা হইল। তাহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'বাছাসকল, শুনিতেছি এটা নাকি বড়ই সুন্দর স্থান, পৃথিবীতে এমন স্থান আর নাই। তা তোমাদের ইচ্ছা থাকিলে তোমরা সপরিবারে একবার সেখানে গিয়া পরম সুখে বাস কর। তারপর আবার ফিরিয়া আসিও।'

ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্ট বুদ্ধি যুধিষ্ঠিরের বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু কী করেন! চারিদিকেই ধৃতরাষ্ট্রের লোক, পাণ্ডবদের হইয়া দু'কথা বলিবার কেহ নাই। কাজেই তিনি রাজি হইলেন। তারপর তিনি ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, গান্ধারী আর ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রভৃতি সকলের নিকট গিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, 'জ্যাঠামহাশয়ের কথায় আমরা বারণাবত চলিলাম, আপনারা আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন।'

তাঁহারা সকলে বলিলেন, 'ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া আসিও; তোমাদের যেন কোনো অনিষ্ট না হয়।'

পাণ্ডবদের বারণাবত যাওয়া স্থির হইয়াছে দেখিয়া দুর্যোধনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি গোপনে পুরোচন নামক তাঁহাদের একজন মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পুরোচন, তোমার মতো আমাদের বন্ধু কে আছে? এই যে রাজ্য দেখিতেছ, ইহা কেবল আমার নহে তোমারও। একটা কাজ করিতে হইবে। সাবধান! কাহাকেও বলিও না। বাবা পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে পাঠাইতেছেন। তুমি গাড়ি হাঁকাইয়া উহাদের ঢের আগেই সেখানে চলিয়া যাও। সেখানে গিয়া শহরের এক পাশে, নির্জন স্থানে, গাছপালার আড়ালে একটি বাড়ি করিবে। গালা, ধুনা, চর্বি, তেল, শন, কাঠ এমনি জিনিস দিয়া বাড়িটি প্রস্তুত হওয়া চাই, যাহাতে আগুন ছোঁয়াইবামাত্রই তাহা দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। সাবধান! যেন বাড়ি দেখিয়া কেহ টের না পায় যে, তাহাতে এমন কোনো জিনিস আছে। তারপর কুন্তীকে তাঁহার পাঁচ ছেলেসুদ্ধ নিয়া সেই বাড়িতে রাখিবে। দিনকতক খুব আদর দেখাইয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবে। শেষে একদিন রাত্রিকালে পাণ্ডবেরা নিশ্চিন্তে ঘুমাইবার সময় বাড়িতে আগুন দিয়া তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারিবে। তাহা হইলে লোকে ভাবিবে, হঠাৎ আগুন লাগিয়াছে; আমাদিগকে কেহ সন্দেহ করিবে না।' দুষ্ট পুরোচন এককথায় 'যে আজ্ঞে' বলিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে পাণ্ডবদের যাত্রার সময় উপস্থিত, রথ প্রস্তুত। পাণ্ডবেরা গুরুজনদের প্রণাম, সমান বয়সীদের সঙ্গে কোলাকুলি, ছোটদিগকে আশীর্বাদ আর প্রজাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া রথ ছাড়িয়া দিলেন। বিদুর প্রভৃতি কয়েকজন লোক অতিশয় দুঃখের সহিত কিছু দূর তাঁহাদের পিছু পিছু চলিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র দুষ্ট লোক, তাই এমন কাজ করিল। পাণ্ডবেরা তো কোনোদিন তাহাদের কোনো ক্ষতি করে নাই। আর ভীষ্মকেই বা কী বলি? তাঁহার চোখের সামনে এমন অধর্ম হইল, আর তিনি চুপ করিয়া রহিলেন? আইস, আমরা যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে চলিয়া যাই।'

যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'দেখুন, জ্যেঠামশায় আমাদের গুরু লোক, তাঁহার কথা শুনিয়া চলা আমাদের উচিত। আপনারা আমাদের পরম বন্ধু, আমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া এখন ঘরে ফিরুন। ইহাতে শেষে আমাদের উপকার হইবে।'

একথায় তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে আশীর্বাদ করিয়া ঘরে ফিরিলেন। বিদুর এতক্ষণ চুপি-চুপি আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া সময় বুঝিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,

'যুধিষ্ঠির, বিপদ আসিলে বুদ্ধিমান লোক তাহা এড়াইবার চেষ্টা করেন। গর্তের ভিতরে থকিলে আগুনে পোড়াইতে পারে না। লোহার অস্ত্র নয়, কিন্তু তাহাতে শরীর কাটে; তাহার কথা যে জানে, শত্রুরা তাহাকে মারিতে পারে না। অন্ধ হইলে দেখিতে পায় না, ব্যস্ত হইলে বুদ্ধি ঠিক থাকে না। এইটুকু বলিলাম, বুঝিয়া লও। চলাফেরা করিলেই পথ জানা যায়, নক্ষত্র দিয়া দিক ঠিক করা যায়, আর নিজের মন বশে থাকিলে ভয়ে কাবু হইতে হয় না।'

এই কথাগুলি বিদুর যে কী-রকম একটা ভাষায় বলিলেন, কেহ তাহার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কেবল যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'বুঝিয়াছি।'

সকলে চলিয়া গেলে কুন্তী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, বিদুর যে কী বলিলেন, আর তুমি বলিলে "বুঝিয়াছি"; আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মা, দুর্যোধন নাকি আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিতে চাহে। তাই কাকা আমাদের সাবধান করিয়া দিলেন, আর সর্বদা পথ-ঘাটের খবর লইতে আর ভালো হইয়া চলিতে বলিলেন।'

তারপর কিছুদিন পথ চলিয়া তাঁহারা বারণাবতে পৌঁছিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া সেখানকার লোকদিগের খুবই আনন্দ হইল। পাণ্ডবেরা নিতান্ত গরিবদেরও বাড়ি-বাড়ি গিয়া দেখা করিলেন। পুরোচন তো প্রথমেই আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জুটিয়াছে। তাঁহাদিগকে পাইয়া যেন সে কতই খুশি। দুষ্টের মুখে হাসি আর ধরে না—কুমিরের মতো তাহার দাঁত খালি বাহির হইয়াই আছে। পাণ্ডবদিগকে আগে সে অন্য একটা সুন্দর বাড়িতে খুব আদরের সহিত দশদিন রাখিয়া তারপর তাঁহাদিগকে সেই গালার বাড়িতে উপস্থিত করিল। সে বাড়িতে গিয়াই যুধিষ্ঠির চুপি-চুপি ভীমকে বলিলেন, 'ভাই, আমি চর্বি আর গালার গন্ধ পাইতেছি। বাড়িটা নিশ্চয়ই গালা, চর্বি, শুকনো বাঁশ প্রভৃতি জিনিসে তৈরী। দুষ্ট আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য এখানে আনিয়াছে। বিদুর কাকা ইহার কথা জানিতে পারিয়াই আমাকে ওরূপ বলিয়াছিলেন।'

একথা শুনিয়া ভীম বলিলেন, 'তবে আসুন, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'না, আমাদের এখানে থাকাই ভালো। এখন চলিয়া গেলে উহারা আর কোনো ফন্দি করিয়া আমাদিগকে মারিবে। তাহার চেয়ে এই ঘর পোড়াইবার সময় উহাদিগকে ফাঁকি দিয়া আমরা পলাইয়া গেলে লোকে ভাবিবে আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিয়াছে। সেকথা শুনিলে ভীষ্ম, দ্রোণ ইঁহারাও ইহাদের উপর খুব বিরক্ত হইবেন। এখন হইতে খুব শিকার করিয়া বেড়াইলে আমরা পথ-ঘাট সবই জানিতে পারিব, আর পলাইবার সময় কোনো মুশকিল হইবে না। আজই এই ঘরের ভিতরে একটা গর্ত খুঁড়িয়া আমরা তাহার মধ্যে থাকিব ; তাহা হইলে আর আগুনের ভয় থাকিবে না।'

ইহার মধ্যে একদিন একটি লোক চুপি-চুপি যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া বলিল, 'বিদুর মহাশয় আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি প্রাণ দিয়া আপনাদের কাজ করিব। আপনারা আসিবার সময় তিনি ম্লেচ্ছ ভাষায় আপনাকে কিছু বলেন, তাহার উত্তরে আপনি বলেন যে, "বুঝিলাম"।—এই কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমি যথার্থই বিদুরের লোক। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে পুরোচন এই ঘরসুদ্ধ আপনাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার যুক্তি করিয়াছে। এখন কী করিতে হইবে, বলুন ; আমি খুব ভালো গর্ত খুঁড়িতে পারি।'

লোকটিকে দেখিয়াই যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিলেন যে, এ ব্যক্তি খুব সরল ও ধার্মিক। তিনি

তাহাকে বলিলেন, 'আমি বেশ বুঝিয়াছি তুমি ভালো লোক, আর কাকা তোমাকে পাঠাইয়াছেন। এখন যাহাতে আমরা এ বিপদে রক্ষা পাই তাহাই কর।'

সেই লোকটি ঘরের মধ্যে নর্দমা কাটিবার ছল করিয়া এক প্রকাণ্ড গর্ত খুঁড়িয়া ফেলিল। পাণ্ডবেরা দিনের বেলায় শিকার করিয়া বেড়াইতেন ; রাত্রিতে সেই গর্তের ভিতরে সাবধানে লুকাইয়া থাকিতেন। গর্তের মুখ এমনভাবে লুকানো ছিল যে, না জানিলে তাহা টের পাওয়া অসম্ভব। উহার কথা খালি পাণ্ডবেরা জানিতেন, আর যে গর্ত খুঁড়িয়াছিল সে জানিত, আর কেহই জানিত না।

ক্রমে সেই কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী আসিল, সেদিন পুরোচনের সেই গালার ঘরে আগুন দেওয়ার কথা। সেদিন কুন্তী অনেক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। একটি নিষাদী অর্থাৎ ব্যাধজাতীয় স্ত্রীলোক তাহার পাঁচটি পুত্র লইয়া সেখানে খাইতে আসিল। গরিব লোক, ভালো খাবার পাইয়া এতই খাইল যে, তাহাদের আর চলিয়া যাইবার শক্তি নাই। কাজেই তাহারা ছয়জন সেখানে ঘুমাইয়া রহিল।

এদিকে ক্রমে ঢের রাত হইয়াছে, আর খুব বাতাসও বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পুরোচনও নিদ্রায় অচেতন। সেই সুযোগ পাইয়া ভীম তাড়াতাড়ি তাহার ঘরের দরজায় আগুন লাগাইয়া দিলেন। তারপর বাড়ির চারিদিকে ভালোরূপে আগুন ধরাইয়া পাঁচ ভাই মায়ের সঙ্গে সেই গর্তের ভিতর দিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন। নিষাদীরা যে বাড়িতে শুইয়া ছিল তাহা তাঁহারা জানিতেন না। পুরোচন আর পাঁচ পুত্র সমেত সেই নিষাদী পুড়িয়া মারা গেল।

আগুনের শব্দে শহরের লোকের জাগিতে অনেকক্ষণ লাগিল না। তাহারা আসিয়া হায়-হায় করিতে-করিতে পুরোচন আর দুর্যোধনকে গালি দিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য যে পুরোচন দুর্যোধনের কথায় এই ঘর প্রস্তুত করিয়াছিল, এ-কথা আর তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। তাহারা বলিল, 'দুষ্ট নিজেও পুড়িয়া মরিয়াছে, বেশ হইয়াছে। যেমন কর্ম তেমন ফল।'

কিন্তু পাণ্ডবেরা কী করিতেছেন? তাঁহারা প্রাণপণে বনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু চলা কি যায়? একে ভয়ে অস্থির, তাহাতে রাত জাগিয়া দুর্বল। অন্ধকার রাত্রি, ঝড় বহিতেছে। তাঁহারা পদে-পদে হোঁচট খাইতেছেন, পা আর চলে না। তখন ভীম আর উপায় না দেখিয়া মাকে লইলেন কাঁধে, আর নকুল-সহদেবকে কোলে। তারপর যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের হাত ধরিয়া তিনি ঝড়ের মতো ছুটিয়া চলিলেন।

এদিকে বিদুর পাণ্ডবদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আর একজন খুব পাকা লোক পাঠাইয়া দিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া দেখিল যে, তাঁহারা নদী পার হইবার চেষ্টায় জল মাপিতেছেন। তখন সে সেই ম্লেচ্ছ ভাষায় ঘটনার কথা বলিতেই তাহার প্রতি পাণ্ডবদের বিশ্বাস জন্মিল। তারপর সে একটি সুন্দর নৌকা আনিয়া তাঁহাদিগকে বলিল, 'চলুন, আপনাদিগকে পার করিয়া দিই।'

নৌকা বাহিতে বাহিতে সেই লোকটি তাঁহাদিগকে বলিল, 'বিদুর মহাশয় আপনাদিগকে অনেক আশীর্বাদ জানাইয়াছেন, আর বলিয়াছেন আপনাদের কোনো ভয় নাই, শেষে আপনাদেরই জয় হইবে।'

পাণ্ডবেরা বলিলেন, 'কাকাকে আমাদের প্রণাম জানাইবেন।'

এইরূপ কথাবার্তায় নৌকা অপর পারে উপস্থিত হইলে লোকটিকে বিদায় দিয়া পাণ্ডবেরা আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

এদিকে সকাল বেলায় বারণাবতের লোকেরা পাণ্ডবদিগকে খুঁজিতে আসিয়া গালার ঘরের ছাইয়ের ভিতরে পুরোচন আর সেই নিষাদী আর তাহার পাঁচ ছেলের পোড়া হাড় পাইল। তাহারা নিষাদীর কথা জানিত না, কাজেই সেই হাড় কুন্তী আর পাঁচ পাণ্ডবের মনে করিয়া তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'চল আমরা দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়া বলি—তোমার সাধ পূর্ণ হইয়াছে, পাণ্ডবদিগকে পোড়াইয়া মারিয়াছ।'

ইহার মধ্যে, সেই যে লোকটি গর্ত খুঁড়িয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি ছাই উল্টাইবার ছল করিয়া সেই গর্ত কখন বুজাইয়া দিয়াছিল, কাজেই তাহার কথা কেহই জানিতে পারিল না।

ধৃতরাষ্ট্র যখন শুনিলেন যে, পুরোচন আর পাণ্ডবেরা জতুগৃহের (গালার ঘরের) সঙ্গে পুড়িয়া মারা গিয়াছে, তখন তিনি মনে মনে খুবই খুশি হইলেন, কিন্তু বাহিরে দেখাইলেন যেন পাণ্ডবদের দুঃখে তাঁহার বুক একেবারে ফাটিয়া গেল। তিনি কাঁদেন আর বলেন, 'হায় হায়! শীঘ্র উঁহাদের শ্রাদ্ধ কর। হায় হায়! ঢের টাকা খরচ কর। হায় হায়! একটা নদী খোঁড়াও। হায় হায়! পাণ্ডবেরা ভালো করিয়া স্বর্গে যাউক।' আর একজন লোক এমনি কপট কান্না কাঁদিয়াছিলেন, কিন্তু সে অন্য কারণে। বিদুর তো জানেনই যে, পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া আছেন, কাজেই তাঁহার কেন দুঃখ হইবে? কিন্তু দেশসুদ্ধ লোক পাণ্ডবদের জন্য হায় হায় করিয়া কাঁদিতেছে, ইহার মধ্যে তিনি চুপ করিয়া থাকিলে তো ভারি সন্দেহের কথা হয়। কাজেই তিনি আসল কথা জানিয়াও লোকের সন্দেহ দূর করিবার জন্য একটু কাঁদিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা গঙ্গা পার হইয়া আবার ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে চলিয়াছেন। তখনো রাত্রি প্রভাত হয় নাই। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার আর ভয়ংকর বন। পিপাসায়, পরিশ্রমে আর ঘুমে ভীম ছাড়া আর সকলেই নিতান্ত কাতর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'ভীম, ভাই, আর যে পারি না! এখন উপায়?'

ভীম বলিলেন, 'ভয় কী দাদা? এই যে আমি আপনাদিগকে লইয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া তিনি পূর্বের ন্যায় সকলকে বহিয়া লইয়া ছুট দিলেন।

ভীম সেদিন কী ভয়ানক বেগেই চলিয়াছেন! তাঁহার দাপটে গাছ ভাঙে, মাটি উড়ে, আর যুধিষ্ঠিরেরা তো প্রায় অজ্ঞান। বনের পর বন পার হইয়া যাইতেছেন, তবুও তাঁহার বিশ্রাম নাই। রাত চলিয়া গেল, তারপর সমস্ত দিন চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে একটা বনের ভিতরে আসিয়া ভীম থামিলেন। ক্রমে ঘোর অন্ধকার আসিল, ঝড় উঠিল, চারিদিকে বাঘ-ভাল্লুক ডাকিতে লাগিল। কিন্তু পাণ্ডবেরা কিছুতেই চলিতে পারেন না; কাজেই সেখানেই বিশ্রাম করা ভিন্ন আর উপায় নাই। এমন সময় কুন্তী বলিলেন, 'আর পারি না, পিপাসায় যে প্রাণ গেল!' মায়ের দুঃখ ভীমের সহ্য হয় না; অথচ সে পোড়া বনে জল বা ফলমূল কিছুই নাই। কাজেই তিনি আবার সকলকে লইয়া আর একটা সুন্দর বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় তাঁহাদিগকে রাখিয়া তিনি বলিলেন, 'এইখানে তোমরা বিশ্রাম কর। ঐ সারসের ডাক শুনা যাইতেছে, জল কাছে পাইব।'

ভীম সারসের ডাক শুনিয়া খুঁজিতে-খুঁজিতে দুই ক্রোশ দূরে একটা জলাশয়ে উপস্থিত

হইলেন। সেখানে স্নান আর জলপানের পর আর সকলের জন্য জল লইয়া আসিয়া দেখেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

হায়! রাজধানী, রাজার ছেলে, তাঁহারা কিনা আজ মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছেন! দুঃখে ভীমের চোখে জল আসিল। তখন শত্রুদিগের হিংসার কথা ভাবিয়া তিনি রাগে কাঁপিতে–কাঁপিতে বলিলেন, 'দুষ্ট দুর্যোধন, তোর বড় ভাগ্য যে, দাদা আমাকে বলেন না। নহিলে আজই তোদের সকলকে যমের বাড়ি পাঠাইতাম!' বলিতে–বলিতে ভীমের ঝড়ের মতো নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল।

এত কষ্টের পর সকলে ঘুমাইতেছেন, কাজেই তাঁহাদিগকে জল খাওয়াইবার জন্য জাগাইতে ভীমের ইচ্ছা হইল না। তিনি জল হাতে করিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন।

সেই বনের কাছে এক প্রকাণ্ড শালগাছের উপরে হিড়িম্ব নামে একটা বিকট রাক্ষস থাকিত। তাহার তালগাছের মতো বিশাল দেহ, ভয়ানক জোর, আগুনের মতো চোখ, জালার মতো মুখ, মুলার মতো দাঁত, গাধার মতো কান, ঝাঁকড়া তামাটে চুল–দাড়ি, বেলুনের মতো প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। অনেক দিন মানুষের মাংস খায় নাই, তাই পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া তাহার মুখে জল আর ধরে না। সে খালি মাথা চুলকায় আর হাই তোলে, আর বার বার তাঁহাদিগকে চাহিয়া দেখে। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে তাহার বোন হিড়িম্বাকে বলিল, 'বাঃ! কী এ মিঠ্ঠারে গন্ধ! ও বোহিন, স্বাট্ করে ধোরে লিয়ে আয়! মোরা খাব, আর পেটমে ঢাক পিট্টায়কে নাচ্চব!'

হিড়িম্বা তাহার কথায় পাণ্ডবদের কাছে আসিল। কিন্তু রাক্ষসের মেয়ের প্রাণেও দয়া–মায়া খুব থাকিতে পারে। পাণ্ডবদিগকে মারিবার কোনো চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং সে আসিয়াই ভীমকে সকল কথা জানাইয়া বলিল, 'শীঘ্র সকলকে জাগাও! আমি তোমাদিগকে রাক্ষসের হাত হইতে বাঁচাইয়া দিতেছি!'

ভীম বলিলেন, 'আমি রাক্ষস–টাক্ষসকে ভয় করি না। ইঁহারা অনেক পরিশ্রমের পর ঘুমাইতেছেন, ইঁহাদিগকে কি এখন জাগানো যায়? না হয় তোমার ভাইকে পাঠাইয়া দাও, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।'

এদিকে রাক্ষসের আর বিলম্ব সহ্য না হওয়ায় সে নিজেই আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে হিড়িম্বা নিতান্ত ভয় পাইয়া বলিল, 'শীঘ্র তোমরা আমার পিঠে উঠ, আমি এখনো তোমাদিগকে লইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে পারি।'

ভীম বলিলেন, 'তোমার কোনো ভয় নাই, আমার গায়ে ঢের জোর আছে। মানুষ বলিয়া আমায় অবহেলা করিও না।'

হিড়িম্বা বলিল, 'ঐ দুষ্ট মানুষকে ধরিয়াই মারিয়া ফেলে, তাই আমি ভয় পাই। তোমাকে অবহেলা করিতেছি না।'

এসকল কথা শুনিয়া রাক্ষসের কীরূপ রাগ হইল, বুঝিতেই পার। সে ভীমকে আগে মারিবে, না, হিড়িম্বাকেই আগে মারিবে, ঠিক করিতে পারিতেছে না—হাউ হাউ করিয়া সে বন মাথায় করিয়া তুলিল।

ভীম বলিলেন, 'মাটি করিল! আরে চুপ্ চুপ্! হতভাগা ইঁহাদের ঘুম ভাঙাইয়া দিবি?'

রাক্ষস ষাঁড়ের মতো শব্দ করিয়া বলিল, 'মুহি তোদ্ধেরর্ খাব, উহারর্ লোকের ঘুম ভাঙিবেক কেনে?' এই বলিয়া সে দুই হাত ছড়াইয়া ভীমকে ধরিতে গেল।

ভীম তাহার হাতদুটা ধরিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে খানিক দূরে লইয়া গেলেন।

তখন বন তোলপাড় ও গাছপালা চুরমার করিয়া দুইজনে কী বিষম যুদ্ধ আরম্ভ হইল! পাণ্ডবদের আর নিদ্রা যাওয়া হইল না। হিড়িম্বা সেইখানে বসিয়া ছিল। কুন্তী চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিয়া যারপরনাই আশ্চর্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তুমি কি এই বনের দেবতা, না, কোনো অপ্সরা? এমন সুন্দর রূপ তো আমি কখনো দেখি নাই! তুমি কে, কী জন্য আসিয়াছ?'

হিড়িম্বা বলিল, 'মা, আমি রাক্ষসের মেয়ে, আমার নাম হিড়িম্বা। আমার দাদা হিড়িম্ব আর আমি এই বনে থাকি। আপনাদিগকে দেখিয়া দাদা বলিল, "উহাদিগকে ধরিয়া আন, খাইব।" আপনারা ঘুমাইতেছিলেন, আর আপনার একটি ছেলে জাগিয়া ছিলেন। আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া আপনাদিগকে পিঠে করিয়া এখান হইতে কোনো ভালো জায়গায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। শেষে আমার দেরি দেখিয়া দাদা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দেখুন, আপনার সেই ছেলেটির সঙ্গে তাহার কেমন যুদ্ধ চলিতেছে!'

এই কথা শুনিবামাত্র যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল আর সহদেব ভীমের নিকট ছুটিয়া চলিলেন। অর্জুন ভীমকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দাদা, পরিশ্রম হইয়াছে? ভয় নাই, আমি তোমায় সাহায্য করিতেছি।'

ভীম বলিলেন, 'ভয় নাই, ভাই, হতভাগাকে কাবু করিয়া আনিয়াছি।'

অর্জুন বলিলেন, 'শীঘ্র উহাকে মারিয়া ফেল। নহিলে দুষ্ট আবার কোনো ফাঁকি-টাকি দিয়া বসিবে; উহারা বড় ধূর্ত। তুমি না হয় একটু বিশ্রাম কর, আমি উহাকে মারিতেছি।'

ইহাতে ভীম তখনই ক্রোধভরে রাক্ষসকে তুলিয়া সাংঘাতিক এক আছাড় দিলেন। তারপর উহার দেহটাকে মট্ করিয়া ভাঙিতেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। মরিবার সময় রাক্ষসটা এমনি ভয়ানক চ্যাঁচাইয়াছিল যে কী বলিব!

অমন ভীষণ স্থানে না থাকাই ভালো। আর, বোধ হইল যেন কাছেই নগর আছে। সুতরাং রাক্ষস মারিবার পরেই পাণ্ডবেরা তাড়াতাড়ি সে স্থান ছাড়িয়া চলিলেন। হিড়িম্বাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

হিড়িম্বাকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া ভীম বলিলেন, 'রাক্ষসরা বড়ই দুষ্ট; উহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। তোর ভাইকে মারিয়াছি, আয় তোকেও এখন মারি।'

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'ছিঃ ভীম! এমন কাজ করিতে নাই। স্ত্রীলোককে মারা বড় পাপ।'

ভীমের রাগ দেখিয়া হিড়িম্বা নিতান্ত দুঃখের সহিত জোড়হাতে কুন্তীকে বলিল, 'মা, আমার কোনো দোষ নাই। আপনার ভীমকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি; আর আশা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন। আমাকে রক্ষা করুন।'

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'ঠিক কথা। ভীম, তোমার ইহাকে বিবাহ করা উচিত।'

ততক্ষণে ভীমের রাগ চলিয়া গিয়াছে, আর দাদার কথা তিনি কখনো অমান্য করেন না। কাজেই তিনি হিড়িম্বাকে বিবাহ করিলেন।

ভীম আর হিড়িম্বার ঘটোৎকচ নামক এক পুত্র হইয়াছিল, তাহার কথা পরে আরো শুনিতে

পাইবে। ঘটোৎকচ ধার্মিক, বিদ্বান আর অসাধারণ বীর ছিল। জন্মিবামাত্র ঘটোৎকচ বড় মানুষের মতোন করিয়া ভীমকে বলিল, 'বাবা, এখন যাই। দরকার হইলে যখন ডাকিবেন, তখন আসিব।' এই বলিয়া সে সকলকে প্রণাম করিয়া তাহার মায়ের সহিত উত্তর দিকে চলিয়া গেল।

তারপর পাণ্ডবেরা গাছের ছাল পরিয়া আর মাথায় জটা পাকাইয়া তপস্বীর বেশে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হরিণ শিকার করিয়া খাওয়া, বেদ উপনিষদ প্রভৃতি পড়া আর মায়ের সেবা করা, ইহাই তখন তাঁহাদের প্রধান কাজ ছিল। এইরূপে মৎস্য, ত্রিগর্ত, পঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানা দেশ ঘুরিয়া শেষে একদিন তাঁহারা ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। ভীষ্ম যেমন ইহাদের ঠাকুরদাদা, ব্যাসও তেমনি। কাজেই পাণ্ডবদিগকে ব্যাস অনেক স্নেহ করিতেন। তিনি বলিলেন, 'আমি সব জানি। যদিও আমার কাছে তোমরা আর দুর্যোধনেরা দুই-ই সমান, তথাপি উহাদের ব্যবহার দেখিয়া আমি তোমাদিগকেই অধিক ভালোবাসি ; আর তোমাদের উপকারের জন্যই এখানে আসিয়াছি। আমি আবার না আসা পর্যন্ত তোমরা নিকটের ঐ নগরটিকে গিয়া বাস কর।'

এই বলিয়া ব্যাস পাণ্ডবদিগকে একচক্রা নামক একটি নগরে পৌঁছাইয়া দিয়া কুন্তীকে বলিলেন, 'মা, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তোমার পুত্রেরা সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া পরম সুখে দিন কাটাইবে।'

ব্যাস তাঁহাদিগকে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। এক মাস পর তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা রহিল।

সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে পাণ্ডবেরা বাস করিতে লাগিলেন। দিনের বেলা পাঁচ ভাই ভিক্ষা করিয়া আর নানা স্থান দেখিয়া বেড়ান, সন্ধ্যা হইলে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসেন। ভিক্ষার জিনিসগুলি সমান দুই ভাগ হয়। ইহার এক ভাগের সমস্তই ভীম খান, অপর ভাগ আর পাঁচজন বাঁটিয়া খান। এইরূপে দিন কাটিয়া যায়।

ইহার মধ্যে একদিন কী হইল, শুন। সেদিন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল আর সহদেব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। ভীমের সেদিন যাওয়া হয় নাই, তিনি মায়ের কাছেই রহিয়াছেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ সেই ব্রাহ্মণের বাড়ির ভিতর ভয়ানক কান্না উঠিল।

কান্না শুনিয়া কুন্তী ভীমকে বলিলেন, 'না জানি ব্রাহ্মণের কী ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। ইনি আমাদিগকে এত স্নেহ করেন, আমরা কি ইহার কোনো উপকার করিতে পারিব না, বাবা?'

ভীম বলিলেন, 'মা, তুমি জানিয়া আইস বিষয়টা কী। সাধ্য হইলে অবশ্য ব্রাহ্মণের উপকার করিব।' কথা শেষ হইতে-না-হইতেই আবার সেই কান্না। তখন কুন্তী ব্যস্তভাবে ছুটিয়া বাড়ির ভিতরে গিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ স্ত্রী, কন্যা আর পুত্র লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছেন, 'হায়, কেন বাঁচিয়া আছি? বাঁচিয়া থাকায় কী সুখ? আমি আগেই এখান হইতে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম ; গিন্নী, তুমিই তো দিলে না। তোমার বাপের বাড়ি বলিয়া এ স্থান ছাড়িতে তোমার কষ্ট হইয়াছিল ; তাহার ফলে দেখ এখন কী কষ্ট উপস্থিত! হায় হায়! আমি কাহাকে ছাড়িব? আর তোমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া নিজেই বা কী করিয়া যাইব? তাহার চেয়ে চল, আমরা সকলেই একসঙ্গে মরি।'

তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'ওগো, তুমি এমন কথা বলিও না। তোমরা থাক, আমি যাই।

তুমি গেলে আমরা কেহই বাঁচিব না, কিন্তু আমি গেলে তুমি মেয়েটিকে আর ছেলেটিকে মানুষ করিতে পারিবে।'

বাপ-মায়ের কথা শুনিয়া মেয়েটি বলিল, 'মা, বাবা, তোমরা কেন কাঁদিতেছ? আমি যাহা বলিতেছি তাহা কর। দেখ বাবা, আমাকে আর তোমরা কয় দিন রাখিতে পারিবে? বিবাহ হইলেই তো আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইব। তাহাই যদি হয়, তবে এখনি কেন আমি যাই না? তোমরা কেহ গেলে কি ভাইটি বাঁচিবে? ভাবিয়া দেখ, আমি গেলে সকল দিকই রক্ষা হয়।'

তখন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী মেয়েটাকে জড়াইয়া ধরিয়া আরো ভয়ানক কাঁদিতে লাগিলেন।

ছোটো ছেলেটি ইহার মধ্যে কোথায় একগাছি খড় কুড়াইয়া পাইয়াছে, সেই খড় দেখাইয়া সে বলিল, 'থি, তাঁদে না! এই দান্দা দে' আমি নাক্ষস মালব!' শিশুর কথায় সে দুঃখের ভিতরেও সকলের হাসি পাইল।

কুন্তী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন। উহাদিগকে একটু হাসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কী জন্য কাঁদিতেছেন? আপনাদের কীসের দুঃখ বলুন, আমাদের সাধ্য থাকিলে তাহা দূর করিব।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা, আমাদের দুঃখ কি মানুষ দূর করিতে পারে? এই নগরের কাছেই বক বলিয়া একটা রাক্ষস থাকে। সে আমাদিগকে বাঘ-ভাল্লুক আর শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে, কিন্তু তাহার বদলে আমাদিগকে তাহার খাবার যোগাইতে হয়। রোজ একটি মানুষ, বিশ হাঁড়ি ভাত আর দুইটা মহিষ তাহার নিকট যাওয়া চাই। সে সেই ভাত, মহিষ আর মানুষ সব খাইয়া শেষ করে। আমাদিগকে পালা করিয়া এক-এক দিন এক-এক বাড়ি হইতে এ সকল জিনিস পাঠাইতে হয়। যে না পাঠায়, দুষ্ট তাহার ছেলেপিলেসুদ্ধ সব মারিয়া খায়। এ দেশের রাজা আমাদের কোনো খবর নেন না, তাই রাক্ষসের হাতে আমাদের এই দুর্দশা। আজ আমার পালা। আমার টাকা নাই যে একজন মানুষ কিনিয়া পাঠাই। আপনার লোক কাহাকেই বা কেমন করিয়া পাঠাই! তাই মনে করিয়াছি, আমরা সকলে মিলিয়া তাহার কাছে গিয়া একেবারে সকল দুঃখ দূর করিব।'

কুন্তী বলিলেন, 'ঠাকুর, আপনার কোনো চিন্তা নাই। আমার পাঁচ ছেলের একটি রাক্ষসের নিকট যাইবে।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'তাহা কি হয় মা? আপনারা একে ব্রাহ্মণ,* তাহাতে অতিথি, আপনাদের কিছুতেই আমি রাক্ষসের কাছে যাইতে দিব না।'

কুন্তী বলিলেন, 'আপনার ভয় নাই। রাক্ষস আমার ছেলের কিছুই করিতে পারিবে না। সে আরো বড় বড় রাক্ষস মারিয়াছে। কিন্তু ঠাকুর, একথা কাহাকেও বলিবেন না। তাহা হইলে লোকে খামকা আসিয়া আমার ছেলেগুলিকে কুস্তি শিখাইবার জন্য বিরক্ত করিবে।'

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। কুন্তীর প্রতি তাঁহাদের কী রকম ভক্তি হইল বুঝিতে পার। এদিকে কুন্তী আসিয়া ভীমকে সকল কথা বলাতে, ভীম উৎসাহের সহিত রাক্ষসের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

---

* পাণ্ডবদিগের কিনা তপস্বীর বেশ ছিল, তাই ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়াছিলেন। আসলে ইহারা যে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহেন, তাহা তো জানই।

যুধিষ্ঠির ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদে বড় ভয় পাইলেন। তিনি বলিলেন, 'মা, তুমি কি পাগল হইয়াছ যে, ভীমকে এমন কাজে পাঠাইতে রাজি হইলে? ভীমের যদি কিছু হয়, তবে আমাদের কী দশা হইবে?'

কুন্তী বলিলেন, 'ভীমের গায়ে দশ হাজার হাতির জোর। সে যে-সকল কাজ করিয়াছে তাহা দেখ নাই? এইসব কথা জানিয়া-শুনিয়া ব্রাহ্মণের উপকার না করা ভালো বোধ হয় না।'

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মা, তুমি ঠিক বলিয়াছ, ভীমের যাওয়াই উচিত।' পরদিন ভীম ভোরে রাক্ষসের খাবার লইয়া বনে গিয়াছেন। সেখানে গিয়া তনি ডাকিতে লাগিলেন, 'কোথায় হে, বক কাহার নাম? ও বক, খাবে নাকি, এস গো!' ডাকিতেছেন, আর এদিকে নিজেই ভাত খাইয়া শেষ করিতেছেন। ডাক শুনিয়া রাক্ষস দাঁত কড়মড় করিতে করিতে আসিয়া হাজির। কী বিকট চেহারা! এক কান হইতে আর এক কান পর্যন্ত তাহার খালি দাঁত!

একেই তো রাগিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আবার আসিয়া দেখে ভীম তাহার ভাত প্রায় শেষ করিয়াছেন। কাজেই, বুঝিতেই পার—সে গর্জন করিয়া বলিল, 'মোর ভাতটি খাইছিস? তোকে যম-ঘর পেঠ্ঠাইব নি?' কিন্তু তাহার কথা কে শোনে? ভীম খালি হাসেন আর খান। রাক্ষস হাত তুলিয়া ভয়ানক শব্দে ভীমকে মারিতে চলিল। ভীম তখনো হাসেন আর খান। রাক্ষস দুই হাতে ধাঁই-ধাঁই করিয়া প্রাণপণে তাঁহার পিঠে কিল মারিতে লাগিল। তিনি তবুও খালি হাসেন আর খান। তখন রাক্ষস এক প্রকাণ্ড গাছ তুলিয়া ভীমকে মারিতে আসিল। ততক্ষণে ভীমেরও ভাত কয়টি শেষ হইয়াছে। তখন তিনি ধীরে-সুস্থে হাত-মুখ ধুইয়া হাসিতে হাসিতে রাক্ষসের হাত হইতে গাছটি কাড়িয়া লইলেন। তারপর দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে যখন আর গাছ রহিল না, তখন আরম্ভ হইল কুস্তি। দিন গেল, রাত্রিও যায়-যায়, তবু যুদ্ধ চলিয়াছে।

এইরূপে ক্রমে রাক্ষসকে কাবু করিয়া, শেষে ভীম তাহাকে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিলেন। তারপর তাহার পিঠে হাঁটু দিয়া গলা আর কোমরের কাপড় ধরিয়া এমনই বিষম টান দিলেন যে, সেই টানেই তাহার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া একেবারে দুইখান। তখন চিৎকার আর রক্তবমি করিতে করিতে রাক্ষস মরিয়া গেল।

বকের চিৎকারে তাহার লোকজন সব ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভীম তাহাদিগকে বলিলেন, 'খবরদার! আর মানুষ খাইতে পাইবি না। তাহা হইলে তোদেরও এমনি দশা করিব!'

তাহারা বলিল, 'ওরে বাপ্পো! মারা আর কখ্খনু মান্নুস খাব নি?' তখন হইতে উহারা ভদ্রলোক হইয়া গেল, আর মানুষ খায় না।

এদিকে ভীম রাক্ষস মারিয়া চুপি চুপি চলিয়া আসিয়াছেন। সকালবেলা সকলে উঠিয়া দেখিল, রাক্ষস মরিয়া পাহাড়ের মতো পড়িয়া আছে। সংবাদ পাইয়া একচক্রার ছেলে বুড়া পুরুষ মেয়ে সকলে ছুটিয়া তাহা দেখিতে আসিল। কিন্তু এমন ভয়ানক কাজ কাহার? সকলে বলিল, 'দেখ, কাল কাহার পালা গিয়াছে।'

পালা সেই ব্রাহ্মণের, আর কাহার হইবে! সকলে মিলিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বলুন তো ঠাকুর, কাল কী রকম হইয়াছিল?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'ঠিক কী রকম হইয়াছিল, তাহা তো জানি না। আমরা কান্নাকাটি

করিতেছিলাম, এমন সময় এক মহাপুরুষ আসিয়া দয়া করিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের কোনো ভয় নাই, আমি রাক্ষসের কাছে যাইব" বোধহয় সেই মহাপুরুষ রাক্ষস মারিয়া থাকিবেন।'

একথায় সকলে অতিশয় আহ্লাদের সহিত নিজ-নিজ ঘরে গিয়া দেবতার পূজা দিতে লাগিল।

ইহার কয়েকদিন পর এক ব্রাহ্মণ পাণ্ডবদিগের ঘরে আসিয়া রাত্রিতে থাকিবার জন্য একটু জায়গা চাহিলেন। ব্রাহ্মণটি অনেক দেশ দেখিয়া আসিয়াছেন। পাণ্ডবদিগের যত্নে তুষ্ট হইয়া তিনি সেই সকল দেশের অনেক আশ্চর্য কথা তাঁহাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, শীঘ্রই পঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদের মেয়ে কৃষ্ণার স্বয়ংবর হইবে।

কৃষ্ণার কথা অতি সুন্দর। দ্রুপদ রাজার কথা তো আগেই শুনিয়াছ। দ্রোণের নিকট তিনি কেমন সাজা পাইয়াছিলেন, তাহাও জান। সে সময়ে মুখে তিনি দ্রোণের সহিত বন্ধুতা করেন, কিন্তু মনে মনে সেই অবধি দ্রোণকে মারিবার উপায় খুঁজিতে থাকেন।

দ্রোণকে মারা যে সহজ কথা নহে, আর যুদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে মারা যে একেবারেই অসম্ভব, একথা দ্রুপদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তাই তিনি স্থির করিলেন যে, কোনো মুনিকে ধরিয়া ইহার উপায় করিতে হইবে।

কল্মাষী নদীর ধারে অনেক মুনি তপস্যা করেন। সেইখানে খুঁজিতে খুঁজিতে দ্রুপদ যাজ আর উপযাজ নামক দুই ভাইকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বড় ধার্মিক আর তাঁহাদের ক্ষমতাও অসাধারণ জানিয়া দ্রুপদ মনে করিলেন, ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে আমার কাজ হইবে।

দ্রুপদ অনেক কষ্টে যাজ এবং উপযাজকে পঞ্চাল দেশে আনিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। মুনি বলিলেন, 'এই যজ্ঞে তোমার পুত্রও হইবে এবং কন্যাও হইবে।' এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃত ঢালিবামাত্রই তাহার ভিতর হইতে আশ্চর্য মুকুট আর বর্ম-পরা পরম সুন্দর এক কুমার ঝকঝকে রথে চড়িয়া গর্জন করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিল ; তাহার হাতে ধনুর্বাণ আর ঢাল-তলোয়ার। তখন আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন, 'এই রাজপুত্র দ্রোণকে মারিবে।'

এদিকে আবার যজ্ঞের বেদী হইতে এক কন্যা উঠিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শরীরের রং কালো, কিন্তু এমন অপরূপ সুন্দরী কন্যা কেহ কখনো দেখে নাই। কালো কোঁকড়ানো চুল; পদ্মফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর উজ্জ্বল দুটি চক্ষু ; ভ্রূ দুটি যেন তুলি দিয়া আঁকা। শরীরের সদ্যফোটা পদ্মের গন্ধ এক ক্রোশ পর্যন্ত ছড়াইয়া গিয়াছে। দেবতা ছাড়া মানুষ কখনো এমন সুন্দর হয় না। কন্যা জন্মিবামাত্র আকাশ হইতে দেবতারা বলিলেন, 'এই কন্যা কৌরবদিগের ভয়ের কারণ হইবে।'

ছেলেটির নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন আর মেয়েটির নাম কৃষ্ণা রাখা হইল। কৃষ্ণাকে লোকে দ্রৌপদী, অর্থাৎ দ্রুপদের কন্যা বলিয়াই বেশি ডাকিত। এই দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের কথা শুনিয়া পাণ্ডবদিগের তাহা দেখিতে যাইবার ইচ্ছা হইল। তাহা দেখিয়া কুন্তী বলিলেন 'চল বাবা, আমরা সেখানে যাই। এইখানে আমরা অনেকদিন রহিয়াছি। বেশিদিন এক জায়গায় থাকা ভালো নহে।' সুতরাং স্থির হইল, তাঁহারা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর দেখিতে পঞ্চাল দেশে যাইবেন।

এই সময়ে ব্যাসদেবও আগেকার কথামতো পাণ্ডবদিগকে দেখিবার জন্য একচক্রায়

আসিলেন। ব্যাসেরও ইচ্ছা, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যান। কাজেই তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া মায়ের সঙ্গে পঞ্চাল যাত্রা করিলেন।

গঙ্গার ধারে সোমাশ্রয়ায়ণ নামে এক তীর্থ আছে, সেখানে আসিয়া পাণ্ডবদিগের রাত্রি হইল। তখন পথ দেখাইবার জন্য অর্জুন মশাল হাতে আগে আগে চলিলেন।

সেখানে এক গন্ধর্ব সপরিবারে স্নান করিতেছিল। সে পাণ্ডবদিগকে ধমকাইয়া বলিল, 'এইয়ো ! এইদিকে আইস। জান, আমি কে? আমি কুবেরের বন্ধু অঙ্গারপর্ণ। আমার ক্ষমতা এখনি দেখিতে পাইবে। মানুষ হইয়া এখানে আসিয়াছ, তোমাদের সাহস কেমন?'

অর্জুন বলিলেন, 'এই—তোমার বুদ্ধি যেমন ! এই গঙ্গার ধার তোমার কেনা জায়গা তো নয় ; এখান দিয়া সকলেই যাইতে পারে। জোর বুঝি খালি তোমার আছে, আমাদের নাই?'

ইহাতে সে গন্ধর্ব ভারি চটিয়া একেবারে ধনুক বাগাইয়া তীর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। অর্জুন তাড়াতাড়ি হাতের ঢাল আর মশাল ঘুরাইয়া তীর ফিরাইয়া দিলেন। তারপর ধনুকে আগ্নেয়াস্ত্র জুড়িয়া মারিতে গন্ধর্ব মহাশয়ের হাত পুড়িয়া ছাই, আর তিনি নিজে মুখ থুবড়িয়া মাটিতে পড়িয়া একেবারে চক্ষু বুজিয়া অজ্ঞান। তখন অর্জুন তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত করিলেন।

এদিকে গন্ধর্বের স্ত্রী কুম্ভীনসীও যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছে। কাজেই যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন, 'ভাই, উহাকে ছাড়িয়া দাও।'

তখন অর্জুন গন্ধর্বকে বলিলেন, 'কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাজেই তোমার কোনো ভয় নাই, নিশ্চিন্তে ঘরে চলিয়া যাও।'

তাহা শুনিয়া গন্ধর্ব বলিল, 'আমি হার মানিলাম। ইহাতে আমার কোনো দুঃখ নাই, বরং সুখের কথা। শত্রুকে কাবু করিয়া এমনভাবে দয়া কি যে-সে লোকে করিতে পারে?'

এই বলিয়া গন্ধর্ব অর্জুনকে চাক্ষুষী-বিদ্যা নামক এক আশ্চর্য বিদ্যা শিখাইয়া দিল ; ত্রিভুবনের মধ্যে যে বস্তুই দেখিতে ইচ্ছা হইবে, এই বিদ্যা জানা থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া পাণ্ডবদিগকে সে একশতটি এমন আশ্চর্য ঘোড়া দিল যে, তাহারা কখনো কাহিল বা বুড়া হয় না, তাহাদের কোনো অসুখ বা মৃত্যু নাই এবং তাহাদের সমান ছুটিতেও কিছুতেই পারে না।

অর্জুন এই সকলের বদলে গন্ধর্বকে ব্রহ্মাস্ত্র দিলেন, আর স্থির হইল যে, ঘোড়াগুলি এখন গন্ধর্বের নিকট থাকিবে, পাণ্ডবদিগের দরকার হইলে তাঁহাদের নিকট আসিবে।

এইরূপে গন্ধর্ব আর অর্জুনের বন্ধুত্ব হইয়া গেল। গন্ধর্বের নাম অঙ্গারপর্ণ আর চিত্ররথ দুই-ই ছিল। চিত্ররথ বলিল, 'এখন হইতে আমার চিত্ররথ নাম ঘুচিয়া দগ্ধরথ নাম হউক।'

চিত্ররথ অতিশয় পণ্ডিত লোক ; পাণ্ডবেরা তাহার নিকটে অনেক নূতন কথা শিখিলেন। পাণ্ডবদের একটি পুরোহিতের প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁহারা চিত্ররথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল দেখি, কাহাকে পুরোহিত করি?'

চিত্ররথ বলিল, 'ধৌম্যকে পুরোহিত কর, এমন লোক আর পাইবে না। উৎকোচ তীর্থ গেলে তাঁহার দেখা পাইবে।'

সুতরাং পাণ্ডবেরা উৎকোচ তীর্থে ধৌম্যের সন্ধানে চলিলেন।

তাঁহাকে পুরোহিত করিয়া তাঁহাদের যে কত উপকার হইয়াছল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায়

না। এখন হইতে তাঁহাদের দলে ধৌম্য সমেত সাতজন হইল। সাতজনে মিলিয়া দ্রোপদীর স্বয়ংবর দেখিতে চলিলেন।

পথে কয়েকটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা ; তাঁহারাও স্বয়ংবরের যাত্রী। তাঁহারা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন ?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আজ্ঞে, আমরা একচক্রা হইতে আসিতেছি।'

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'আমাদের সঙ্গে চলুন। পঞ্চাল দেশে বড় ধুমধাম হইবে, আমরা তাহা দেখিতে চলিয়াছি। সেখানকার রাজা যজ্ঞসেনের* মেয়ের স্বয়ংবর। সেই মেয়ের গায়ের গন্ধ পদ্মের মতোন, এক ক্রোশ দূর হইতে তাহা টের পাওয়া যায়। কত রাজা, কত পণ্ডিত, কত মুনি সেখানে আসিবেন, তাহার সীমা নাই। গান, বাজনা, বাজি, কুস্তির কথা আর কী বলিব ! পেট ভরিয়া ফলার খাইব, চোখ ভরিয়া তামাশা দেখিব, তারপর পুঁটলি ভরিয়া দান-দক্ষিণা লইয়া ঘরে ফিরিব। চলুন আমরা একসঙ্গেই যাই। আপনাদিগকে যেমন সুন্দর দেখিতেছি, চাই কি, সেই মেয়ে আপনাদের কাহাকেও মালা দিয়া বসিতে পারে।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'যে আজ্ঞে ! আমরা আপনাদের সঙ্গেই চলিলাম।'

পঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবেরা এক কুমারের বাড়িতে বাসা লইলেন। সেখানে তাঁহারা থাকেন আর ভিক্ষা করিয়া খান।

দ্রুপদের ইচ্ছা ছিল, অর্জুনের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। সুতরাং যাহাতে অর্জুন ছাড়া আর কেহ দ্রোপদীকে বিবাহ করিতে না পারে, তিনি তাহার এক আশ্চর্য উপায় স্থির করিয়াছিলেন।

একটা ভয়ংকর ধনুক, তাহাকে কেহই বাঁকাইতে পারে না। সেই ধনুক বাঁকাইয়া তাহাতে গুণ পরাইতে হইবে। তারপর সেই ধনুকে তীর চড়াইয়া খুব উঁচুতে ঝুলানো একটি জিনিসকে বিঁধিতে হইবে। পথের মাঝখানে আবার একটা কলের মতোন আছে, সেটার ভিতর দিয়া তীর গেলে তবে সেই জিনিসটাতে পৌঁছাইতে পারে।

এতখানি কাজ করিয়া যে লক্ষ্য (অর্থাৎ যে জিনিসটাকে বিঁধিবার কথা তাহা) বিঁধতে পারিবে, সে-ই দ্রোপদীকে পাইবে। দ্রুপদ বুঝিয়াছিলেন যে, অর্জুন ছাড়া আর কাহারও সে ক্ষমতা নাই, কিন্তু তিনি একথা কাহাকেও বলিলেন না।

স্বয়ংবরের সংবাদ পাইয়া পৃথিবীর যত রাজা আর রাজপুত্র আর যোদ্ধা আর বড়লোক, সকলেই আসিয়া পঞ্চাল দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। কর্ণ, দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ কেহই আসিতে বাকি নাই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আর মুনি-ঋষিতে পঞ্চাল দেশ ছাইয়া গিয়াছে। দেবতারা শেষ পর্যন্ত না আসিয়া থাকিতে পারেন নাই।

স্বয়ংবর-স্থানটি যে কী সুন্দরভাবে করিয়াছে আর সাজাইয়াছে, তাহা না দেখিলে বোঝানো কঠিন। বড় বড় জমকালো ফটক, কাজ-করা উঁচু পাঁচিল; রঙ-বেরঙের ঝালর, নিশান, পর্দা আর চাঁদোয়া, এই সকলের একটা খুব ঘটা মনে করিয়া লও। আর মনে কর ইহার চারিধারে খাল, তাহাতে জল টলটল করিতেছে, পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, হাঁস চরিতেছে আর লাল মাছ খেলিতেছে। রাজা-রাজড়ার জন্য উঁচু উঁচু জায়গা হইয়াছে, তাহাতে বসিয়া তাঁহারা ভালোমতো দেখিতে পাইবেন। সাধারণ লোকেরও ভালোমতো দেখিবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাদের জন্য আর কে

---

* দ্রুপদের আসল নাম যজ্ঞসেন।

উঁচু জায়গা রাখিবে? কাজেই কেহ-কেহ গাছে উঠিয়া রাজাদের চেয়েও ভালো দেখিবার জায়গা যোগাড় করিল। যাহারা দেখিবার বেশি সুবিধা পাইল না, তাহারা খালি গোলমাল করিয়াই সাধ মিটাইতে লাগিল। উহাদের গলার শব্দই বেশি হইয়াছিল, না, বাজনার শব্দই বেশি হইয়াছিল, তা ঠিক করিয়া বলা শক্ত।

পনর দিন খালি গান-বাজনাই চলিল। ষোল দিনের দিন দ্রৌপদী স্নানের পর আশ্চর্য পোশাক এবং অলংকার পরিয়া, সোনার মালা হাতে সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি গোলমাল থামিয়া বাজনা থামিয়া সারা সভাটি চুপচাপ!

তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভার মাঝখানে আনিয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'আপনারা সকলে শুনুন। এই ধনুর্বাণ আর ঐ লক্ষ্য আপনারা দেখিতেছেন। ঐ যে একটা কলের মতোন, তাহাতে ছিদ্র আছে, তাহাও দেখুন। ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া পাঁচটি তীর মারিয়া লক্ষ্য বিঁধিয়া মাটিতে ফেলিতে হইবে। এ কাজ যিনি করিতে পারিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে পাইবেন।'

সভার সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এত রাজা-রাজড়ার মধ্যে না জানি কে আজ দ্রৌপদীকে লইয়া যায়। সেই সভায় কৃষ্ণ ও বলরামও উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে বাজনা বাজিতেছে, আর রাজাদিগের মধ্য হইতে এক-একজন করিয়া লক্ষ্য বিঁধিয়া বিদ্যার পরীক্ষা দিতে যাইতেছেন। হায় হায়! সে সর্বনেশে ধনুক কাহারও হাতে বাগ মানিতে চাহে না। বরং তাহার ধাক্কায় রাজামহাশয়েরাই ঠিকরাইয়া পড়েন, বড় বড় রাজা পর্যন্ত কেহ চিৎপাত হইয়া, কেহ ডিগবাজি খাইয়া, কাহারও পাগড়ি উড়িয়া গিয়া, নাকালের একশেষ। তাহাদের মুখে আর কথাটি নাই।

এমন সময় কর্ণ আসিয়া দেখিতে দেখিতে সেই ধনুকে গুণ আর তীর চড়াইয়া লক্ষ্য বিঁধিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহা দেখিয়া পাণ্ডবেরা মনে করিলেন, 'এই বুঝি লক্ষ্য বিঁধিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া যায়!' কিন্তু কর্ণকে দেখিয়া দ্রৌপদী বলিলেন, 'আমি সারথির ছেলের গলায় মালা দিতে পারিব না।' কাজেই কর্ণকে লক্ষ্য না বিঁধিয়াই যাইতে হইল।

সেদিন রাজামহাশয়দের যে দুর্দশা! শিশুপালের তো হাঁটু ভাঙিয়াই গেল। জরাসন্ধ গুঁতা খাইয়া চিৎপাত। তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে সেই যে তিনি সেখান হইতে চলিলেন, আর একেবারে নিজের বাড়ি না পৌঁছিয়া থামিলেন না। শল্যেরও প্রায় একই দশা।

অর্জুন এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, রাজামহাশয়দের দুরবস্থা দেখিয়া এইবার তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অর্জুনকে লক্ষ্য বিঁধিতে যাইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা তাঁহাদের বসিবার হরিণের ছাল ঘুরাইয়া চিৎকার আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ যে আবার বিরক্তও না হইলেন, এমন নহে। তাঁহারা বলিলেন, 'আরে কর কী ঠাকুর? থাম থাম। এ ব্যক্তি দেখিতেছি আমাদের সকলকে অপদস্থ করাইবে। বড় বড় রাজারা যাহা পারিল না, সেটা ইহার না করিলেই নয়! বেচারার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে আর কি!'

তাহা শুনিয়া আরো অনেকে বলিলেন, 'তোমরা ব্যস্ত হইতেছে কেন? উহাকে যাইতে দাও। ব্রাহ্মণে না করিতে পারে এমন কাজ আছে? ইনি কোনো মহাপুরুষ হইবেন। দেখিতেছ না ইহার কেমন চেহারা! ওঁর গায় কী তেজ! কাঁধ কী চওড়া! হাত কী লম্বা! এমন সুন্দর আর একটা মানুষ এখানে খুঁজিয়া বাহির কর দেখি? ইনি নিশ্চয়ই পারিবেন। তোমরা চুপ করিয়া দেখ। ঐ তিনি ধনুকে গুণ চড়াইতেছেন।'

অর্জুন ধনুকের কাছে একটু থামিয়া ব্রাহ্মণদিগের কথাবার্তা শুনিতে ছিলেন। তারপর তিনি দেবতাকে স্মরণ করিয়া ধনুকখানি হাতে লইলেন সে ধনুকে গুণ চড়ানো কি আর অর্জুনের কাছে একটা কঠিন কাজ? তিনি চক্ষের পলকে গুণ চড়াইয়া পাঁচটি তীর হাতে লইলেন। তারপর দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য বিঁধিয়া মাটিতে পড়িল। সকলে দেখিয়া অবাক। তখন আকাশ হইতে দেবতারা জয় জয় শব্দে অর্জুনের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর ব্রাহ্মণদিগের কথা কী বলিব! হরিণের ছাল, কুশাসন, চাদর, কোঁচা, কিছুই তাঁহারা ঘুরাইতে বাকি রাখিলেন না। তারপর বাজানাদারেরা যে তাহাদের সকলগুলি ঢাক, ঢোল, সানাই, কাড়া আর কাঁসি একসঙ্গে বাজাইয়া একটা কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা যদি শুনিতে!

সে আনন্দ-কোলাহলের ভিতর দ্রৌপদী হাসিতে হাসিতে অর্জুনকে মালা দিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইলেন।

এদিকে কিন্তু রাজামহাশয়দের মুখ ভার আর চোখ লাল। তাঁহারা নিজেরা সকলে সেদিন যে অদ্ভুত বিদ্যা দেখাইয়াছেন, সেকথা আর তাঁহাদের মনে নাই। তাঁহারা থাকিতে ব্রাহ্মণ কেন মেয়ে লইয়া গেল, তাহাই তাঁহাদের রাগ। 'এমন কথা! আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া অপমান করিল! অ্যাঁ বলেন কী মশায়!'

'তাই তো! এমন কথা! অপমান করিল! অ্যাঁ—মার, মার দ্রুপদকে মার, আর হতভাগা মেয়েটাকে পোড়াইয়া ফেল!'

এই বলিয়া রাজারা একজোটে দ্রুপদকে আক্রমণ করিতে আসিল। দ্রুপদ আর উপায় না দেখিয়া ব্রাহ্মণদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। অর্জুন ইহার পূর্বেই ধনুক বাণ লইয়া প্রস্তুত। ততক্ষণে ভীমও একটা বড়-গোছের গাছ উপড়াইয়া, তাহার ডাল পাতা ঝরাইয়া বেশ মজবুত একটা লাঠি প্রস্তুত করিয়া লইলেন।

এদিকে এ সকল কাণ্ড দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে বলিতেছেন, 'দাদা, এ ধনুক অর্জুন ভিন্ন আর কেহই এমন করিয়া বাগাইতে পারে না; আর এমন একটি গাছ ভাঙিয়া লাঠি তৈরি করাও ভীম ছাড়া আর কাহারও কর্ম নহে। আর ঐ তিনজন নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠির, নকুল আর সহদেব। শুনিয়াছিলাম পিসীমা (অর্থাৎ কুন্তী, ইনি কৃষ্ণ-বলরামের পিসীমা) আর পাণ্ডবেরা জতুগৃহ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এখন দেখিতেছি তাহা সত্য।'

বলরাম বলিলেন, 'পিসীমা বাঁচিয়া আছেন জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম।'

রাজারা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগের বড়ই রাগ হইল। তাঁহারা হরিণের ছাল আর কমণ্ডলু ঘুরাইয়া ভীম-অর্জুনকে বলিলেন, 'তোমাদের কোনো ভয় নাই। আমরা তোমাদের হইয়া যুদ্ধ করিব!' অর্জুন তাহাতে একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আপনারা দাঁড়াইয়া দেখুন, আমরাই ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছি।'

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কর্ণ অর্জুনকে আর শল্য ভীমকে মারিবার জন্য দাঁত কড়মড় করিতে করিতে ছুটিলেন, আর অন্য সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাড়া করিলেন।

কর্ণ খুব রাগিয়া গিয়া তীর মারেন, অর্জুনও তেমনি তেজের সহিত তাঁহাকে সাজা দেন। তাহা দেখিয়া কর্ণ বলিলেন, 'আপনি কে ঠাকুর? আমার মনে হয় স্বয়ং ধনুর্বেদ, বা পরশুরাম, বা সূর্য, বা বিষ্ণু মানুষ সাজিয়া আসিয়াছেন। আমি রাগিয়া দাঁড়াইলে ইন্দ্র আর অর্জুন ছাড়া তো কেহ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে না।!'

অর্জুন বলিলেন, 'আমি ধনুর্বেদও নহি, পরশুরামও নহি, আমি সাদাসিধা মানুষ ; গুরুর কাছে অস্ত্র শিখিয়া তোমাকে সাজা দিতে আসিয়াছি।'

একথায় কর্ণ বলিলেন, 'আপনার ব্রাহ্মণের তেজ, আপনার সঙ্গে আমি পারিব কেন?' এই বলিয়া তিনি যুদ্ধ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে শল্য আর ভীমের মল্লযুদ্ধ চলিয়াছে। এক-একটা কিল পড়ে, যেন পাহাড় ভাঙিয়া পড়ে! ক্রমাগত কেবল ধুপ-ধাপ টিপ-ঢাপ ঠকা-ঠক চটা-পট ছাড়া আর কথাই নাই। এমন সময় ভীম শল্যকে তুলিয়া এক আছাড় দিলেন, আর তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, ভীম শল্যকে এমন কাবু করিয়াও তাঁহাকে মারিলেন না।

এ সকল কাণ্ড দেখিয়া রাজামহাশয়েরা ভয়ে জড়সড়। তাঁহারা আর যুদ্ধ করিবেন কি, এখন কোনোমতে ভীম আর অর্জুনের প্রশংসা করিয়া মানে মানে ফিরিতে পারিলে বাঁচেন। কাজেই তাঁহারা বলিলেন, 'বাঃ! ইহারা খুব যুদ্ধ করিয়াছেন! যে-সে লোকে তো কর্ণ আর শল্যকে আঁটিতে পারে না। ইহারা ব্রাহ্মণ; হাজার দোষ হইলেও তাহা মাপ করিতে হয়। ইহাদের সহিত আমাদের আর যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, যদিও দরকার হইলে অবশ্য আমরা একটা কাণ্ডকারখানা করিয়া ফেলিতে পারিতাম।'

তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, 'রাজামহাশয়েরা ঠিক বলিয়াছেন। ইহারা উচিতমতোই রাজকন্যাকে পাইয়াছেন, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনাদের কাজ নাই।'

কাজেই তখন রাজারা চলিয়া গেলেন।

এদিকে কুন্তী সেই কুমারের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন, 'পুত্রেরা কেন এখনো ভিক্ষা লইয়া ঘরে ফিরিল না। দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্রের লোকেরা কি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিল, না রাক্ষসেরা তাহাদের কোনো অনিষ্ট করিল?'

এমন সময় ভীম আর অর্জুন আসিয়া বাহির হইতে বলিলেন, 'মা আজ ভিক্ষায় গিয়া বড় সুন্দর জিনিস আনিয়াছি।'

কুন্তী ভিতরে ছিলেন, দেখিতে পান নাই, তিনি বেশি না ভাবিয়াই বলিলেন, 'যাহা পাইয়াছ, তাহা তোমাদের সকলেরই হউক।'

বলিতে বলিতে দেখেন, ওমা, কী সর্বনাশ! এ তো সাধারণ জিনিস নহে—এ যে রাজকন্যা!

এখন উপায়? কুন্তী যে 'সকলেরই হউক' বলিয়া বসিয়াছেন, এখন উপায় কী? এখন মিথ্যা হইয়া গেলে কুন্তীর পাপ হয়। সত্য হইতে হইলে পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিতে হয়।

পাণ্ডবেরা বলিলেন, 'তাহাই হউক। দ্রৌপদীকে আমরা সকলে মিলিয়া বিবাহ করিব, তবু মায়ের কথা মিথ্যা হইতে দিব না।'

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্তা ঠিক হইয়াছে, এমন সময় কৃষ্ণ আর বলরাম সেইখান আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণকে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'কী আশ্চর্য! আমরা এখানে লুকাইয়া রহিয়াছি, তোমরা আমাদের কথা কী করিয়া জানিলে?'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'আগুন কি কাপড়ে চাপা থাকিতে পারে? যে কাণ্ড-কারখানা আজ হইয়াছে, আপনারা নহিলে আর কে তাহা করিবে? কী ভাগ্য যে, আপনারা সেই দুষ্টদের হাত হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছেন!'

এইরূপ খানিক কথাবার্তা কহিয়া কৃষ্ণ আর বলরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখানকার ঘটনা তো এইরূপ। ওদিকে দ্রুপদ আর তাঁহার লোকেরা না জানি কী করিতেছেন। তাঁহাদের মনে খুবই চিন্তা, তাহাতে আর ভুল কী? দ্রৌপদী কাহার হাতে পড়িলেন, যে দুইজন তাঁহাকে লইয়া গেল তাঁহারা কে, কিরূপ লোক, কিছুই জানা নাই। এমন অবস্থায় আপনার লোকের মন কি স্থির থাকিতে পারে? কাজেই ধৃষ্টদ্যুম্ন কয়েকটি লোক লইয়া চুপি চুপি সেই দুইজনের পিছু পিছু চলিলেন। চল আমরাও ইহাদের সঙ্গে যাই। ঐ সেই দুইজন দ্রৌপদীকে লইয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই উহাদের সঙ্গে যাইতেছেন। যে লক্ষ্য বিঁধিয়াছিল দ্রৌপদী যেন খুব আহ্লাদের সহিত তাহার আসনখানি বহিয়া চলিয়াছেন। উহারা কোথায় যায় দেখিতে হইবে।'

'তাই তো, উহারা যে কুমারের বাড়ি ঢুকিল! আচ্ছা দেখা যাউক, এরপর কী করে। সেখানে আর কাহারা আছে? তিনজন পুরুষ মানুষ। ঠিক ইহাদের মতো তাহাদেরও চেহারা, নিশ্চয়ই ইহাদের ভাই হইবে। ঐ বড় স্ত্রীলোকটি কে? তাঁহার শরীরে কেমন তেজ দেখিয়াছ? খুব বড় ঘরের মেয়ে তাহাতে সন্দেহ নাই—বোধ হয় ইহাদের মা, নহিলে উহারা তাঁহাকে প্রণাম করিবে কেন?

দ্রৌপদীকে ওই স্ত্রীলোকটির কাছে রাখিয়া উহারা কোথায় বাহির হইয়া গেল? বোধ হয় ভিক্ষায়।

ঐ তাহারা ভিক্ষা লইয়া ফিরিয়াছে; আর দেখ, ছোট চারিজন তাহাদের ভিক্ষার জিনিস তাহাদের বড় ভাইটির সামনে আনিয়া রাখিয়াছে। উহারা নিশ্চয়ই খুব ধার্মিক লোক। দেখ না, সকলের আগে ভিক্ষার জিনিস দেবতাকে দিল। আর দেখ কেমন দাতা, উহার ভিতর হইতে আবার ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা দিতেছে।

আচ্ছা উহারা তো সাতজন লোক, কিন্তু ভিক্ষার জিনিস মোট দুই ভাগ করিল কেন? ওহো, দেখিয়াছ? এক ভাগের তাবৎই ঐ ষণ্ডাটি একলা নিল। তা উহার যেমন শরীর, আহারটি তো তেমনই চাই। কম খাইলে কি আর অত বড় গাছ লইয়া রাজামহাশয়দিগকে অমন সাজাটি দিতে পারিত? উহার ওটুকু চাই। বাকি অর্ধেকের ছয় ভাগ হইল, আর ছয়জনে খাইবে।

বাঃ, ভিখারীর খাওয়া তো বেশ সহজ! ঐ শেষ হইয়া, ইহারই মধ্যে সব পরিষ্কার। ছোট দুটি ভাই কুশ বিছাইতেছে। বিছানা বেশ পরিষ্কার—কুশের উপর হরিণের ছাল, বেশ তো! পাঁচ ভাই দক্ষিণ-শিয়রী হইয়া শুইল। উহাদের মা উহাদের মাথার কাছে; আর ঐ দেখ, দ্রৌপদী পায়ের কাছে শুইলেন। কিন্তু দেখিলে, পায়ের কাছে শুইয়াই তিনি কেমন সুখী!

শোন শোন, উহারা কী কথাবার্তা বলে! যুদ্ধের কথা, অস্ত্রশস্ত্রের কথা। কী সুন্দর কথাবার্তা! উহারা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়, আর বড়লোক। চল যাই রাজাকে বলি গিয়া।

এইরূপ দেখিয়া-শুনিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁহার লোক চলিয়া আসিলেন। এদিকে দ্রুপদ যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া আছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী দেখিলে বাবা? আমাদের কৃষ্ণা কাহার হাতে পড়িল? সে লোকটি কি অর্জুন হইবে? আহা! কৃষ্ণা আমার কোনো ছোটলোকের হাতে পড়ে নাই তো?'

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, 'বাবা, কোনো চিন্তা করিবেন না। কৃষ্ণা যে-সে লোকের হাতে পড়ে নাই। উহারা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়, আর খুবই বড়লোক হইবেন, তাহাতে ভুল নাই। শুনিয়াছি পাণ্ডবেরা

নাকি সেই আগুনে পোড়া হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। আমার মনে হয় ইহারাই পাণ্ডব।'

'আহা, কী আনন্দের কথা! ইহারা কি তবে পাণ্ডব? যাহা হউক, ইহাদিগকে উচিত আদর দেখাইতে হইবে।'

তখনি রাজপুরোহিত ছুটিয়া সেই কুমারের বাড়িতে চলিলেন। সেখানে আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সকল কথাই জানিতে পারিলেন। তখন তাঁহার আনন্দ দেখে কে!

ইহার মধ্যে রাজবাড়ি হইতে সোনার রথ লইয়া লোক উপস্থিত। সেই রথে চড়িয়া সকলে রাজবাড়ি আসিলেন। সেখানে কত রকমের জিনিস দিয়া যে তাঁহাদিগকে আদর করা হইল, তাহার সীমা নাই। আর আহারের আয়োজনের কথা কী বলিব! তেমন মিঠাই সন্দেশ আর কখনো দেখি নাই! পাণ্ডবেরা দামি পোশাক পরিয়া সোনার থালায় সে সকল মিষ্টান্ন আহার করিলেন। যে সকল জিনিস তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর কিছুই তাঁহারা লইলেন না। ইহাতে নিশ্চয় বুঝা গেল যে, ইহারা ক্ষত্রিয়। তথাপি দ্রুপদ তাঁহাদিকে বিনয় করিয়া বলিলেন, 'আপনারা কে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আপনারা নিজের পরিচয় দিয়া আমাদিকে সুখী করুন।'

একথার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি কোনো চিন্তা করিবেন না। আমরা ক্ষত্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র। কুন্তী দেবী আমাদের মাতা। আমি সকলের বড়, আমার নাম যুধিষ্ঠির। ইহার নাম ভীম। ইনি অর্জুন, যিনি লক্ষ্য বিঁধিয়াছিলেন। মা আর দ্রৌপদীর সঙ্গে যে দুইটি আছেন তাঁহাদের নাম নকুল আর সহদেব।'

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া দ্রুপদ আহ্লাদে কিছুকাল কথা কহিতে পারিলেন না, তারপর কথাবার্তায় সকল ঘটনা জানিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন, 'তোমাদের রাজ্য নিশ্চয়ই তোমাদিগকে লইয়া দিব।'

তারপর বিবাহের কথা। পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন শুনিয়া তো সকলে অবাক! এমন কথা তো কেহ কখনো শুনে নাই! এও কি হয়?

সকলে এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময় ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তোমরা কেন ব্যস্ত হইয়াছ? এ কাজে কোনো মুশকিলই নাই। দ্রৌপদীর সহিত যে ইহাদের বিবাহ হইবে তাহা তো শিব অনেক দিন আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন। আর-এক জন্মে দ্রৌপদী এক মুনির কন্যা ছিলেন। যাহাতে খুব গুণবান লোকের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় সেইজন্য সেই কন্যা শিবের তপস্যা করেন। শেষে যখন শিব বর দিতে আসিলেন তখন কন্যা ব্যস্ত হইয়া ক্রমাগত পাঁচবার বলিলেন, "সকল গুণ যাঁহার আছে, এমন লোকের সহিত আমার বিবাহ হউক।" শিব বলিলেন, "তুমি পাঁচবার একথা বলিলে, কাজেই পাঁচজনের সহিত তোমার বিবাহ হইবে।" সেই কন্যা এখন দ্রৌপদী হইয়াছেন। আর শিবের আজ্ঞা, কাজেই পাঁচজনের সহিত তাঁহার বিবাহ হইতেই হইবে।'

তারপর বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। কত লোক, কত বাদ্য, কত গান, কত সাজ, কত আলো, কত পূজা, কত আনন্দ! হাতি, ঘোড়া, রত্ন-অলংকার, দাস-দাসী প্রভৃতি যৌতুকই (অর্থাৎ দ্রুপদ পাণ্ডবদিগকে যাহা দিলেন) বা কত! যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল, এত আয়োজন আর এমন সুন্দর কন্যা দেখিয়া তাহাদের চক্ষু জুড়াইয়া গেল; আর দামী পোশাক ও অলংকার উপহার পাইয়া তাহাদের মন খুশি হইয়া গেল।

দুর্যোধন আর তাঁহার দলের লোকেরা বুঝিলেন, যে পাণ্ডবদিগকে তাঁহারা পোড়াইয়া মারিয়াছেন বলিয়া মনে মনে এত সুখবোধ করিয়াছিলেন, সেই পাণ্ডবদিগের সহিতই দ্রৌপদীর বিবাহ হইয়াছে। যিনি লক্ষ্য বিঁধিয়াছিলেন তিনি অর্জুন, আর যিনি শল্যকে আছড়াইয়াছিলেন তিনি ভীম ছাড়া আর কেহ নহেন। তখন তাঁহাদের যে দুঃখ! তাঁহারা এত চেষ্টা করিলেন, তবুও পাণ্ডবেরা মরিলেন না! কী অন্যায়! সেই পুরোচনাটা নিতান্তই গাধা ছিল, তাহারই দোষে পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া গিয়াছেন।

ক্রমে এই সংবাদ বিদুরের নিকট পৌছিল। তাহা শুনিবামাত্র তিনি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, স্বয়ংবরের সভায় কৌরবেরাই জিতিয়াছে।'

অবশ্য পাণ্ডবেরাও তো কুরুর বংশধর কৌরব ; কাজেই বিদুর ঠিকই বলিয়াছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহা বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, 'কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! বিদুর কী সুখের সংবাদই শুনইল! শীঘ্র দুর্যোধন আর দ্রৌপদীকে এখানে নিয়া আসুক।'

বিদুর বলিলেন, 'মহারাজ, পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে পাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ভালো আছেন, আর সেখানে তাঁহাদের অনেক বন্ধু জুটিয়াছে।'

এই সংবাদে ধৃতরাষ্ট্রের মনে খুবই দুঃখ হইল। কিন্তু তিনি সামলাইয়া নিয়া বলিলেন, 'তা ভালোই হইয়াছে। আমি আমার নিজের ছেলেদের চেয়েও পাণ্ডবদিগকে বেশি ভালোবাসি। আমার ছেলেগুলি বড় দুষ্ট ; উহারা পাণ্ডবদিগের হাতে খুবই সাজা পাইবে।'

বিদুর বলিলেন, 'মহারাজ, সকল সময়ে যেন আপনার এইরূপ বুদ্ধি থাকে!' এই কথাবার্তার কথা জানিতে পারিয়া দুর্যোধন আর কর্ণ গোপনে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'আপনি বিদুরের কাছে শত্রুর প্রশংসা করিলেন কেন? উহাদিগকে এইবেলা জব্দ করিতে না পারিলে যে শেষে আমাদের বিপদ হইবে।'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'আমারও সেই মত। কেবল বিদুরের কাছে মনের কথা লুকাইবার জন্য পাণ্ডবদের প্রশংসা করি। ও তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। সুযোধন, তুমি কী করিতে চাহ, বল।'

সুযোধন কে বুঝিলে? দুর্যোধন। বাপ কিনা ছেলেকে আদর করিয়া মিষ্টভাবে ডাকিয়া থাকে, তাই ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলিতেন সুযোধন। দুর্যোধন পাণ্ডবদিগকে মারিবার জন্য কত রকম উপায়ের কথাই ভাবিয়া রাখিয়াছেন : পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিলে, উহারা নিজেরাই কাটাকাটি করিয়া মরিবে।

দ্রুপদকে ধন দিয়া বশ করিলেও কাজ চলিতে পারে। গুণ্ডা লাগাইয়া ভীমকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে তো কথাই নাই।

আর কিছু না হয়, উহাদিগকে ভুলাইয়া এখানে আনিয়া মারিবার ফন্দি করিলেও মন্দ হয় না।

এ সকল পরামর্শ কর্ণের তত ভালো লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা এখনো যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বধ করেন।

যাহা হউক, ধৃতরাষ্ট্র ইহাদের কথায় নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া ভীষ্ম দ্রোণ আর বিদুরকে ডাকাইলেন।

ভীষ্ম আর দ্রোণ দু'জনেই বলিলেন, 'পাণ্ডবদিকে অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা উচিত, নহিলে বিপদ হইবে।'

কিন্তু একথা কর্ণের একেবারেই পছন্দ হইল না। রাগের চোটে ভদ্রতা ভুলিয়া গিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, ইহারা আপনার টাকা খান, অথচ কী পরামর্শ দিলেন দেখুন! ইহারা কেমন লোক, আপনার কেমন বন্ধু, ইহাতেই বুঝিয়া লইবেন।'

বিদুর বলিলেন, 'মহারাজ, ভালো কথা কেবল বলিলে কী হয়, তাহার মতো কাজ হইলে তবে তো উপকার হইবে। ভীষ্ম দ্রোণ উহারা এক-একজন কিরূপ মহাপুরুষ ভাবিয়া দেখুন। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি, ইহারা গোঁয়ার, ইহাদের কথা শুনিয়া চলিলে আপনাদের সর্বনাশ হইবে, একথা আমি বলিয়া রাখিতেছি।'

কাজেই তখন ধৃতরাষ্ট্র আর কী করেন? তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ আর বিদুরের মতেই মত দিয়া বলিলেন, 'বিদুর, তুমি গিয়া উহাদের সকলকে আদরের সহিত লইয়া আইস।'

বিদুর এই সংবাদ লইয়া পঞ্চাল দেশে যাইতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। অনেক দিন পরে পাণ্ডবদিগকে দেখিয়া তাঁহার যেমন আনন্দ হইল, পাণ্ডবদেরও তেমনি তাঁহাকে দেখিয়া বরং তাহার চেয়ে অধিক সুখী হইল। দ্রুপদ, কৃষ্ণ, বলরাম ইহারা বিদুরকে যারপরনাই সম্মান দেখাইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের ভালো বুদ্ধি হইয়াছে, ইহা তো বেশ সুখের বিষয়। কাজেই পাণ্ডবেরা দ্রুপদের অনুমতি লইয়া বিদুর কৃষ্ণ আর বলরামের সঙ্গে হস্তিনায় আসিলেন। আহা! নগরের লোকগুলির তাঁহাদিগকে দেখিয়া যে আনন্দ! তাহারা যেন হাতে স্বর্গ পাইল!

তারপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'বাবা যুধিষ্ঠির, তোমরা অর্ধেক রাজ্য লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে আর দুর্যোধনের সহিত তোমাদের কোনোরূপ ঝগড়া হইবে না।' সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম পূর্বক পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া অর্ধেক রাজ্য লইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সুখে তাহাদিগকে খাণ্ডবপ্রস্থে রাখিয়া কৃষ্ণ আর বলরাম তাঁহাদের বাড়ি দ্বারকায় চলিয়া গেলেন।

খাণ্ডবপ্রস্থ দেখিতে দেখিতে হস্তিনার চেয়েও বড় আর সুন্দর হইয়া উঠিল। মঠ-মন্দির লোক-জন হাট-বাজার দীঘি-পুকুর-বাগানে এমন শোভা আর অতি অল্প স্থানেই দেখা যায়।

ইহার মধ্যে কী হইল, শুন।

পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদী; ইহাদের নিজেদের মধ্যে ব্যবহার অতিশয় মিষ্ট ছিল। দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁহারা যারপরনাই ভদ্রতা করিয়া চলিতেন। তিনি তাঁহাদের কোনো একজনের সহিত কথাবার্তা কহিবার সময় আর-একজন গিয়া কখনো তাহাতে বাধা দিতেন না। এমনকি, তাঁহাদের নিয়ম ছিল যে, যদি তাঁহাদের কেহ এইরূপ অভদ্রতা করেন, তবে তাঁহাকে বার বৎসর সন্ন্যাসী হইয়া বনে বাস করিতে হইবে।

ইহার মধ্যে একদিন এক ব্রাহ্মণের গরু চোরে লইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ তো খাণ্ডবপ্রস্থে আসিয়া মহা কান্না জুড়িয়াছেন, 'হে পাণ্ডবগণ, আমার গরু চোরে লইয়া গেল! হায় হায়! আমার গরু চোরে লইয়া গেল!'

ব্রাহ্মণের কান্না শুনিয়া অর্জুন বলিলেন, 'ভয় নাই ঠাকুর, এই আমি চোরকে সাজা দিতেছি।'

এই বলিয়া তিনি অস্ত্র আনিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে, অস্ত্রের ঘরে দ্রৌপদী আর যুধিষ্ঠির কথাবার্তা কহিতেছেন। তখন অর্জুন ভাবিলেন, 'এখন গিয়া

ইহাদের কথাবার্তায় বাধা দিলে অভদ্রতা হইবে, আর বার বৎসরের জন্য বনে যাইতে হইবে বটে, কিন্তু চোখের সামনে ব্রাহ্মণের গরু চোরে লইয়া যাইতেছে, ইহা সহ্য হইবার নহে। বরং বনেই যাইব, তথাপি ব্রাহ্মণের গরু চোরে লইতে দিব না।'

এই মনে করিয়া তিনি অস্ত্র লইয়া চোর ধরিতে বাহির হইলেন। চোরকে মারিয়া ব্রাহ্মণের গরু আনিয়া দিতে তাঁর বেশি বিলম্ব হইল না। ব্রাহ্মণ গরু লইয়া চিৎকারপূর্বক অর্জুনের প্রশংসা আর তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ঘরে ফিরিলেন।

তারপর অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া বলিলেন, 'দাদা, নিয়ম যে ভাঙিল। এখন অনুমতি করুন, বনে যাই।'

যুধিষ্ঠির তো শুনিয়াই অবাক! তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'সে কী ভাই, তোমার তো কিছুমাত্র অভদ্র ব্যবহার হয় নাই! আর তুমি ব্রাহ্মণের কাজ করিতে গিয়াছিলে ; সুতরাং একটা নিয়ম থাকিলেও, তোমার না গেলেই দোষ হইত। আমি তোমার দাদা, আমার কথা মান্য কর, আমি বলিতেছি তোমার বনে যাওয়ার দরকার নাই। লক্ষ্মী ভাই, তুমি চিন্তা করিও না।'

অর্জুন বলিলেন, 'দাদা আপনিই তো কহিয়াছেন, মিথ্যা বলিয়া ধর্মকর্ম করিবে না, নিয়ম করিয়া তাহা ভাঙিলে অন্যায় কাজ করা হইবে ; আমি অস্ত্র ছুঁইয়া বলিতেছি, আমি তাহা পারিব না।'

কাজেই যুধিষ্ঠির আর বিদায় না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। অর্জুন তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া বার বৎসরের জন্য বনে চলিয়া গেলেন।

অর্জুন বনে থাকিবার সময় অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন তিনি গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় নাগরাজ কোরবের কন্যা উলুপী তাঁহাকে ধরিয়া জলের ভিতর দিয়া একেবারে তাঁহাদের দেশে (অর্থাৎ পাতালে) নিয়া উপস্থিত করেন। তারপর যতক্ষণ না অর্জুন উলুপীকে বিবাহ করিতে রাজি হন, ততক্ষণ তিনি আসিতে দেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরে অর্জুন মণিপুরে* যান, আর সেখানকার রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ইহার পরে অর্জুন গঙ্গার ধারে আসিয়া পাঁচটি তীর্থ দেখিতে পাইলেন। তীর্থগুলি খুব সুন্দর, অথচ তাহাতে লোকজন নাই। ইহাতে তিনি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার কারণ কী?'

তাহা শুনিয়া কয়েকজন মুনি বলিলেন, 'এই তীর্থে পাঁচ কুমির আছে, কেহ জলে নামিলেই তাহারা তাহাকে টানিয়া খায় ; তাই এখানে কেহ স্নান করিতে আসে না।'

এই শুনিয়া অর্জুন কুমির দেখিতে চাহিলেন। মুনিরা অনেক নিষেধ করিলেও শুনিলেন না।

এই পাঁচ তীর্থের একটাতে গিয়া অর্জুন স্নান করিবার জন্য যেই জলে নামিয়াছেন, অমনি এক প্রকাণ্ড কুমির আসিয়া তাঁহার পা কামড়াইয়া ধরিয়াছে। আর অর্জুনও সেই মুহূর্তেই কুমিরকে ধরিয়া টানিতে টানিতে একেবারে ডাঙায় আনিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ডাঙায় আসিয়াই কুমির আর কুমির নাই ; সে পরমা সুন্দরী একটা কন্যা

---

* এই মণিপুর উড়িষ্যার কাছে ছিল।

হইয়া গিয়াছে। অর্জুন তো দেখিয়া অবাক! তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার অর্থ কী? তুমি কে?'

কন্যা বলিল, 'মহাশয়, আমি অপ্সরা ; আমার নাম বর্গা। আমার চারিটি সখী আছে, তাঁহাদের নাম সৌরভেয়ী, সমীচি, বুদ্বুদা আর লতা। আমরা এক তপস্বীকে অমান্য করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাগিয়া আমাদিগকে কুমির করিয়া দেন। তপস্বী বলিয়াছিলেন যে, কোনো মানুষ আমাদিগকে জল হইতে টানিয়া তুলিতে পারিলেই আমাদের শাপ দূর হইবে। তাই আমরা পাঁচজন এই পাঁচ তীর্থে বাস করি, আর মানুষ জলে নামিলেই তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাই। কিন্তু এ পর্যন্ত আর কেহ আমাদিগকে টানিয়া ডাঙায় তুলিতে পারে নাই, কাজেই আমরাও এতদিন কুমির থাকিয়া গিয়াছি। আজ আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন ; এখন আমার সখী চারিটিকে উদ্ধার করুন।'

অর্জুন তখনি আর চারি তীর্থে গিয়া, সেখানকার চারিটি কুমিরকে টানিয়া তুলিলেন। পাঁচটি অপ্সরা পাপের দায় হইতে মুক্তি পাইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহার পর নানাপ্রকার তীর্থ দেখিতে দেখিতে অর্জুন ক্রমে প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হইলেন। এই তীর্থ কৃষ্ণের রাজ্যের মধ্যে। কৃষ্ণ অর্জুনের সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় লইয়া গেলেন।

বলরাম এবং কৃষ্ণের একটি ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম সুভদ্রা। সুভদ্রার সহিত যেমন করিয়া অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল, সে এক আশ্চর্য কথা।

রূপে গুণে সুভদ্রার মতো মেয়ে অতি কমই দেখা যায়। তাঁহাকে দেখিয়া অর্জুনের বড়ই ভালো লাগিল।

কৃষ্ণ অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিতে চাহেন। ইহাতে তাঁহার মনে অতিশয় আনন্দ হইল, কারণ অর্জুনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, আর জানিতেন যে, সুভদ্রার সহিত বিবাহ দিবার জন্য এমন গুণবান লোক আর পাওয়া যাইবে না।

এখন, এ বিবাহ কিরূপে হইতে পারে, কৃষ্ণ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়দের বিবাহের নানারূপ নিয়ম আছে, কন্যাকে বলপূর্বক লইয়া গিয়া বিবাহ করা তাহার মধ্যে একটি। কৃষ্ণ বলিলেন, 'এ নিয়মটি আমার বেশ লাগে। কেননা, ইহাতে বুঝা যায় যে, বর খুব বীরপুরুষ, আর কন্যার জন্য অনেক বিপদ ও পরিশ্রম সহ্য করিতে প্রস্তুত।'

সুতরাং স্থির হইল যে, যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইলে অর্জুন সুভদ্রাকে জোর করিয়া বিবাহ করিবেন।

যুধিষ্ঠিরের অনুমতি সহজেই পাওয়া গেল, এখন বিবাহ হইলেই হয়। এ বিষয়ে সকল কথা কৃষ্ণ আর অর্জুন দুইজনে ঠিক করিলেন; দ্বারকায় আর কেহ জানিতে পারিল না।

ইহার মধ্যে একদিন সুভদ্রা রৈবতক পর্বতে দেবতার পূজা করিতে গিয়াছেন। অর্জুন দেখিলেন এই তাঁহার সুযোগ। তিনি তাড়াতাড়ি যোদ্ধার বেশে অস্ত্রশস্ত্র হাতে সুন্দর রথে চড়িয়া সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুভদ্রার পূজা-অর্চনা শেষ হইয়াছে, এখন দ্বারকায় ফিরিতে হইবে, এমন সময় অর্জুন আসিয়া তাঁহাকে রথে তুলিয়া দে-ছুট। সঙ্গের লোকেরা তখন মহা কোলাহল আরম্ভ করিয়া

দিল। কেহ দ্বারকায় সংবাদ দিতে যায়, কেহ প্রহরীকে ডাকে, আর সকলে খালি হাউমাউ আর ছুটাছুটি করে।

এদিকে দ্বারকার বড় বড় বীরেরা রাগে অস্থির। এত বড় স্পর্ধা! আমাদিগকে এমন অপমান! তাঁহারা সকলে বর্ম-চর্ম লইয়া রথ সাজাইয়া প্রস্তুত। বলরাম তো এতই রাগিয়াছেন যে, সেই দিনই বা সকল কৌরব মারিয়া শেষ করেন!

এমন সময় কৃষ্ণ বলিলেন, 'তোমরা যে চটিয়াছ, বল দেখি অর্জুনের কী দোষ? ক্ষত্রিয়েরা তো এইরূপ বিবাহকেই খুব ভালো বিবাহ মনে করে। অর্জুন তাহাই করিয়াছেন। অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করিবেন, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সুখের কথা। আর তিনি বীরপুরুষ, সুতরাং জোর দেখানো তাঁহার মতো লোকের উপযুক্ত কাজই হইয়াছে। তোমরা যে ইহাতে অপমান মনে করিতেছ, অপমান কিসে হইবে জান? অর্জুন যদি সুভদ্রাকে লইয়া দেশে চলিয়া যান, তবেই অপমান। আর তিনি কেমন বীর, তাহাও তো জান। জোর করিয়া তাঁহাকে কিছুতেই আটকাইতে পারিবে না। আমার কথা যদি শুন, তবে এইবেলা তাঁহাকে মিষ্ট কথায় খুশি করিয়া ফিরাও। তাঁহাকে ঘরে আনিয়া আদর করিয়া বিবাহ দাও, তাহা হইলে আর অপমানের কিছুই থাকিবে না, আনন্দের কথা হইবে।'

কৃষ্ণের কথায় যাদবেরা* তাড়াতাড়ি অর্জুনকে মিষ্ট কথায় ডাকিয়া ফিরাইলেন। তারপর ধুমধামের সহিত তাঁহার আর সুভদ্রার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর অর্জুন দ্বারকা হইতে পুরুষতীর্থে যান। এইরূপে ক্রমে তাঁহার বার বৎসর বনবাস শেষ হওয়াতে, তিনি সুভদ্রা এবং কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে চলিয়া আসিলেন। সেখানে কয়েকদিন খুব আনন্দেই কাটিল। তারপর কৃষ্ণ ছাড়া যাদবদিগের আর সকলে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর একদিন কৃষ্ণ আর অর্জুন দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রভৃতিকে লইয়া যমুনার ধারে বেড়াইতে যান। সেখানে সকলেই আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ আর অর্জুন খানিক দূরে একটি নির্জন স্থানে বসিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

এমন সময় জটাচীরধারী (অর্থৎ মাথায় জটাওয়ালা ও গাছের ছাল পরা) আর পিঙ্গল বর্ণের দাড়ি-গোঁফওয়ালা এই লম্বা এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রঙ কাঁচা সোনার মতো, আর তেজ প্রভাতের সূর্যের মতো।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, আমার একটু বেশি করিয়া খাওয়া অভ্যাস। আপনাদের নিকট আমি কিছু জলযোগের প্রার্থনা করি।'

কৃষ্ণ আর অর্জুন বলিলেন, 'আপনি কী খাইতে চাহেন বলুন, আমরা আনিয়া দিতেছি।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মিঠাই-মণ্ডা ভাত-ব্যঞ্জন আমি কিছুই খাই না। আমি খাণ্ডব নামক বনটি খাইব, আপনারা তাহারই উপায় করিয়া দিন।'

কী অদ্ভুত জলযোগ! আর ব্রাহ্মণটিও যে কম অদ্ভুত নহেন, তাহা তাঁহার পরিচয় শুনিলেই বুঝিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমি অগ্নি। আমার নিতান্তই ইচ্ছা, খাণ্ডব বনটাকেই খাই।

---

* অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছেন সেই বংশের লোকেরা; ইহাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল 'যদু', তাই ইহাদের বলে 'যাদব'।

কিন্তু সেই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক নাগ আর তাহার পরিবার থাকাতে, আমি সেখানে গেলেই ইন্দ্র বৃষ্টি ফেলিয়া আমাকে নিভাইয়া দেন। তাই আমি আপনাদের নিকট আসিয়াছি। আপনারা যদি বৃষ্টি থামাইয়া আর বনের পশুগুলিকে আটকাইয়া রাখিতে পারেন, তবে আমার কিঞ্চিৎ ভোজন হয়।'

ব্যাপারখানা কী জান? শ্বেতকী বলিয়া একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার কাজ ছিল কেবল যজ্ঞ করা। সে কি যেমন-তেমন যজ্ঞ! তাঁহার যজ্ঞে খাটিয়া মুনিরা রোগা হইয়া গেলেন, ধোঁয়ায় ইঁহাদের চোখে ছানি পড়িল, শেষে আর না পারিয়া তাঁহারা রাজার কাজই ছাড়িয়া দিলেন।

ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শ্বেতকী শিবের তপস্যা আরম্ভ করাতে শিব বলিলেন, 'তুমি বার বৎসর ক্রমাগত অগ্নিকে ঘি খাওয়াইয়া খুশি কর; তারপর দেখা যাইবে।'

রাজা ক্রমাগত বার বৎসর অগ্নিকে ঘি খাওয়াইলেন। তাহাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া দুর্বাসা মুনিকে দিয়া তাঁহার যজ্ঞ করাইয়া দিলেন।

রাজার যজ্ঞ হইল বটে, কিন্তু এত ঘি অগ্নির সহ্য হইল না। তাঁহার পেট ভার হইল, ক্ষুধা মরিয়া গেল। কাজেই তখন বেচারা ব্যস্তভাবে ব্রহ্মার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'এত ঘি খাইয়াছ, তাই তোমার মন্দাগ্নি হইয়াছে (অর্থাৎ ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে)। এখন খুব খানিকটা মাংস খাও গিয়া, তবেই সারিয়া যাইবে। খাণ্ডব বনে অনেক জন্তু থাকে, সেটাকে পোড়াইতে পার তো তোমার কাজ হয়।'

অগ্নি তখনি খাণ্ডব বনে চলিয়া আসিলেন। সেখানে আসিয়া তাঁহার কিরূপ দশা হইয়াছিল, তাহা শুনিয়াছ। তিনি কেবল ইন্দ্রের কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু সেই বনের জন্তুরাও তাঁহাকে কম নাকাল করে নাই। সেখানকার হাতিগুলি শুঁড়ে করিয়া জল ঢালিয়া তাঁহাকে নিভাইয়া দিল। অন্য জন্তুরাও তাঁহার কতই দুর্গতি করিল। সাত বার সেই বন পোড়াইতে গিয়া সাত বারই তিনি এইরূপে জব্দ হইয়া আসিলেন।

শেষে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি কৃষ্ণ আর অর্জুনের কাছে যাও। তাঁহারা চেষ্টা করিলে ইন্দ্রকে আটকাইতে পারেন, জন্তুদিগকেও থামাইয়া রাখিতে পারেন।' তারপরে কী হইয়াছে, তোমরা জান।

অগ্নির কথা শুনিয়া অর্জুন বলিলেন, 'আমার তেমন ভালো ধনুক বা রথ নাই, আর কৃষ্ণের হাতেও অস্ত্র নাই। আমাদিগকে এ সকল জিনিস আনিয়া দিলে আমরা কাজ করিতে প্রস্তুত আছি।'

একথায় অগ্নি বরুণের নিকট হইতে গাণ্ডীব নামক ধনুক, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ নামক রথ আনিয়া অর্জুনকে দিলেন। সেই রথের উপরে এক ভয়ংকর বানরের মূর্তি থাকাতে উহার 'কপিধ্বজ' নাম হয়। অতি আশ্চর্য রথ, বিশ্বকর্মার তৈয়ারী। ঘোড়াগুলি গন্ধর্বের দেশের। আর ধনুকের কথা কী বলিব। ব্রহ্মা নিজে উহা প্রস্তুত করেন। অর্জুন সে ধনুকে গুণ চড়াইবার সময় তাহার ভীষণ শব্দে ত্রিভুবন কাঁপিয়া উঠিল।

অগ্নি অর্জুনকে এই সকল জিনিস, আর কৃষ্ণকে সুদর্শন নামক একখানি চক্র (অর্থাৎ চাকার ন্যায় অস্ত্র) আর কৌমুদকী নামক একটি গদা দিলেন। সেই চক্রকে কিছুতেই আটকাইতে পারে না। যাহাকে মারিবে তাহার আর রক্ষা নাই। চক্র তাহাকে বধ করিয়া আবার হাতে ফিরিয়া আসিবেই আসিবে। অস্ত্র পাইয়া কৃষ্ণ আর অর্জুন অগ্নিকে বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে এখন

আপনি গিয়া বন পোড়াইতে থাকুন। আমরা আপনার সাহায্য করিতেছি।'

অমনি খাণ্ডব বনের চারিদিকে ভয়ানক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। খাণ্ডব দাহনের (অর্থাৎ খাণ্ডব পোড়ানোর) ন্যায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড খুব কমই হইয়াছে। আগুনের শিখা হড়-হড় ঘড়-ঘড় গর্জনে আকাশ ছাইয়া ফেলিল, আর তাহার সঙ্গে-সঙ্গে পর্বতাকার কালো ধোঁয়া উঠিয়ে দিনকে অমাবস্যার রাত্রির মতো করিয়া দিল। জীবজন্তু সকলে চিৎকার করিতে করিতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াও কৃষ্ণ আর অর্জুনের জন্য পলাইতে পারিল না। কৃষ্ণের চক্র এমনি যে, কোনো জন্তু বাহিরে দেখা দিতে-না-দিতেই সে তাহাকে কাটিয়া দুইখানি করে। অর্জুনের তীর এমনি যে, ফড়িংটিকে পর্যন্ত উড়িয়া পলাইতে দেয় না। তাঁহার রথ সে সময়ে এমনি বেগে সেই বনের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, উহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাওয়া যায় না। কত জন্তু কত পাখি যে পুড়িয়া মরিল তাহা ভাবিয়াও শেষ করা যায় না। খাল-বিলের জল টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। মাছ কচ্ছপ কুমির সকলেই সিদ্ধ হইয়া গেল। আগুনের শব্দ, জন্তুদিগের চিৎকার মিলিয়া ঝড়, বজ্রপাত আর সমুদ্রের গর্জনকেও হারাইয়া দিল।

আগুনের তেজে দেবতারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিলেন, 'হে ইন্দ্র, আজ অগ্নি কী জন্য পৃথিবীকে ভস্ম করিতে গিয়াছে? আজ কি সৃষ্টির শেষ দিন উপস্থিত?'

তাঁহাদের কথায় ইন্দ্র অমনি উনপঞ্চাশ পবন আর ঘোরতর কালো মেঘসকলকে লইয়া আগুন নিভাইতে চলিলেন। কিন্তু সে আগুনের তেজে তাঁহার মেঘ বৃষ্টি আকাশেই শুষিয়া গেল। মেঘ হারিলে ইন্দ্র মহামেঘদিগকে ডাকিলেন, যাহারা মনে করিলে ব্রহ্মাণ্ড তল করিয়া দিতে পারে। কিন্তু সেই সাংঘাতিক মেঘও অর্জুনের বাণে উড়িয়া গেল।

সেই বনে ইন্দ্রের বন্ধু তক্ষক সাপের বাড়ি। তক্ষক তখন বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র ছিলেন। তক্ষকের পুত্র অশ্বসেনের মা তো পুড়িয়া মারা গেলেন। ইহার মধ্যে ইন্দ্র একবার ফাঁকি দিয়া অর্জুনকে অজ্ঞান করিতে পারিয়াছিলেন, তাই রক্ষা ; নইলে অশ্বসেনকে তাহার মায়ের পরেই যাইতে হইত।

বৃষ্টি করিয়া, বাজ ফেলিয়া, পর্বত ছুঁড়িয়া ইন্দ্র কিছুতেই কৃষ্ণ আর অর্জুনকে জব্দ করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রের পর্বত অর্জুনের বাণে কাটিয়া খণ্ড-খণ্ড হইল। তখন বোধ হইল যেন আকাশের গ্রহগুলি ছুটিয়া পড়িতেছে।

দেবতাদের বড় খোলা মন। তাই যখন দেখিলেন যে, তিনি কিছুতেই কৃষ্ণ আর অর্জুনকে আঁটিতে পারিতেছেন না, তখন ইন্দ্র যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

তখন খাণ্ডব বন পোড়াইতে কোনো বাধাই রহিল না। সেই ভয়ানক আগুনের হাত হইতে কেবল ছয়টি প্রাণী রক্ষা পাইয়াছিল।

এই ছয়টির একটি অবশ্য অশ্বসেন, আর একটি ময় নামক দানব। এই ব্যক্তি হাত জোড় করিয়া অর্জুনকে এমনি মিনতি করিতে লাগিল যে, অর্জুন দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। আর চারিটি প্রাণী চারিটি বকের ছানা, ইহাদিগকে অগ্নি দয়া করিয়া পোড়ান নাই।

খাণ্ডব বন খাইয়া অগ্নির অসুখ সারিয়াছিল কি না তাহা মহাভারতে লেখা নাই। সে যাহা হউক, তিনি ভোজন শেষ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ইন্দ্রও যে কৃষ্ণ আর অর্জুনের উপর খুব খুশি হইয়াছিলেন, একথা তো আগেই বলিয়াছি। অগ্নি বলিলেন, 'তোমরা যাহা করিলে,

দেবতারাও তাহা করিতে পারেন না। এখন তোমরা কী বর চাহ?'

অর্জুন বলিলেন, 'আমাকে সকল রকম অস্ত্র দিন, এই আমার প্রার্থনা।'

তিনি বলিলেন, 'তুমি তপস্যায় শিবকে তুষ্ট কর, তাহা হইলেই আমি অস্ত্র দিব।'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'অর্জুনের সহিত আমার বন্ধুত্ব যেন চিরদিন থাকে।'

অগ্নি বলিলেন, 'তথাস্তু' (অর্থাৎ তাহাই হউক)।

তারপর অগ্নি কৃষ্ণ আর অর্জুনের অনেক প্রশংসা করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; আর কৃষ্ণ অর্জুন এবং ময় দানব যমুনার তীরে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

সভাপর্ব

অগ্নি আর ইন্দ্র চলিয়া গেলে পরে ময় দানব জোড় হাতে অর্জুনকে বলিল, 'আপনি আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। অনুমতি করুন, আমি আপনার কী উপকার করিব !'

অর্জুন বলিলেন, 'তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ, ইহাই আমার উপকার। আর কিছু করিতে হইবে না।'

কিন্তু ময় ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। সে যে-সে লোক নহে। দেবতাদের মধ্যে বিশ্বকর্মা যেমন সকল রকম কারিকুরির ওস্তাদ আর অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক, দানবদিগের মধ্যে ময়ও সেইরূপ। তাহার নিতান্তই ইচ্ছা যে, অর্জুনের জন্য বড় রকমের কোনো কাজ করে।

তাহার মিনতি দেখিয়া শেষে অর্জুন বলিলেন, 'তুমি কৃষ্ণের কোনো কাজ করিয়া দাও, তাহা হইলেই আমাদের উপকার হইবে।'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য এমন একটা সভাঘর করিয়া দাও যে, আর কেহ তেমন করিতে না পারে।'

ময় সন্তোষের সহিত একথায় রাজি হইল। তারপর কৃষ্ণ আর অর্জুন তাহাকে সঙ্গে করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে অবশ্য তাহার আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি হইল না।

তারপর সভাগৃহের আয়োজন আরম্ভ হইল। সভাগৃহটি যে কিরূপ তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারিবে যে, সেটি ৫০০০ হাত লম্বা ছিল। এমন সভার আয়োজন কি যেখানে-সেখানে মিলে! এদেশে সে সব জিনিস জন্মায় না। বহুকাল পূর্বে দানবরাজ বৃষপর্বা যজ্ঞের জন্য কৈলাস পর্বতের উত্তরে এই ময়কে দিয়াই এক অতি আশ্চর্য সভা প্রস্তুত করান। যুধিষ্ঠিরের সভার জন্য ময় সেই সভার মণিমুক্তা আর স্ফটিক লইয়া আসিল। সেখানে বিন্দু সরোবর নামে একটি সরোবরের ভিতরে বৃষপর্বার সোনার গদা আর বরুণের দেবদত্ত নামক বিশাল শঙ্খও ছিল। ময় ভীমের জন্য সেই গদা আর অর্জুনের জন্য বরুণের শঙ্খটিও আনিতে ভুলিল না।

চৌদ্দ মাসে সভাঘর প্রস্তুত হইল। সে সভা কীরূপ সুন্দর হইয়াছিল, তাহা আমি কী বলিব! ইটের বদলে তাহা স্ফটিক দিয়া গাঁথা। সেই স্ফটিকের উপর সূর্যের আলোক পড়িয়া না জানি কেমন ঝক্‌ঝক্ করিত! সেখানে বাগান তো ছিলই, তাহার গাছপালা ছিল সোনার, আর ফুল মণি-মাণিক্যের। আর ভিতরের সাজ-কাজ, সে যে কী আশ্চর্য রকমের ছিল তাহা বুঝাইব কী, আমিই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তো গরিব মানুষ, বড় বড় রাজাদেরই তাহাতে ধোঁকা লাগিয়া গিয়াছিল। স্ফটিকের পুকুর দেখিয়া তাঁহারা সেটাকে পুকুর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই,--তাঁহারা গিয়াছিলেন তাহার উপর দিয়া হাঁটিতে। পরে একটা হাসির কাণ্ড হইয়া গেলে তবে বুঝিলেন যে, উহা জল।

এমনি সুন্দর বাড়ি, এমনি সুন্দর বাগান, আর তাহাতে তেমনি সুন্দর মাছের খেলা, ফুলের গন্ধ, পাখির গান! বুঝিয়া লও সভাটি কেমন ছিল! আট হাজার বিকট রাক্ষস সেই সভায় পাহারা দিত।

সভা দেখিয়া পাণ্ডবেরা খুশি হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কী! তেমন সভা কেবল স্বর্গেই আছে, পৃথিবীতে তেমন আর কেহ দেখে নাই। পৃথিবীর রাজা-রাজড়া মুনি-ঋষি ইহারা সকলেই সে সভা দেখিতে আসিলেন। স্বর্গ হইতে নারদ পারিজাত, রৈবত, সুমুখ, ধৌম্য প্রভৃতি দেবর্ষিরা অবধি সভা দেখিতে আসিবার লোভ সামলাইতে পারিলেন না।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের আর ব্রহ্মার সভার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য সংবাদ শুনাইলেন। ইহা ছাড়া মহারাজ পাণ্ডুরও দু-একটি সংবাদ ছিল। স্বর্গ হইতে আসিবার সময় পাণ্ডুর সহিত তাঁহার দেখা হয়। তখন পাণ্ডু তাঁহাকে বলিলেন, 'মহর্ষি, আপনি পৃথিবীতে যাইতেছেন, যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন যেন রাজসূয় যজ্ঞ করে। রাজসূয় যজ্ঞের গুণে রাজা হরিশচন্দ্র ইন্দ্রের সভায় কত সুখে বাস করিতেছেন। যুধিষ্ঠির সে যজ্ঞ করিলে আমিও সেইরূপ সুখে সেখানে থাকিতে পাইব।'

নারদ যুধিষ্ঠিরকে এই সংবাদ দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

রাজসূয় অতি কঠিন যজ্ঞ। পৃথিবীতে তাবৎ রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহার দ্বারা এই যজ্ঞ করিতে হয়, সুতরাং এই যজ্ঞে বাধা দিতে অন্য রাজারা বিধিমতে চেষ্টা করে। নিজের বল বুদ্ধি আর বন্ধুবান্ধব খুব বেশি রকম না থাকিলে ইহা সম্ভবই হয় না। কাজেই রাজসূয়ের কথা শুনিয়া পাণ্ডবেরা বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। এ যজ্ঞ না করিলেই নয়, অথচ কাজটি ভারি কঠিন।

বল বুদ্ধি পাণ্ডবদের যথেষ্ট, বন্ধুবান্ধবদেরও অভাব নাই, যুধিষ্ঠিরকে সকলে প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসে। ভীম অর্জুনের সাহস আর ক্ষমতায় প্রজার সকল ভার দূর হইয়াছে, শত্রুরা দেশ

ছাড়িয়া পলাইয়াছে। নকুলের ন্যায় বিচারে আর সহদেবের মিষ্ট ব্যবহারে লোকে মোহিত। সুতরাং এ সকল বিষয়ে পাণ্ডবদের বেশ ভরসার কথাই ছিল। মন্ত্রীরা এই বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ করিতে উৎসাহ দিলেন।

কিন্তু ইহাদের কথায় যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দূর হইল না। পরামর্শ দিবার একটি লোক আছেন— কৃষ্ণ। তিনি বলিলে তবে একাজে হাত দেওয়া যায়। এই ভাবিয়া যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে আনাইলেন।

কৃষ্ণ আসিলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, 'ভাই, রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; তুমি কী বল? আর সকলে তো খুব উৎসাহ দিতেছে, কিন্তু উহাদের কথায় আমার ভরসা হয় না। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি বুঝিব ঠিক।'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে ভয়ের একটা কথা আছে। মগধের রাজা জরাসন্ধের এখন আসাধারণ ক্ষমতা। পৃথিবীর সকল রাজাকে সে পরাজয় করিয়াছে। শিশুপাল উহার সেনাপতি, সেও একজন অসাধারণ যোদ্ধা। তারপর বক্র, ভগদত্ত, শৈল্য, পৌণ্ড্রিক, ভীষ্মক প্রভৃতি অনেক বড় বড় যোদ্ধা তাহার বন্ধু। উহার ভয়ে কত শত রাজা যে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। এমনকি, আমরা উহার ভয়ে মথুরা ছাড়িয়া দ্বারকায় আসিয়া বাস করিতেছি। অনেক রাজাকে ধরিয়া আনিয়া দুষ্ট তাহার দুর্গের ভিতরে বন্দী করিয়াছে। এ ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার রাজসূয় হওয়া অসম্ভব। ইহাকে আগে মারিয়া রাজাদিগকে ছাড়াইয়া নিতে চেষ্টা করুন, নহিলে রাজসূয় করিতে পারিবেন না।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'এই জরাসন্ধকে লইয়া তো বড় মুশকিল দেখিতেছি। তুমি নিজে উহাকে এত ভয় কর, আমাদের সাহস কিসে হইবে? তুমি, বলরাম, ভীম আর অর্জুন, এই চারিজনের কেহ কি উহাকে মারিতে পার না?'

ইহা শুনিয়া ভীম বলিলেন, 'কৃষ্ণের বুদ্ধি আছে, আমার বল আছে, আর অর্জুনের সাহস আছে। আমরা তিনজনে মিলিয়া জরাসন্ধকে বধ করিব।'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'জরাসন্ধ ছিয়াশিটি বড় বড় রাজাকে আনিয়া ছাগলের মতো বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আর চৌদ্দটিকে আনিতে পারিলেই একশতটি হয়; তখন উহাদিগকে বলি দিবে। এই সকল রাজাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করা উচিত হইতেছে। যে জরাসন্ধকে মারিয়া এ কাজ করিতে পারিবে, সে সম্রাট হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমি সম্রাট হওয়ার লোভে তোমাদিগকে এমন বিপদে ফেলিতে পারিব না। আমার রাজসূয়ে কাজ নাই।'

এই সময়ে অর্জুন সেখানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমরা ভালো ভালো অস্ত্র পাইয়াছি, আমাদের বলও যথেষ্ট আছে। এসব থাকিতে শত্রুর সামনে চুপ করিয়া থাকা ভালো নহে। আমরা যুদ্ধ করিব।'

জরাসন্ধ মগধের রাজা, ইহার পিতার নাম বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের দুই রানী ছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত ইহাদের সন্তান না হওয়ায় রাজার মনে বড়ই দুঃখ ছিল। ইহার মধ্যে একদিন মহর্ষি চণ্ডকৌশিক রাজবাড়ির নিকটে এক আমগাছের তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। একথা শুনিবামাত্র রাজা মুনির নিকটে গিয়া তাঁহার অনেক সেবাপূর্বক নিজের দুঃখের কথা জানাইলেন। তখন মুনি ধ্যানে বসিতেই গাছ হইতে একটি সুন্দর আম তাঁহার কোলের উপর পড়িল। সেই

আমটি রাজাকে দিয়া তিনি বলিলেন, 'মহারাজ, রানীরা এই আম খাইলে তোমার পুত্র হইবে।' দুই রানী সেই আমটিকে ভাগ করিয়া খাইলেন। ইহাতে তাঁহাদের দুইজনের দুই ছেলে হইল বটে, কিন্তু সে অতি অদ্ভুত রকমের ছেলে। তাহাদিগকে মানুষ বলা যায় না, আধখানা মানুষ বলিলে হয়—একখানা করিয়া পা, একটি মাত্র হাত, একটি কান, আধখানি মাথা, আধখানি শরীর। এমন ছেলে দিয়া কী হইবে? কাজেই তাহাদিগকে কাপড় মুড়িয়া চৌমাথায় ফেলিয়া দেওয়া হইল।

জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দু-খানি অর্ধেক ছেলে কুড়াইয়া পায়। রাক্ষসী ভাবিল, দুইটিকে একসঙ্গে জড়াইয়া লইলে বহিবার সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া সে যেই সেই দুই অর্ধেক একত্র করিয়াছে, অমনি তাহা জুড়িয়া একটি ছেলে হইয়া গেল। বজ্রের মতো শক্ত প্রকাণ্ড খোকা। রাক্ষসী তাহাকে কি সহজে বহিয়া নিতে পারে? সে খোকা আস্ত হইয়াই হাতের মুঠি মুখে ঢুকাইয়া ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাইতে আরম্ভ করিল।

খোকার সেই ভয়ানক চিৎকার শুনিয়া রাজা মন্ত্রী লোকজন সকলে সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। রাক্ষসীও অমনি ছেলেটিকে রাজাকে দিয়া বলিল, 'এই নাও তোমার ছেলে।'

সেই ছেলেই জরাসন্ধ (অর্থাৎ জরা যাহাকে জুড়িয়াছিল)। বড় হইয়া সে ভয়ংকর লোক হইয়াছে। হংস আর ডিম্বক নামক দুই বীর তাহার বন্ধু ছিল। এই তিনজন একত্র হইলে ত্রিভুবন জয় করিতে পারিত।

হংস আর ডিম্বকের ভালোবাসার কথা বড় সুন্দর। হংস নামক আর একজন লোকের মৃত্যুর কথা শুনিয়া ডিম্বক ভাবিল, বুঝি তাহার বন্ধুই মরিয়া গিয়াছে। সেই দুঃখে সে যমুনায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে সে সংবাদ পাইয়া হংসও ডুবিয়া মারা গেল।

ইহাদের মৃত্যুতে জরাসন্ধের বল অনেক কমিয়া গেল বৈকি, কিন্তু তাহার একেলার ক্ষমতাও কম নহে। একবার যে কৃষ্ণকে মারিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড গদা নিরানব্বই বার ঘুরাইয়া মগধ হইতে ছুঁড়িয়া মারে। সেই গদা মথুরার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল।

মগধের চারিধারে বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈতক নামে পাঁচটি প্রকাণ্ড পর্বত থাকাতে, সৈন্য লইয়া গিয়া সে-দেশ জয় করা একেবারে অসম্ভব। তাহার উপরে আবার জরাসন্ধ নিজে এমন বীর, আর তাহার এত সহায়। এইজন্য কৃষ্ণ বলিলেন যে, উহাকে অন্য উপায়ে মারিতে হইবে। কৃষ্ণ, ভীম আর অর্জুন এই তিনজন সাধারণ লোকের মতো মগধ দেশে গেলে সহজেই জরাসন্ধের দেখা পাওয়ার কথা। তখন ভীম তাহাকে যুদ্ধ করিয়া মারিবেন।

এইরূপ পরামর্শের পর তিনজনে স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা ক্রমে কুরুজাঙ্গাল দেশ, তারপর গণ্ডকী, সরযূ প্রভৃতি নদী পার হইয়া কোশলায়, সেখান হইতে মিথিলায়, মিথিলা হইতে মালয়, তারপর চর্ম্মণ্বতী-গঙ্গা আর শোণ পার হইয়া শেষে মগধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরের সিংহদ্বারের পাশেই একটি সুন্দর চৈত্য (জয়স্তম্ভ) আর তিনটা বিশাল দুন্দুভি (ডঙ্কা) ছিল। সেখানে আসিয়া তাঁহাদের প্রথম কাজই হইল সে জিনিসগুলিকে চুরমার করা। তারপর তাঁহারা খুব খুশি হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপথে দুই ধারে ময়রা, সওদাগর, মালাকার প্রভৃতির দোকান ছিল, তাহা হইতে জোর করিয়া মালা লইয়া তাঁহারা গলায় পরিলেন। এই সকল কাণ্ড দেখিয়া সকলে আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, না জানি ইঁহারা কে।

এইরূপে ক্রমে তাঁহারা জরাসন্ধের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে

স্নাতক ব্রাহ্মণ ভাবিয়া অনেক আদর-যত্ন করিল। কিন্তু ভীম আর অর্জুন তাহার কোনো কথার উত্তর দিলেন না। কৃষ্ণ বলিলেন, 'ইহাদের নিয়ম আছে, এখন কথা কহিবেন না। দুই প্রহর রাত্রির সময় আপনার সহিত ইহাদের কথাবার্তা হইবে।'

রাত্রি দুই প্রহরের সময় জরাসন্ধের সহিত কথাবার্তা আরম্ভ হইলে জরাসন্ধ বলিল, 'আপনাদের পোশাক স্নাতক ব্রাহ্মণের মতো, কিন্তু স্নাতক ব্রাহ্মণেরা তো এমন সময় মালা চন্দন পরে না। আপনাদের হাতে ধনুর্বাণের দাগ দেখিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়াই বোধ হয়। অথচ আপনারা ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়াছেন, আবার চৈত্যটি ভাঙিয়াছেন। আমি আদর-যত্ন করিলাম, তাহারও আপনারা ভালো করিয়া উত্তর দেন নাই। যাহা হউক, আপনারা কী জন্য আসিয়াছেন?'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'স্নাতক তো ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যরাও হইতে পারে, আমাদিগকে ব্রাহ্মণ মনে করিবার প্রয়োজন কী? মালা পরিলে দেখায় ভালো, তাই আমরা মালা পরিয়াছি। গায়ের জোর দেখানো ক্ষত্রিয়ের উচিত কাজ, তাই কিছু দেখাইয়াছি। আপনার দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে আজই আরো ভালো করিয়া দেখিতে পাইবেন। শত্রুর ঘরে আসিয়া তাহার নিকট হইতে আদর লওয়া আমরা ভালো মনে করি না, তাই আপনার আদর-যত্নের উত্তর দিই নাই।'

এ কথায় জরাসন্ধ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি কী করিয়া আপনাদের শত্রু হইলাম, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না। আপনাদের বোধহয় ভুল হইয়া থাকিবে।'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'তুমি ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে ধরিয়া বলি দিতে আনিয়াছ, সুতরাং তুমি সকল ক্ষত্রিয়েরই শত্রু। তাই আমরা তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ নহি। আমি বাসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ, আর ইঁহারা দুইজন মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র। এখন, হয় এই সকল রাজাদিগকে ছাড়িয়া দাও, না হয় আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যমের বাড়ি যাও।'

জরাসন্ধ বলিল, 'আমি যাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছি, তাহাদিগকে লইয়া আমার যা খুশি করিব। আমি কাহাকেও ভয় করি না। আমি একলা দুই তিন মহারথীর (খুব বড় বড় বীরের) সহিত যুদ্ধ করিতে পারি।'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'আমাদের কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে?'

জরাসন্ধ ভীমকে দেখাইয়া বলিল, 'ইহার সহিত।'

তখন পুরোহিত আসিয়া স্বস্ত্যয়ন (জরাসন্ধের মঙ্গলের জন্য দেবতার পূজা) করিলে জরাসন্ধ বর্ম আঁটিয়া, চুল বাঁধিয়া বলিল, 'আইস ভীম, যুদ্ধ করি।' তারপর দু-জনে কী ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল! যত রকম কুস্তির প্যাঁচ আছে, সমস্তই দুইজন দুইজনের উপর খাটাইলেন। ঝড়ের মতোন করিয়া তাঁহাদের নিশ্বাস বহিতে লাগিল। কপালে কপালে ঠেকিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তেরদিন এইরূপ যুদ্ধের পর চৌদ্দদিনের রাত্রিতে জরাসন্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, 'আহা! বড় কাহিল হইয়া পড়িয়াছে! ভীম, আর মারিও না, তাহা হইলে মরিয়া যাইবে।'

আসল কথা ভীমকে জানাইয়া দেওয়া যে, জরাসন্ধ কাহিল হইয়াছে। তাহা বুঝিতে পারিয়া ভীম বলিলেন, 'হতভাগা এমনি কাপড় জড়াইয়াছে যে, উহাকে বধ করা কঠিন দেখিতেছি।'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'তোমার জোর একবার ভালো করিয়া দেখাও না!'

তখন ভীম আগে জরাসন্ধকে শূন্যে তুলিয়া একশত পাক ঘুরাইলেন। তারপর হাঁটু দিয়া

তাহার পিঠ ভাঙিলেন। শেষে দুই পা ধরিয়া তাহাকে দুই ভাগে চিরিয়া ফেলিলেন। সে সময় জরাসন্ধের চিৎকারে অতি অল্প লোকই টিকিয়া থাকিতে পারিয়াছিল।

আর সেই বন্দী রাজাদের কথা কী বলিব ! তাঁহারা দারুণ অপমান আর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল। তাঁহারা কৃষ্ণ, ভীম আর অর্জুনের অশেষ স্তুতি করিয়া জোড় হাতে বলিলেন, 'এখন আপনাদের এই ভৃত্যেরা আপনাদের কী সেবা করিব, অনুমতি করুন।' কৃষ্ণ বলিলেন, 'মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে চাহেন, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবেন।'

রাজারা পরম আনন্দের সহিত এ কথায় সম্মত হইলেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব কৃষ্ণ ও ভীমার্জুনকে বিস্তর ধনরত্ন উপহার দিয়া বিনয়ের সহিত বলিল, 'আমিও যজ্ঞে সাহায্য করিব।' তাঁহারা তাঁহাকে মগধের সিংহাসনে বসাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন।

তারপর যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হইল। রাজাদিগের নিকট হইতে কর আনাই প্রধান কাজ। এজন্য মহাবীর চারি ভাই অসংখ্য সৈন্য লইয়া চারিদিকে ছুটিয়া চলিলেন। অর্জুন উত্তরে, ভীম পূর্বদিকে, সহদেব দক্ষিণে, নকুল পশ্চিমে।

অর্জুন ক্রমে কুলিন্দ, কালকূট, আনর্ত, শাকলদ্বীপ প্রভৃতি জয় করিয়া শেষে প্রাগজ্যোতিষ দেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত কিরাত, চীন ও সাগরপারী সৈন্য লইয়া আটদিন তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। তারপর অর্জুনের ক্ষমতা আর সাহসে আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'আমি ইন্দ্রের বন্ধু। লোকে বলে, আমার ইন্দ্রের সমান ক্ষমতা। কিন্তু তবুও তো তোমাকে কিছুতেই আঁটিতে পারিতেছি না। তুমি কী চাও?'

অর্জুন বলিলেন, 'আপনি ইন্দ্রের বন্ধু, সুতরাং আমার গুরুলোক, আপনাকে কি আমি কিছু বলিতে পারি? আপনি স্নেহ করিয়া কিছু কর দিন।'

ভগদত্ত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, 'কর তো দিবই, আর কী করিতে হইবে, বল।'

এইরূপে ভগদত্তকে বশ করিয়া অর্জুন আবার উত্তর দিকে চলিলেন। অন্তগিরি, বহির্গিরি, উলুক, কাশ্মীর, ত্রিগর্ত, দারু, কোকনদ, বাহ্লীক, দরদ, কম্বোজ, লোহ, পরম, ঋষিক প্রভৃতি কত দেশ জয় হইল। করই বা কত রকম আদায় হইল ! হিমালয় পর্বতের ওপারে কিম্পুরুষবর্ষ, হাটক প্রভৃতি কোনো দেশ হইতে কর না লইয়া ছাড়া হইল না।

তারপর অর্জুন উত্তর কুরুদেশে উপস্থিত হইলেন। সে অতি অদ্ভুত দেশ, সেখানে কোথায় কী আছে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং যুদ্ধ কী করিয়া হইবে? সেখানে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র পর্বতপ্রমাণ প্রহরীগণ আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিল, 'আপনি এখানে আসিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিয়াছি যে, আপনি সামান্য মানুষ নহেন। ইহাতেই আপনার এদেশ জয় করা হইয়াছে। এখন আপনার কী চাই বলুন, আমরা তাহাই দিতেছি।'

অর্জুন বলিলেন, 'মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য আমাকে কিছু কর দিলেই হইবে, আমি আর কিছু চাহি না।' এই কথা শুনিয়াই উহারা নানারূপ আশ্চর্য কাপড় আর হরিণের ছাল প্রভৃতি অর্জুনের নিকট উপস্থিত করিল।

এইরূপে ক্রমে সমস্ত উত্তর দিক জয় করিয়া অর্জুন কত ধনরত্ন দেশে আনিলেন তাহার লেখাজোখা নাই।

ভীম পূর্বদিকে গিয়া পঞ্চাল, বিদেহ, গণ্ডক, দশার্ণ, অশ্বমেধ, পুলিন্দ, চেদী, কুমার, কোশল,

অযোধ্যা, গোপালকক্ষ, মল্ল প্রভৃতি অল্পদিনের ভিতরেই জয় করিয়া ফেলিলেন। ভল্লাট, শক্তিমান, বৎসদেশ, ভর্গ প্রভৃতি আর কত দেশ দেখিতে দেখিতে তাঁহার বশে আসিল। কর্ণকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কর আনিতে বাকি রহিল না।

এইরূপে মণি-মুক্তা চন্দন কাপড়-কম্বল সোনা-রূপা প্রভৃতি নানারূপ জিনিস আনিয়া ভাণ্ডার বোঝাই করিয়া ফেলিলেন।

সহদেবও দক্ষিণ দিক জয় করিয়া কর আনিলেন। কিষ্কিন্ধ্যার বানরদিগের সহিত তাঁহার ক্রমাগত সাতদিন ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ; তথাপি বানরেরা হটে নাই বা ভয় পায় নাই। কিন্তু সহদেবের যুদ্ধ দেখিয়া তাহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইল। আর সহদেবকে অনেক ধনরত্ন দিয়া বলিল, 'এসব লইয়া তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, তোমার ভালো হউক।'

দক্ষিণে যাইতে যাইতে সহদেব শেষে সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হন। সেইখানে লঙ্কা ; বিভীষণ তখনও সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। এখানে কোনোরূপ যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ বিভীষণ সংবাদ পাইবামাত্র আহ্লাদের সহিত বোঝায় বোঝায় মহামূল্য মণিমুক্তা দিয়া সহদেবকে বিদায় করিলেন। নকুলও পশ্চিম দিক হইতে কম কর আনেন নাই। এক হাজার হাতি সে সকল ধন অতি কষ্টে বহিয়া আনিয়াছিল।

কৃষ্ণ ইহার পূর্বেই আসিয়া সকল রকম আয়োজন আরম্ভ করাইয়াছেন। রাজাদিগের নিকট নিমন্ত্রণ গিয়াছে ; পুরোহিতরা প্রস্তুত হইয়াছেন। যজ্ঞের জন্য চমৎকার স্থান প্রস্তুত হইয়াছে ; ভোজনের ঘটা লাগিয়া গিয়াছে। যজ্ঞের সময় ক্রমে যত কাছে আসিল, ততই নানা দেশের রাজারা, মুনিরা আর ব্রাহ্মণেরা দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

নকুল হস্তিনায় গিয়া জোড়হাতে মিষ্ট কথায় ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দুর্যোধন প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাও আনন্দের সহিত যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন। অন্য রাজা-রাজড়া কত যে আসিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। ইঁহাদের জন্য সুন্দর বাগানে ঘেরা, মণি-মুক্তোর কাজ-করা, সোনার দরজা-জানালা দেওয়া বিশাল বিশাল পুরী পূর্বেই বহুমূল্য আসন, গালিচা, পালঙ্ক প্রভৃতি দিয়া সাজানো ছিল। মিঠাই-মণ্ডার তো কথাই নাই। আর সুগন্ধের কথা কী বলিব—ফুলের গন্ধ, চন্দনের গন্ধ, ধূপের গন্ধ ! এক-একজন এক-একটা কাজে বিশেষ মজবুত, তাঁহাদের উপরে সেই সেই কাজের ভার পড়িয়াছে। দুঃশাসনের উপর খাবার জিনিস দেখাশুনার ভার, অশ্বত্থামার উপর ব্রাহ্মণদিগের আদর-যত্নের ভার, সঞ্জয়ের উপর রাজাদিগের সেবার ভার ; ভীষ্ম, দ্রোণ কাজের হুকুম দিবেন, কৃপাচার্য ধনরত্ন রক্ষা করিবেন। উপহার আসিলে দুর্যোধন লইবেন ; আর কৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণদিগের পা ধোয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

ক্রমে যজ্ঞের পূজা-অর্চনার কাজ শেষ হইয়া গেল। মহারাজ যুধিষ্ঠির যে যাহা চাহিল তাহাকে তাহা দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন।

তারপর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'রাজাদিগকে এবং যাঁহারা অর্ঘ্য (সম্মান দেখাইবার জন্য উপহার) পাইবার উপযুক্ত, তাঁহাদিগকে এক-একটি করিয়া অর্ঘ্য আনিয়া দাও। তারপর এখানে যিনি সকলের চেয়ে বড়, তাঁহাকে আর একটি অর্ঘ্য দিতে হইবে।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'সকলের চেয়ে বড় বলিয়া কাহাকে অর্ঘ্য দিব ?'

ভীষ্ম বলিলেন, 'কৃষ্ণই সকলের চেয়ে বড়। তাঁহার সমান মান্য লোক এখানে আর কেহই উপস্থিত নাই।'

তারপর ভীষ্মের কথায় সহদেব কৃষ্ণকে অর্ঘ্য আনিয়া দিলেন। কিন্তু চেদীর রাজা শিশুপালের ইহা কিছুতেই সহ্য হইল না, তিনি যুধিষ্ঠিরকেই বা কত বকিলেন, ভীষ্মেরই বা কত নিন্দা করিলেন, আর কৃষ্ণকেই বা কত অপমানের কথা বলিলেন। তারপর আর আর রাজাদিগকে লইয়া সেখানে হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেও ছাড়িলেন না।

রাজাদের মধ্যে অনেকে শিশুপালের সঙ্গে জুটিয়া যজ্ঞ ভাঙিবার আর কৃষ্ণকে মারিবার জন্য পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম উঁহারা শিশুপালকে বুঝাইয়া থামাইতে পারিলেন না। তাহাতে সহদেব রাগিয়া বলিলেন, 'যে কৃষ্ণের সম্মান সহ্য করিতে না পারে, আমি তাহার মাথায় পা তুলিয়া দেই।'

এইরূপে তর্ক আরম্ভ হইয়া ক্রমে বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইল। কৃষ্ণের উপর শিশুপালের অনেক দিন হইতেই রাগ ছিল, আর তিনি নানারকমে তাঁহাকে অপমান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কৃষ্ণ এতদিন তাহা সহিয়া থাকিবার কারণ এই যে, তিনি শিশুপালের মায়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'আপনার পুত্রের একশত অপরাধ ক্ষমা করিব।' শিশুপালের একশত অপরাধ ইহার পূর্বেই হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর তাহাকে ক্ষমা করিবার কোনো কারণ নাই।

শিশুপাল ভয়ানক অপমানের কথা বলিয়া কৃষ্ণকে গালি দিতে দিতে শেষে বলিলেন, 'আইস, আজ তোমাকে আর পাণ্ডবদিগকে যমের বাড়ি পাঠাইতেছি।'

তখন কৃষ্ণ সভার সকলকে বলিলেন, 'আমি অনেক সহিয়াছি, কিন্তু এতগুলি রাজার সম্মুখে এমত অপমান আমি কিছুতেই সহিতে পারিব না।'

তাহা শুনিয়া শিশুপাল হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে আরো বেশি অভদ্রভাবে কৃষ্ণকে গালি দিতে লাগিলেন।

এমন সময় চাকার মতোন একটা অতি ভয়ংকর জিনিস সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে হাতে করিয়া লইলেন। ইহা কৃষ্ণের সেই সুদর্শন চক্র নামক অস্ত্র ; কৃষ্ণ তাহাকে মনে মনে ডাকাতে অমনি উহা ছুটিয়া আসিয়াছে। আজ আর শিশুপালের রক্ষা নাই।

চক্র হাতে লইয়া কৃষ্ণ সকলকে বলিলেন, 'এই দুষ্টের একশত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, আর ক্ষমা করিব না। এই দেখুন ইহাকে বধ করিলাম।'

একথা বলিবামাত্রই চক্র ছুটিয়া গিয়া শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিল। সভার সকল লোক পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল ; কাহারও মুখে কথা সরিল না।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হইল। তারপর রাজারা দেশে চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গিয়াছেন,দুর্যোধন আর শকুনি তখনো যান নাই, তাঁহারা সভা দেখিতেছেন। এমন সভা দুর্যোধন আর কখনো দেখেন নাই। যত দেখেন ততই তাঁহার ধাঁ ধাঁ লাগিয়া যায়। ইহার মধ্যে কয়েকবার তিনি স্ফটিকের মেঝেকে জল মনে করিয়া কাপড় গুটাইয়াছেন ; আবার জলকে স্ফটিক ভাবিয়া কাপড়-চোপড়সুদ্ধ তাহাতে হাবুডুবু খাইয়াছেন। সকলে হাসিয়াছে, এবং যুধিষ্ঠিরের চাকরেরাও তাড়াতাড়ি তাহাকে অন্য কাপড় আনিয়া দিয়াছে।

স্ফটিকের দেওয়াল, তাঁহাকে দুর্যোধন মনে করিলেন বুঝি দরজা। তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইতে গিয়া মাথায় ঠকাস্ করিয়া এমনি লাগিল যে, একেবারে মাথা ঘুরিয়া পড়িবার গতিক। তারপর বেচারার আর ভালো করিয়া চলিতেই হয় না, খালি 'কানামাছি ভোঁ-ভোঁ'র মতোন হওয়ায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পা বাড়াইতেছেন। এমনি করিয়া শেষে একবার একেবারে

বাহিরে গিয়া ধপাস! তারপর দরজা দেখিলেই আগে থাকিতে দাঁড়ান।

বাস্তবিক এমন করিয়া নাকাল হইলে বড্ড রাগ হয়! অথচ সে রাগ দেখাইবার জো নাই, কারণ তাহাতে লোক হাসে। কাজেই দুর্যোধন জিভ ঠোঁট কামড়াইয়া কোনোমতে রাগ হজম করিয়া সেখান হইতে বিদায় হইলেন। এদিকে কিন্তু হিংসায় তিনি জ্বলিয়া মরিতেছেন। পথে শকুনি তাঁহাকে কত কথা বলিয়াছেন, তিনি কিছুরই উত্তর দেন নাই। শেষে শকুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে দুর্যোধন? কথা কহিতেছ না যে?'

দুর্যোধন বলিলেন, "মামা, কথা কহিব কোন লজ্জায়? আমার কি আর বাঁচিয়া লাভ আছে? যে শত্রুকে মারিতে এত চেষ্টা করিলাম, তাহারই কিনা এত বাড়াবাড়ি!'

শকুনি বলিলেন, 'সে কি দুর্যোধন! উহারা নিজের গুণে বড় হইয়াছে, তাহাতে তোমার দুঃখ কেন? ইচ্ছা করিলে তুমিও তো ঐরূপ করিতে পার।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'মামা, যুদ্ধ করিয়া উহাদের সভা আর রাজ্য কাড়িয়া লই!'

শকুনি বলিলেন, 'কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ আর ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইহাদিগকে দেবতারা যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারেন না, তুমি কী করিয়া করিবে? ইহাদিগকে জব্দ করিবার অন্য উপায় আছে।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'কী উপায় মামা?'

শকুনি বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার বড় শখ; অথচ তিনি ভালো খেলিতে জানেন না। আবার, পাশা খেলায় ডাকিলে তাঁহার 'না' বলিবার জো থাকিবে না। একটিবার আনিয়া তাঁহাকে খেলিতে বসাইতে পারিলে আমি ফাঁকি দিয়া তাঁহার রাজ্যপাট সব জিতিয়া লইতে পারিব। আমার মতো পাশা পৃথিবীতে কেহ খেলিতে জানে না। আগে তুমি তোমার বাবাকে বলিয়া খেলার অনুমতি লও, তারপর আমি সব ঠিক করিয়া দিব।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'বাবাকে বলিতে আমার সাহস হয় না, আপনি বলুন।'

শকুনি বাড়ি আসিয়াই ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'দুর্যোধন তো বড়ই রোগা হইয়া যাইতেছে। আপনি সে খবর নেন না?'

অমনি ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া দুর্যোধনকে বলিলেন, 'আহা! বাছার তো বড়ই অসুখ হইয়াছে! কী অসুখ বাবা?'

দুর্যোধন বলিলেন, 'বাবা, আমার ভয়ানক অসুখ হইয়াছে। আপনার চেয়ে পাণ্ডবেরা বড় হইয়া গেল, একথা ভাবিলে কি আর আমি ভালো থাকিতে পারি? উহাদের বাড়িতে রোজ দশ হাজার লোক সোনার থালায় পোলাও খায়। উহাদের মতো এত ধন ইন্দ্রেরও নাই, যমেরও নাই, বরুণেরও নাই, কুবেরেরও নাই। কাজেই আমার যারপরনাই ভয়ানক অসুখ হইয়াছে।'

তখন শকুনি বলিলেন, আমি পাশা খেলিয়া উহাদের সব ধন জিতিয়া দিতে পারি। ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে বা পাশায় ডাকিলে তাহার 'না' বলিবার জো থাকে না। যুধিষ্ঠিরকে আমরা পাশায় ডাকিলে তাহাকে আসিতেই হইবে। অথচ সে খেলিতে জানে না; কাজেই আমি ফাঁকি দিয়া তাহার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারিব।'

একথায় ধৃতরাষ্ট্র সহজে রাজি হন নাই। তাঁহার নিজেরও এ কাজটা ভালো লাগিল না। তারপর বিদুরকে ডাকিলেন, তিনিও বার বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের পীড়াপীড়িতে ধৃতরাষ্ট্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আর নিজের মনেও পাণ্ডবদের প্রতি যথেষ্ট হিংসা

ছিল! কাজেই তিনি শেষে বলিলেন, 'হাজার থাম আর এক শত দুয়ারওয়ালা একটা খুব জমকালো সভা প্রস্তুত করাও।'

সভা অল্পদিনের মধ্যেই প্রস্তুত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিলেন, 'বিদুর, শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।'

বিদুর বলিলেন, 'মহারাজা, ইহা তো ভালো কথা হইল না। পাশা খেলা বড় অন্যায়। উহাতে বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে।'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'কী হইবে? আমরা তো থাকিব। তুমি শীঘ্র যাও।'

সুতরাং বিদুর আর কী করেন! তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে পাশা খেলিতে ডাকিয়াছেন, তুমি চল।'

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'কাকা, পাশা খেলা কী ভালো? আপনি কি অনুমতি করেন?'

বিদুর বলিলেন, 'আমি অনেক নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি আমাকে পাঠাইলেন। এখন তোমার যাহা ভালো মনে হয়, কর।'

যুধিষ্ঠির অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আমাকে যখন পাশা খেলিতে ডাকিয়াছেন, তখন আর না গিয়া উপায় নাই। কিন্তু উহারা বড় ধূর্ত, খেলার সময় ফাঁকি দেয়। না যাইবার উপায় থাকিলে আমি কখনই যাইতাম না।'

পরদিন ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লইয়া যুধিষ্ঠির বিদুরের সহিত হস্তিনায় আসিলেন। তাহার পরের দিন সকালে খেলা হওয়ার কথা। এই খেলা পণ অর্থাৎ বাজি রাখিয়া হয়। খেলিবার পূর্বে এইরূপ কথা হয় যে, 'আমি হারিলে তোমাকে এই জিনিস দিব, আর তুমি হারিলে আমাকে এই জিনিস দিবে।'

সেইভাবে যথাসময়ে খেলা আরম্ভ হইল।

যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা দেখিবার জন্য সভায় লোকের বড়ই ভিড় হইয়াছে। অনেক রাজা, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং সাধারণ লোক সেখানে উপস্থিত। পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই সভার মাঝখানে বসিয়াছেন, তাঁহাদের সামনেই শকুনিকে সর্দার করিয়া দুর্যোধনের দল।

শকুনি বলিলেন, 'যুধিষ্ঠির, সকলে বসিয়া আছেন, খেলা আরম্ভ কর।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'তোমরা সরলভাবে খেলা করিও, ফাঁকি দিও না যেন।'

শকুনি বলিলেন, 'যাহার বেশি বুদ্ধি সেই-ই ফাঁকি দেয়। ইহাতে দোষের কথা কী হইল? তোমার যদি ভয় থাকে তবে না হয় খেলিও না।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'ডাকিয়াছ যখন তখন খেলিতেই হইবে। কাহার সহিত খেলিব, বল।'

এ কথায় দুর্যোধন বলিলেন, 'পণের জিনিস সব আমি দিব, কিন্তু আমার হইয়া মামা খেলিবেন।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'একজনের হইয়া আর একজনের খেলা অন্যায়। যাহা হউক, খেলা আরম্ভ কর।'

খেলা আরম্ভ হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র সভায় আসিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতিও দুঃখিতভাবে তাঁহার সঙ্গে আসিলেন।

তারপর যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বলিলেন, 'আমার গলার হার পণ রাখিলাম, তুমি কী রাখিলে?'

দুর্যোধন বলিলেন, 'আমারও অনেক ধন-রত্ন আছে। এখন তুমি বাজি জিতিলেই হয়।'

এই কথা বলিতে-বলিতেই অমনি শকুনি পাশা ফেলিলেন : 'এই দেখ জিতিলাম।' সকলে দেখিল, বাস্তবিকই শকুনির জিৎ।

ইহাতে যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আইস, আবার খেলিতেছি। এবারে এক লক্ষ আট হাজার সোনার কুম্ভ, আর আমার ভাণ্ডারের সকল ধনরত্ন পণ রহিল।' শকুনি তখনই 'এই জিতিলাম' বলিয়া সে সব জিতিয়া লইলেন। তাঁহার ফাঁকি কেহ ধরিতে পারিল না।

হায় হায়! পাশায় কী সর্বনাশ হইল! যুধিষ্ঠির যতই হারেন, ততই তাঁহার জেদ চড়িয়া যায়, আর ততই তিনি বলিলেন, 'আরো খেলিব!' ধূর্ত শকুনির জুয়াচুরি কাহারও ধরিবার সাধ্য নাই। পণ রাখিবামাত্রই তিনি 'এই জিতিলাম' বলিয়া পাশা ফেলেন, আর যুধিষ্ঠির হারিয়া যান।

এইরূপে ক্রমে তাঁহার দাসী গেল, চাকর গেল, হাতি গেল, ঘোড়া গেল, রথ গেল, সৈন্য গেল—সব গেল।

সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'মহারাজ, মরিবার সময় রোগী ঔষধ খাইতে চাহে না, আমার কথা হয়ত আপনার ভালো লাগিবে না। দুর্যোধন যে মারা যাইবার যোগাড় করিতেছে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? পাণ্ডবেরা একবার ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলে ছেলে-পিলে চাকর-বাকরসুদ্ধ যমের বাড়ি যাইতে হইবে। এইবেলা দুর্যোধনকে সাজা দিয়া পাণ্ডবদিগকে তুষ্ট করুন। একে তো পাশা খেলায় এত দোষ, তাহাতে শকুনি এমন জুয়াচোর! উহাকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে বলুন।' এ কথায় দুর্যোধন বিদুরকে ক্রোধভরে গালি দিতে আরম্ভ করিলে বিদুর বলিলেন, 'তোমাদের ভালোর জন্যই দুটা কথা বলিয়াছিলাম। দেখিতেছি তাহা তোমাদের পছন্দ হয় নাই। কাজ কি বাপু, তোমাদের যাহা খুশি তাহাই কর। তোমাকে নমস্কার।'

কাজেই আবার খেলা চলিল। যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো বিদ্বান বুদ্ধিমান আর ধার্মিক এই পৃথিবীতে আর কেহ ছিল না, সেই যুধিষ্ঠির পাশার ধাঁধায় পড়িয়া শেষে অবোধ মাতালের মতো কাজ করিতে লাগিলেন।

ধন গেলে গাই-বাছুর, তারপর লোকজন, তারপর রাজ্য, একে একে সব গেল। এইরূপে সর্বস্ব হারিয়া ফকির হইয়াও চৈতন্য নাই। শেষে একটি একটি করিয়া ভাইদিগকে হারিতে লাগিলেন।

কী দুর্দশা! শেষে শকুনি তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'পাশা খেলিতে গিয়া লোকে এমন পাগলামি করিতে পারে, একথা তো স্বপ্নেও জানিতাম না!'

কিন্তু ইহাতেও যুধিষ্ঠিরের দুর্গতির শেষ হয় নাই। ভাইদিগকে হারিয়া শেষে নিজেকে পর্যন্ত হারিলেন, তথাপি তাঁহার জেদ থামে না।

ভাবিতে দুঃখ আর লজ্জা হয়,—যখন আর অবশিষ্ট রহিল না, তখন দয়া ধর্ম সদাচার সকল ভুলিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'এবার দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম।'

একথা শুনিবামাত্র সভার সকল লোক 'ছিঃ ছিঃ' করিয়া উঠিল, রাজাগণের চোখে জল আসিল, লাজে আর দুঃখে আর অপমানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের শরীর ঘামিয়া গেল ; বিদুর হেঁটমুখে বসিয়া সাপের মতোন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

ভালো লোকদের মনে এইরূপ কষ্ট, আর নির্লজ্জ ধৃতরাষ্ট্র আনন্দে অস্থির হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, 'জয় হইল নাকি, জয় হইল নাকি?' কর্ণ, দুঃশাসন প্রভৃতি তখন

কিরূপ আনন্দ করিতেছিলেন, তাহা ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারেই বুঝিতে পার।

ধূর্ত শকুনি যখন পাশা খেলিয়া দ্রৌপদীকে অবধি জিতিয়া লইলেন, তখনি দুর্যোধন বিদুরকে বলিলেন, 'শীঘ্র দ্রৌপদীকে লইয়া আইস, হতভাগী আমাদের চাকরানীদের সঙ্গে গিয়া ঘর ঝাঁট দিক।'

বিদুর বলিলেন, 'মূর্খ, তোমার যে মরিবার গতিক হইয়াছে, একথা না বুঝিতে পারিয়াই তুমি এরূপ বলিতেছ। একথা নিতান্ত নীচ লোক ছাড়া আর কেহ বলে না।'

ইহাতে দুর্যোধন বিদুরকে গালি দিয়া একটা দারোয়ানকে বলিলেন, 'তুই দ্রৌপদীকে লইয়া আয়। তোর কোনো ভয় নাই।'

দারোয়ান দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিলেন, 'যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় আপনাকে দুর্যোধনের নিকট হারিয়াছেন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, ধৃতরাষ্ট্রের ঘর ঝাঁট দিতে হইবে।'

একথায় দ্রৌপদী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'তুই এ কী পাগলের মতো কথা বলিতেছিস! রাজারা কি স্ত্রীকে পণ রাখিয়া খেলা করে? যুধিষ্ঠিরের কি আর জিনিস ছিল না?'

দারোয়ান বলিল, 'যুধিষ্ঠির আগে ধন-দৌলত, তারপর ভাইদিগকে, তারপর নিজেকে হারিয়া শেষে আপনাকে হারাইয়াছেন।'

দ্রৌপদী বলিলেন, 'তুই সভায় গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি আগে নিজেকে, কি আগে আমাকে হারিয়াছেন।'

দারোয়ান সভায় আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল, 'দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আপনি কাহাকে আগে হারিয়াছেন—আপনার নিজেকে, না দ্রৌপদীকে?'

যুধিষ্ঠির চুপ করিয়া রহিলেন, একথার কোনো উত্তর দিলেন না।

তখন দুর্যোধন বলিলেন, 'দ্রৌপদীর যদি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে এখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করুক।'

দারোয়ান নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আবার দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, 'মা, এবার দেখিতেছি কৌরবের সর্বনাশ হইবে। দুষ্ট দুর্যোধন আপনাকে সভায় ডাকিয়াছে।'

দ্রৌপদী বলিলেন, 'বাছা, ভগবানই সব করেন। এ সময়ে আমি যেন ধর্ম রাখিয়া চলিতে পারি। তুমি আর একটিবার সভায় গিয়া ধার্মিক গুরুজনদিগকে জিজ্ঞাসা কর, এখন আমার কি করা উচিত। তাঁহারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।'

দারোয়ান আবার সভায় আসিয়া দ্রৌপদীর কথা বলিল, সকলে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। দুর্যোধনের ভয়ে কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সেই দুষ্ট আবার বলিল, 'তুই দ্রৌপদীকে এখানে লইয়া আয়।'

দারোয়ান দুর্যোধনের চাকর, তথাপি সে তাঁহার কথায় কান না দিয়া আবার সকলকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি দ্রৌপদীকে কী বলিব?'

তখন দুর্যোধন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এ বেটা দেখিতেছি বড়ই ভীতু। দুঃশাসন, তুমি গিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া আইস।'

বলিবামাত্র সেই দুষ্ট দুই চোখ লাল করিয়া দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, 'আমরা তোমাকে জিতিয়া লইয়াছি। চল! সভায় চল!'

দুঃশাসনের ভাব-গতিক দেখিয়া দ্রৌপদী ভয়ে তাড়াতাড়ি গান্ধারী প্রভৃতির নিকট আশ্রয়

লইতে গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই দুরাত্মা তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে সভায় লইয়া চলিল। তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কত মিনতি করিয়া বলিলেন, 'দুঃশাসন, তুমি আমাকে এমন করিয়া সভায় লইয়া যাইও না।' কিন্তু হায়! সে দুষ্টের মনে কিছুতেই দয়া হইল না। সে দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল, 'তোকে জিতিয়া লইয়াছি। এখন তো তুই আমাদের দাসী! চল্!' এই বলিয়া দুরাত্মা আরো নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল।

হায় হায়! তখন কেহই সেই দুরাত্মার মাথা কাটিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিলেন না। দ্রৌপদী 'হা কৃষ্ণ! হা অর্জুন!' বলিয়া কত কাঁদিলেন, সকলই বৃথা হইল।

এইরূপে দুঃশাসন তাঁহাকে সভায় উপস্থিত করিলেও কেহই তাহাকে নিষেধ করিলেন না। তখন দ্রৌপদী বলিলেন, 'ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম, আমার স্বামী তাহার মতোই কাজ করিয়াছেন, তাঁহার দোষ কী? কিন্তু এই দুরাত্মা আমাকে অপমান করিয়াছে দেখিয়াও যখন সভার সকলে চুপ করিয়া আছেন, তখন বুঝিলাম যে, কুরুবংশের লোকেরা ধর্ম ভুলিয়া গিয়াছে,—ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ইঁহাদের আর তেজ নাই।'

দ্রৌপদীর অপমানে পাণ্ডবেরা ক্রোধে অধীর হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মুখে কথা নাই। এদিকে সেই পাষণ্ড দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে তাঁহাকে অজ্ঞান-প্রায় করিয়া 'দাসী দাসী' বলিয়া হাসিতেছে, আর কর্ণ ও শকুনি বলিতেছে, 'বেশ, বেশ!'

ভীষ্ম দ্রৌপদীকে বলিলেন, 'যুধিষ্ঠির তোমাকে পণ্য রাখিয়া খেলিতে পারেন কি না, একথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি অতিশয় ধার্মিক, কখনো অধর্মের কাজ করেন নাই। তিনি নিজেই শকুনির সহিত খেলিতে আসিয়াছেন, আর তোমার অপমান দেখিয়াও চুপ করিয়া আছেন। কাজেই আমি বুঝিতেছি না, কী বলিব।'

দ্রৌপদী বলিলেন, 'উহাকে দুষ্টেরা ডাকিয়া আনিল, তথাপি কী করিয়া বলিতেছেন যে উনি নিজেই খেলিতে আসিয়াছেন? আর তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া হারাইয়াছে। আপনাদের অনেকেরই পুত্র আর পুত্রবধূ আছেন; তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আমার কথা বিচার করুন।' এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে থাকিলে দুঃশাসন তাঁহাকে আরো অপমান করিতে লাগিল।

তখন ভীম আর সহিতে না পারিয়া বলিলেন, 'দেখ যুধিষ্ঠির, তোমার দোষেই দ্রৌপদীর এত অপমান হইল। যে হাতে তুমি পাশা খেলিয়াছ, সে হাত আজ পোড়াইয়া ফেলিব! সহদেব, শীঘ্র আগুন আন!'

অর্জুন অমনি ভীমকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'কর কী দাদা! চুপ্ চুপ্! ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রাখিতে গিয়াই উনি এরূপ করিয়াছেন, তাহা কি বুঝিতেছ না?' ভীম বলিলেন, 'ধর্ম রাখিতে গিয়াছেন বলিয়াই তো এতক্ষণ ইঁহার হাত পোড়াই নাই।

এমন সময় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিকর্ণ বলিলেন, 'আপনারা চুপ করিয়া আছেন কেন? দ্রৌপদীর কথার বিচার করুন। আমার তো বোধ হয় যুধিষ্ঠিরের দ্রৌপদীকে ওরূপ করিয়া পণ রাখার কোনো ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং তিনি হারিলেও দ্রৌপদীর তাহা মানিয়া চলার কথা নহে।'

একথায় সভার লোক চিৎকার করিয়া বিকর্ণের প্রশংসা আর শকুনির নিন্দা করিতে লাগিল। কিন্তু কর্ণ বিকর্ণকে গালি দিয়া দুঃশাসনকে বলিলেন, 'দুঃশাসন, তুমি উহাদের গায়ের কাপড় কাড়িয়া লও।'

একথা বলিবামাত্র পাণ্ডবেরা নিজ-নিজ চাদর কয়খানি ছাড়িয়া দিলেন। দ্রৌপদীর গায়ের কাপড় দুঃশাসন নিজেই কাড়িয়া লইতে গিয়াছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! দেবতার কৃপায় সে সময়ে তাঁহার গায়ে এতই কাপড় হইল যে, দুঃশাসন প্রাণপণে টানিয়াও তাহা শেষ করিতে পারে না। সে যত টানে, ততই লাল নীল হলদে সোনালি, নানা রঙের হইয়া কাপড় বাড়িয়া যায়। শেষে অপ্রস্তুত হইয়া হতভাগা বসিয়া পড়িল।

এদিকে এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া সভায় ঘোরতর কলরব উপস্থিত হইয়াছে। রাজাগণ দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে করিতে দুঃশাসনকে গালি দিতেছেন, আর ভীম রাগে অস্থির হইয়া কাঁদিতেছেন। তারপর সভার সকলকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, 'তোমরা সকলে শোন! আমি ভীষণ যুদ্ধে এই দুরাত্মা দুঃশাসনের বুক চিরিয়া তাহার রক্ত খাইব, তবে ছাড়িব। যদি না খাই তবে যেন আমার স্বর্গলাভ না হয়।'

এমন সময় বিদুর দুই হাত তুলিয়া সকলকে থামাইয়া বলিলেন, 'দ্রৌপদী এমন করিয়া কাঁদিতেছেন তবুও আপনারা কথা কহিতেছেন না, এ কাজটা কি ভালো হইল? শীঘ্র বিচার করুন।'

তথাপি সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। তখন কর্ণের কথায় আবার দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে ঘরে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। এইরূপে দ্রৌপদীকে তাহারা কত অপমান, আর পাণ্ডবদিগকে কত প্রকার বিদ্রূপ করিল, তাহা বলিয়া তোমাদিগকে কষ্ট দিব না। যুধিষ্ঠির অর্জুন নকুল আর সহদেব সমস্তই চুপ কারিয়া সহ্য করলেন। কিন্তু ভীম রাগী লোক, তিনি তাহা সহিতে পারিবেন কেন? যখন যুধিষ্ঠিরকে অপমান করিয়াও দুর্যোধনের মন উঠিল না, তিনি আবার হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীকে পা দেখাইলেন আর তাহা দেখিয়া কর্ণ হাসিতে লাগিলেন, তখন ভীম আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ভয়ংকর শব্দে সভা কাঁপাইয়া বলিলেন, 'আমি যদি গদা দিয়া এই দুষ্টের উরু না ভাঙি, তবে যেন আমার স্বর্গে যাওয়া না হয়।' এতক্ষণে কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এসকল ঘটনার ফল ভয়ংকর হইবে ; তখন ধৃতরাষ্ট্র প্রাণের ভয়ে আর নিন্দার ভয়ে দুর্যোধনকে তিরস্কার করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন, 'মা, তুমি আমার বধূগণের সকলের বড়, বল, তুমি কী চাও।'

দ্রৌপদী বলিলেন, 'যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তবে যুধিষ্ঠিরকে ছাড়িয়া দিন।' ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'তাহাই হইবে। তুমি কী আর কী চাহ, বল।'

দ্রৌপদী বলিলেন, 'ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবকে তাঁহাদের অস্ত্রসুদ্ধ ছাড়িয়া দিন।'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'তাহাই হইবে। তুমি আর কী চাহ, বল।'

দ্রৌপদী বলিলেন, 'আমি আর কিছুই চাহি না। ইহারা মুক্তি পাইলেই আমার সব পাওয়া হইল।'

তারপর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'মহারাজ, এখন আমাদিগকে কী অনুমতি করেন।'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'তোমার মঙ্গল হউক। তুমি তোমার রাজ্য ধন সমস্ত লইয়া গিয়া সুখে রাজত্ব কর।'

এইরূপে যুধিষ্ঠির সেখান হইতে বিদায় লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিলেন, কিন্তু দুর্যোধন, কর্ণ আর শকুনির ইহা সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা বলিলেন, 'এত কষ্ট করিয়া যাহা জিতিলাম, এত সহজেই তাহা লইয়া যাইবে? এ কখনো হইতে পারে না!'

দুষ্ট লোক না করিতে পারে এমন এমন কাজ নাই। তিন দুষ্ট মিলিয়া তখনি আবার ধৃতরাষ্ট্রের মতো ফিরাইয়া দিল। স্থির হইল, আবার যুধিষ্ঠিরকে পাশায় ডাকিতে হইবে। এবার পণ বনবাস। যে হারিবে সে হরিণের ছাল পরিয়া তের বৎসর বনবাস করিবে। এই তের বৎসরের শেষ বৎসর অজ্ঞাত বাস, অর্থাৎ এমনভাবে লুকাইয়া থাকা, যেন কেহ সন্ধান না পায়। সন্ধান পাইলে আবার বার বৎসর বনবাস। বনবাসের পর অবশ্য আবার আসিয়া রাজ্য পাইবার কথা রহিল। কিন্তু দুর্যোধন স্থির করিয়া রাখিলেন যে, একবার পাণ্ডবদিকে তাড়াইলে আর তাঁহাদিগকে রাজ্যে ঢুকিতে দিবেন না। ডাকিলেই যখন খেলিতে হইবে, তখন কাজেই যুধিষ্ঠিরকে আবার আসিতে হইল, আর সেই ধূর্ত শকুনির ফাঁকিতে হারিয়া তের বৎসরের জন্য বনেও যাইতে হইল। যাইবার সময় দুষ্টেরা সকলে মিলিয়া পাণ্ডবদিকে কম বিদ্রূপ করে নাই। পাণ্ডবেরা তখন কীভাবে চলিতেছেন, দুর্যোধন কতই ভঙ্গিতে তাহার নকল করিলেন।

তাহাতে ভীম বলিলেন, 'মূর্খ, তোমাদের বিদ্রূপে আমাদের কোনো ক্ষতি হইবে না। আবার বলিতেছি, যুদ্ধের সময় তোমাকে বধ করিব, আর দুঃশাসনের বুক চিরিয়া রক্ত খাইব !'

অর্জুন বলিলেন, আমি কর্ণকে মারিব। হিমালয় যদি নড়িয়া যায়, সূর্যও যদি নিবিয়া যায়, তথাপি একথা মিথ্যা হইবে না।'

সহদেব শকুনিকে বলিলেন, 'দুষ্ট তুই নিশ্চয় জানিস, আমি তোকে বধ করিব।'

যুধিষ্ঠির সকলের নিকট, এমনকি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিকটও বিনয়ের সহিত বিদায় চাহিয়া বলিলেন, 'আবার আসিয়া আপনাদের সহিত দেখা করিব।' লজ্জায় কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে মনে সকলেই তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

বিদুর বলিলেন, 'কুন্তী বনে গেলে বড় ক্লেশ পাইবেন, তাঁহাকে আমার নিকট রাখিয়া যাও।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমার পিতা নাই, আপনিই আমাদের পিতার মতোন। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই হউক। আমাদিকে আর কী উপদেশ দেন?' বিদুর বলিলেন, 'তোমার মতো ধার্মিক লোককে আর বেশি উপদেশ কী দিব? আশীর্বাদ করি, তোমাদের ভালো হউক।'

কুন্তীর নিকট বিদায় লইবার সময় সকলেরই খুব কষ্ট হইয়াছিল, বিশেষতঃ কুন্তীর। তাঁহার কান্নায় বুঝি তখন পাষাণও গলিয়াছিল।

এইরূপে সকলের নিকট বিদায় লইয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত বনবাস যাত্রা করিলেন।

দুষ্ট দুঃশাসনের টানে দ্রৌপদীর মাথার বেণী খুলিয়া গিয়াছিল, সে বেণী তিনি আর বাঁধেন নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সেই দুরাত্মাগণের উচিত শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহা আর বাঁধিবেন না।

পাণ্ডবেরা চলিয়া গিয়াছেন, ধৃতরাষ্ট্র বিদুর প্রভৃতিকে লইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ নারদ অন্যান্য অনেক মুনির সহিত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আজ হইতে তের বৎসর পরে চতুর্দশ বৎসরে দুর্যোধনের দোষে ভীমার্জুনের হাতে কৌরবদের সকলের মৃত্যু হইবে।'

এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন, আর ধৃতরাষ্ট্র বসিয়া নিজের দুর্বুদ্ধির কথা ভাবিতে লাগিলেন।

বনপর্ব

পাণ্ডবেরা সকলের নিকট বিদায় লইয়া অস্ত্রহাতে ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিতে লাগিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দজন চাকরও সপরিবারে গাড়ি চড়িয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। তখন অনেক ধার্মিক ব্রাহ্মণ কৌরবদিগের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এই দুষ্টগণের রাজ্যে বাস করিতে নাই, আমারও পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যাইব।'

এই সকল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের আনন্দও হইল, কষ্টও হইল। নিজেদের এইরূপ অবস্থা, কী খাইবেন তাহার ঠিক নাই, তাহার উপর রোজ এতগুলি ব্রাহ্মণের আহার যোগানো তো সহজ কথা নহে। তাই যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন, 'আপনারা আমাদিগকে এত স্নেহ করিয়া আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন, কিন্তু বনের ভিতরে আপনাদিগকে কী দিয়া খাওয়াইব, তাহা ভাবিয়া আমি অস্থির হইতেছি। আমাদের সঙ্গে আসিলে আপনাদের ক্লেশ হইবে, আপনারা ঘরে ফিরিয়ে যান।'

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা আপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমাদের আহারের জন্য আপনার কোনো চিন্তা নাই, আমার ভিক্ষা করিয়া খাইব।'

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৌম্যকে বলিলেন, 'ইহাদিগকে খাইতে দিবার শক্তি আমার

নাই, অথচ ইহাদিগকে ছাড়িতেও পারিতেছি না। এখন উপায় কী বলুন।'

ধৌম্য বলিলেন, 'মহারাজ, সূর্যের পূজা করুন, ইহার উপায় হইবে।'

একথায় যুধিষ্ঠির সূর্যের পূজা আরম্ভ করিতে সূর্যদেব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমি তোমার পূজায় তুষ্ট হইয়া এই থালিখানা আনিয়াছি। আমার আশীর্বাদে এই থালির গুণে বার বৎসর তোমার অন্নের চিন্তা থাকিবে না। প্রতিদিন দ্রৌপদী যতক্ষণ না আহার করিবেন, ততক্ষণ এই থালির নিকট ফল-ফুলুরি, মাংস-মিঠাই যত চাও ততই পাইবে। তের বৎসর পরে তোমার রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।' এই বলিয়া আকাশে মিলিয়া গেলেন।

সে আশ্চর্য থালি পাইয়া আর যুধিষ্ঠিরের অন্নের চিন্তা রহিল না। বার বৎসর পর্যন্ত যতক্ষণ দ্রৌপদীর খাওয়া না হইত ততক্ষণ উহা নানারূপ খাবার জিনিসে পরিপূর্ণ থাকিত। যত লোকই আসুক না কেন, উহা শেষ করিতে পারিত না। দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হওয়ামাত্রই সব ফুরাইয়া যাইত।

পাণ্ডবেরা প্রথম যে বনে বাস করেন, তাহার নাম কাম্যক বন। সেইখানে একদিন বিদুর আসিয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে বিদুরকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইয়াছিল, বুঝিবা আবার পাশা খেলিবার ডাক আসে। কিন্তু বিদুর সেজন্য আসেন নাই। পাণ্ডবদিগের সহিত বন্ধুত্ব করার কথা বলাতে ধৃতরাষ্ট্র রাগিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। খালি পাণ্ডবদের হইয়া কথা বল, তোমার মন বড় কুটিল।' তাই বিদুর পাণ্ডবদিগকে খুঁজিতে খুঁজিতে কাম্যক বনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এদিকে বিদুর চলিয়া আসাতে ধৃতরাষ্ট্র বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। বিদুরকে তিনি ভালোবাসিতেন, আর বিদুরের মতোন একজন বুদ্ধিমান লোক পাণ্ডবদের দলে গেলে তাহাদের বল খুবই বাড়িয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার যথেষ্ট ভাবনাও হইয়াছিল। সুতরাং তিনি সঞ্জয়কে ডাকিয়া বলিলেন, 'সঞ্জয়, শীঘ্র বিদুরকে ফিরাইয়া আন, নহিলে আমি বাঁচিব না।'

কাজেই বিদুরকে আবার আসিতে হইল। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন বলিলেন, 'ঐ দেখ আপদ আবার আসিয়াছে! বন্ধুসকল, শীঘ্র একটা কিছু কর, নহিলে এ কখন বাবাকে দিয়া পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আনে তাহার ঠিক কী!'

কিন্তু কর্ণের একথা পছন্দ হইল না। তাঁহার ইচ্ছা পাণ্ডবদিগকে এখনি গিয়া মারিয়া আসেন। কারণ, এখন তাঁহাদের দুঃখের অবস্থা ; সহায় নাই ; আর মনে কষ্ট, কাজেই তেজ কম। এইবেলা তাঁহাদিকে মারিবার খুব সুবিধা।

এই কথায় সকলেই যারপরনাই উৎসাহের সহিত রথ সাজাইয়া পাণ্ডবদিগকে মারিতে চলিয়াছিল, উহার মধ্যে ব্যাসদেব সেখানে আসিয়া তাহাদিকে থামাইয়া দিলেন।

এদিকে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কিরূপে দিন যাইতেছে? বনটি বড়ই ভয়ানক। রাক্ষসের ভয়ে মুনি-ঋষিরা সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছেন। পাণ্ডবেরা সেখানে গিয়া দেখিলেন, ভয়ানক একটি রাক্ষস হাঁ করিয়া তাঁহাদের পথ আগলাইয়া গর্জন করিতেছে। দ্রৌপদী তো তাহাকে দেখিয়াই চক্ষু বুজিয়া প্রায় অজ্ঞান।

যুধিষ্ঠির রাক্ষসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? তোমার কী কাজ করিতে হইবে, বল।'

রাক্ষস বলিল, 'আর্‌র্‌রে মুহি কিড়্‌মিঢ়্‌ঢ়্‌ রে। মোর নাম কিড়্‌মিঢ়্‌ঢ়্‌ আছে!—বগ্‌গরে ভাই। তোহারা কে বটেক? তোদ্ধের্‌র্‌কে মুহি মজ্জাসে খাব!'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ‘কীর্মির, আমরা পাণ্ডুর পুত্র। আমাদের নাম যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব।’ ভীমের নাম নাম শুনিয়া রাক্ষস বলিল, ‘হ,....—অঃ। ব্‌ভীম? কোন্ বেট্টা ব্‌ভীম রে? উহার্‌রকেই তো মুহি আগ্‌গেমে খাব। বেট্টা মোর ভাইটাকে মারিলেক!’

ভীমের তাহাতে ভয় পাওয়ার কোনো কথাই নাই। তিনি ইহার পূর্বেই একটা গাছ লইয়া প্রস্তুত আছেন। তারপর যুদ্ধটাও খুব জমাট রকমই হইল, তাহার কথা আর বাড়াইয়া বলিবার দরকার নাই। এ রাক্ষসটা খুব জোয়ান ; হাত দিয়া, দাঁত দিয়া, নখ দিয়া, পাথর ছুঁড়িয়া সে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিল। শেষে ভীম তাহার হাত পা মোচড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বন্ বন্ শব্দে ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন, সে চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহার পর তাহার গলায় ভীমের হাতের দুই টিপ পড়িতেই কার্য শেষ।

পাণ্ডবদের বনবাসের সংবাদে সকলে নিতান্তই দুঃখিত হইলেন। কৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যদু বংশের আর পঞ্চাল দেশের আত্মীয়েরা এবং আরো অনেকে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে কৌরবদিগকে অনেক ধিক্কার দিলেন। উহারা সকলেই বলিলেন, ‘এই দুষ্টদিগকে মারিয়া আমরা যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিব।’

মুনি-ঋষিরা সর্বদাই পাণ্ডবদিকে দেখিতে আসিতেন। সাধারণ লোকেরাও দলে দলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেই বনেই থাকিয়া যাইত।

কাম্যক বনেই যে তাঁহারা আগাগোড়া ছিলেন, তাহা নহে। কখনো কাম্যক বনে, কখনো দ্বৈত বনে, কখনো বা নানান তীর্থে এইরূপে ঘুরিয়া-ফিরিয়া তাঁহারা সময় কাটাইতেন। একস্থানে অধিক দিন থাকিলে ফল-মূল মিলানো কঠিন হয়, শিকারও ফুরাইয়া যায় ; কাজেই ঘুরিয়া বেড়াইবার বিশেষ দরকার ছিল।

বনে থাকায় খুবই কষ্ট, তাহাতে সন্দেহ কী? আর শত্রুদিগকে সাজা দিবার ইচ্ছাও সকলেরই হয়। সুতরাং দ্রৌপদী যে পাণ্ডবদিগের দুঃখ দেখিয়া কাতর হইবেন আর শত্রুদিগকে তাড়াইয়া নিজের রাজ্য লইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে বার বার পীড়াপীড়ি করিবেন, ইহা আশ্চর্য নহে। এসকল সময়ে ভীম সর্বদাই দ্রৌপদীর কথায় সায় দিতেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহাতে ব্যস্ত না হইয়া মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে বুঝাইতেন যে, ‘উহারা অন্যায় কাজ করিয়াছে বলিয়া পাণ্ডবদিগেরও তাহা করা উচিত নহে। ক্ষমা করাই যথার্থ ধর্ম, রাগের বশ হইয়া কাজ করিলে ধর্ম নষ্ট হয়।’

তাহা ছাড়া, যুধিষ্ঠির বেশ জানিতেন যে, দুর্যোধনের পক্ষে কর্ণ প্রভৃতি বড় বড় যে সকল বীর আছেন, তাঁহাদিগকে ইচ্ছা করিলেই হারাইয়া দেওয়া যায় না; ইহার জন্য বিশেষ আয়োজন চাই। তাই তিনি ভীমকে বলিলেন, ‘ভাই, কর্ণ যে কত বড় যোদ্ধা, একথা ভাবিয়া আমার ঘুম হয় না!’

একথার উত্তর দেওয়া ভীমের পক্ষেও সহজ ছিল না, তাই তিনি মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন।

এমন সময় ব্যাসদেব পাণ্ডবদিকে দেখিতে আসেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, ‘তোমাকে প্রতিস্মৃতি নামক বিদ্যা শিখাইয়া দিতেছি ; তুমি উহা অর্জুনকে শিখাইবে। উহার গুণে সে মহাদেব ইন্দ্র যম বরুণ কুবের প্রভৃতি দেবতাকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া সহজে বড় বড় অস্ত্র লাভ করিতে পারিবে।’

এই বিদ্যা পাইয়া পাণ্ডবদের মনে খুবই আশা হইল। যুধিষ্ঠিরের নিকট ইহা শিখিবার পর

অর্জুন তখনি তপস্যায় বাহির হইতে আর বিলম্ব করিলেন না। কবচ, গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণ প্রভৃতি লইয়া তিনি তপস্যায় বাহির হইলেন। যাত্রা করিবার সময় সকলে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন, 'তোমার সিদ্ধিলাভ হউক।'

তারপর অর্জুন হিমালয় আর গন্ধমাদন পর্বত পার হইয়া ইন্দ্রকীল নামক পর্বতে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় কোথা হইতে একটি কৃষ্ণকায় তপস্বী আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কে হে তুমি, ধনুর্বাণ লইয়া এখানে আসিয়াছ? এখানে ধনুর্বাণ দিয়া কী করিবে? উহা ফেলিয়া দাও।'

অর্জুন ইহাতে ধনুক বাণ না ফেলায় তপস্বী খুশি হইয়া বলিলেন, 'বাছা, বর লও, আমি ইন্দ্র।'

অর্জুন জোড়হাতে ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'আপনার নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতে আসিয়াছি। দয়া করিয়া আমাকে সেই বর দিন।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'আগে শিবকে সন্তুষ্ট কর, তারপর অস্ত্র পাইবে।' এই বলিয়া ইন্দ্র চলিয়া গেলেন; অর্জুন হিমালয়ের নিকটে আসিয়া শিবের তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

ক্রমাগত চারি মাস ধরিয়া তিনি অতি ভয়ংকর তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রথম মাসে তিন দিন অন্তর আহার করিতেন, দ্বিতীয় মাসে ছয় দিন অন্তর, তৃতীয় মাসে পনর দিন অন্তর। চতুর্থ মাসে কেবল বাতাস ভিন্ন আর কিছুই খান নাই; অঙ্গুষ্ঠ মাত্র ভর করিয়া উর্ধ্ব হস্তে সারাটি মাস দাঁড়াইয়া কেবল তপস্যা করিয়াছিলেন।

এদিকে সেখানকার মুনি-ঋষিগণের মনে বড়ই ভাবনা উপস্থিত। অর্জুনের সেই ভয়ানক তপস্যার তেজে ইহারই মধ্যে চারিদিকে ধোঁয়ার মতো হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা সকলে ব্যস্তভাবে শিবের নিকট গিয়া বলিলেন, 'প্রভো, আমরা অর্জুনের তপস্যার তেজ সহিতে পারিতেছি না, ইঁহাকে শীঘ্র থামাইয়া দিন!'

মহাদেব কহিলেন, 'তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি আজই অর্জুনকে সন্তুষ্ট করিয়া দিতেছি।' সুতরাং মুনিরা নিশ্চিত মনে ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

ততক্ষণে শিব আর দুর্গাও কিরাত-কিরাতিনীর বেশে অর্জুনের তপস্যার স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভূতগুলিও নানা সাজে সঙ্গে চলিয়াছে। এদিকে আবার কোথাকার একটা দানব শুয়োর সাজিয়া অর্জুনকে মারিতে আসিয়াছে, অর্জুনও গাণ্ডীব টানিয়া তাহাকে মারিতে প্রস্তুত। এমন সময় ব্যাধের বেশে মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—'আরে, থাম ঠাকুর! আমি আগে নিশানা করিয়াছি (ধনুকে তীর চড়াইয়া তাক করিয়াছি)!

সামান্য ব্যাধের কথা অর্জুনের গ্রাহ্যই হইল না। তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া শুয়োরের উপর তীর ছুঁড়িলেন। ব্যাধ ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গেই এক তীর ছুঁড়িল। এখন এই কথা লইয়া দুইজনে ভয়ানক তর্ক উপস্থিত।

অর্জুন বলিলন, 'আমার শিকারে তুমি কেন তীর ছুঁরিতে গেলে? দাঁড়াও তোমাকে সাজা দিতেছি!'

ব্যাধ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমি আগে নিশানা করিয়াছিলোম, আমার তীরেই শুয়োর মরিয়াছে। তুমি দেখিতেছি বেয়াদব! দাঁড়াও, তোমাকে সাজা দিতেছি!'

একথায় অর্জুন বিষম রাগিয়া ব্যাধের উপরে কতই বাণ মারিলেন। ব্যাধ বাণ খাইয়া খালি

হাসে আর বলে, 'আরো মার্! দেখি তোর কত অস্ত্র আছে।

অর্জুনের যত বড় বড় বাণ, ভারী ভারী অস্ত্র ছিল, তিনি তাহার কোনোটাই ছুঁড়িতে বাকি রাখিলেন না। ব্যাধ বাণ খায়, আর কেবলই হাসে।

অর্জুনের এমন যে অক্ষয় তূণ, ক্রমে তাহাও খালি হইয়া গেল। কিরাত তাঁহার সকল বাণ গিলিয়া খাইয়া তখনো হাসিতেছে। বাণ ফুরাইলে অর্জুন গাণ্ডীব দিয়াই কিরাতকে মারিতে গেলেন, সে সর্বনেশে মানুষ তাহাও কাড়িয়া লইল। তারপর খড়্গ লইয়া দু-হাতে কিরাতের মাথায় মারিলেন—খড়্গ দু-খানা হইয়া গেল। সকল অস্ত্র শেষ হইলে গাছ পাথর ছুঁড়িতে লাগিলেন, তাহাতেও কিছু ফল হইল না। শেষে ভয়ানক রাগের ভরে কিরাতকে জড়াইয়া ধরিতে গেলে সে তাঁহাকে ধরিয়া এমনি চাপিয়া দিল যে, তাহাতে তিনি একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

জ্ঞান হইলে অর্জুন মাটির শিব গড়িয়া ফুলের মালা দিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সেই ফুলের মালা অর্জুনের গড়া শিবে না পড়িয়া একেবারে সেই কিরাতের মাথায় উপস্থিত। তাহা দেখিয়া অর্জুনও তাড়াতাড়ি তাহার পায়ে গিয়া পড়িলেন। কারণ তখন তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এ ব্যাধ নহে, স্বয়ং শিব। অর্জুন বলিলেন, 'প্রভো, না জানিয়া যুদ্ধ করিয়াছি, অপরাধ ক্ষমা করুন।'

মহাদেব বলিলেন, 'অর্জুন, আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই লও তোমার গাণ্ডীব। তোমার তূণও আবার অক্ষয় হইল। তুমি যথার্থ বীরপুরুষ, এখন বর লও।' অর্জুন বলিলেন, 'দয়া করিয়া আমাকে আপনার পশুপাত নামক অস্ত্র দান করুন।'

তখন মহাদেব তাঁহাকে সেই অস্ত্র দিয়া, তাহা ছাড়িবার এবং থামাইবার মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন। সে ভয়ংকর অস্ত্রের তেজে তখন ভূমিকম্প আর বজ্রপাতের মতো শব্দ হইয়াছিল।

অর্জুনকে অস্ত্র দিয়া মহাদেব চলিয়া গেলে পর বরুণ, কুবের, যম আর ইন্দ্রও সেখানে আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ অস্ত্র দিলেন। যমের দণ্ড, বরুণের পাশ প্রভৃতি অতি আশ্চর্য এবং ভয়ংকর অস্ত্র।

এ অস্ত্রসকল তো অর্জুন পাইলেন ; তারপর স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের এবং দেবতাদিগের নিকট কত আদর, কত সম্মান, কত শিক্ষা পাইলেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইন্দ্রের নিকট যে সকল আশ্চর্য অস্ত্র পাইয়ছিলেন তাহা দ্বারা অর্জুন নিবাত কবচ নামক দৈত্যদিগকে বধ করেন। তাহাতে দেবতাদের অনেক উপকার হয়। ইহা ছাড়া চিত্রসেন নামক গন্ধর্বের নিকট শিক্ষা করিয়া তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। আর ইহাতে তাঁহার কত উপকার হইয়াছিল, তাহা দেখিতে পাইবে। এইরূপে স্বর্গে তাঁহার পাঁচ বৎসর পরম সুখে কাটিয়া যায়।

এদিকে কাম্যক বনে পাণ্ডবেরা অর্জুনের কথা ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত দুঃখিতভাবে দিন কাটাইতেছেন। তিনি কোথায়, কীভাবে আছেন, কত দিনে ফিরিবেন, কিছুই তাঁহাদের জানা নেই, সুতরাং দুঃখ হইবারই কথা। মাঝে মাঝে কোনো ধার্মিক মুনি-ঋষি আসিলে তাঁহার সহিত কথাবার্তায় কয়েক দিন তাঁহাদের মন একটু ভালো থাকে। একবার বৃহদশ্ব মুনি আসিয়া তাঁহাদের নিকট কিছুদিন রহিলেন। ইনি আশ্চর্য রকম পাশা খেলিতে জানিতেন। এই সুযোগে যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট খুব ভালো করিয়া সেই খেলা শিখিয়া লইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে লোমশ মুনি স্বর্গ হইতে অর্জুনের সংবাদ লইয়া কাম্যক বনে আসেন। তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া অর্জুনের সম্বন্ধে পাণ্ডবদের ভয় দূর হইল।

লোমশ বলিলেন যে, অর্জুন পাণ্ডবদিগের নানারূপ তীর্থ দেখিয়া বেড়াইতে বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা লোমশ মুনির সঙ্গে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। ভারতবর্ষের প্রায় কোনো তীর্থই তাঁহারা দেখিতে বাকি রাখিলেন না। প্রভাস নামক তীর্থে কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। সেই সময় যদু বংশের সকলে পাণ্ডবদিগের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যত শীঘ্র পারেন তাঁহারা কৌরবদিগকে মারিয়া পাণ্ডবদিগকে রাজা করিবেন। তাঁহারা তখনি যুদ্ধ আরম্ভ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কৃষ্ণ অনেক বলিয়া-কহিয়া তাঁহাদিগকে থামাইয়া রাখিলেন। কারণ, পাণ্ডবেরা নিজেদের কথামতো বনবাস শেষ না করিয়া কিছুতেই রাজ্য লইতে সম্মত হইলেন না।

এইরূপে তীর্থ দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁহারা কৈলাস পর্বতের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সকল স্থান অতি ভয়ানক। একে তো পর্বতের উপর দিয়া চলাই খুব কঠিন, তাহাতে আবার যক্ষ রাক্ষসেরা ক্রমাগত সেখানে পাহারা দেয়। সুতরাং ভয়ের কথাই বটে। এ সময়ে ভীম সকলকে সাহস দিয়া বলিলেন, 'ভয় কী! চলিতে না পারিলে আমি পৃষ্ঠে করিয়া লইব।'

পাণ্ডবেরা গন্ধমাদন পর্বতে উঠিবামাত্র ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হইল। ঘোরতর গর্জনে হাওয়া চলিতেছে, পাথর ছুটিয়া আসিতেছে, চারিদিক অন্ধকার, প্রাণ থাকে কি যায়! ভীম অনেক কষ্টে দ্রৌপদীকে লইয়া একটা গাছ ধরিয়া রহিলেন। অন্যেরাও কেহ গাছ ধরিয়া, কেহ উইটিপি আঁকড়াইয়া, কেহবা গুহার ভিতর ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। এত শ্রম আর কষ্টের পর দ্রৌপদীর আর চলিবার শক্তি রহিল না। তাঁহার দুঃখে অন্য সকলেরও দুঃখের একশেষ হইল। তখন ভীম মনে মনে ঘটোৎকচকে ডাকিলেন। ডাকিবামাত্র ঘটোৎকচ অনেক রাক্ষস-সহ আসিয়া বলিল, 'বাবা, কেন ডাকিতেছ? কী করিতে হইবে?'

ভীম বলিলেন, 'বাছা, দ্রৌপদী চলিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে বহিয়া লইয়া চল।'

ঘটোৎকচ তখনি দৌপদীকে, আর তাহার সঙ্গের রাক্ষসেরা অন্য সকলকে কাঁধে লইয়া চলিল। ইহাদের সাহায্য না পাইলে পাণ্ডবদিগের খুবই কষ্ট হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উহারা তাঁহাদিগকে কঠিন স্থান পার করিয়া, বদরী নামক তীর্থে পৌঁছাইয়া দিল। এই স্থানের নিকট হইতেই অর্জুন স্বর্গে গিয়াছিলেন, আর এখানেই তাঁহার ফিরিয়া আসিবার কথা। সুতরাং পাণ্ডবেরা এখানেই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইহার মধ্যে একদিন কোথা হইতে এক আশ্চর্য পদ্মফুল আসিয়া দৌপদীর নিকট পড়িল। সে ফুলের এমনি চমৎকার গন্ধ যে, তাহা নাকে ঢুকিবামাত্রই প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া যায়। দৌপদী ফুলটি পাইয়া ভীমকে বলিলেন, 'চমৎকার ফুল! আমাকে এইরূপ আরো অনেকগুলি ফুল আনিয়া দিতে হইবে। আমি কাম্যক বনে লইয়া যাইব।'

এককথায় ভীম আহ্লাদের সহিত তখনি ফুল আনিতে চলিলেন। ফুলটি ঈশান কোণ (অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব কোণ) হইতে হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়াছিল, সুতরাং ভীম বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ দিকে গেলে আরো ফুল পাওয়া যাইবে। সেদিকে অনেক দূর গিয়া তিনি একটা প্রকাণ্ড সরোবরে উপস্থিত হইলেন। সরোবরে স্নান করিয়া তিনি আবার ফুলের খোঁজে চলিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, মস্ত একটা বানর তাঁহার পথের উপর শুইয়া আছে। বানরটাকে

তাড়াইবার জন্য ভীম সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বানর তাহা বড়-একটা গ্রাহ্য করিল না। সে খালি একটু মিটি-মিটি চাহিয়া বলিল, 'আহা! অমন চ্যাঁচাইও না, একটু ঘুমাইতে দাও। আমার অসুখ করিয়াছে।'

ভীম বলিলেন, 'আমি পাণ্ডুর পুত্র। লোকে আমাকে পবনের পুত্রও বলে। আমার নাম ভীম। তুমি কে?'

বানর একটু হাসিয়া বলিল, 'আমি বানর।'

ভীম বলিলেন, 'পথ ছাড়, নইলে সাজা পাইবে।'

বানর বলিল, 'বড় অসুখ করিয়াছে, উঠিতে পারি না। আমাকে ডিঙাইয়া চলিয়া যাও।'

ভীম বলিলেন, 'সকল প্রাণীর শরীরেই ভগবান আছেন। তোমাকে ডিঙাইলে তাঁহাকে অমান্য করা হইবে। তাহা আমি পারিব না।'

বানর বলিল, 'বুড়া হইয়াছি, উঠিতে পারি না। আমার লেজটা সরাইয়া পাশ দিয়া চলিয়া যাও।'

ভীম মনে মনে বলিলেন, 'বটে! আচ্ছা দাঁড়াও, এই লেজ ধরিয়া তোমাকে ধোপার কাপড় কাচা দেখাইতেছি!'

এই মনে করিয়া বাঁ হাতে বানরের লেজ ধরিলেন, কিন্তু তাহা নড়াইতে পারিলেন না তারপর দুই হাতে ধরিয়া টানিলেন, তবুও নড়াইতে পারিলেন না। প্রাণপণ করিয়া টানিলেন, তাঁহার চোখ বাহির হইয়া আসিবার গতিক হইল, ভ্রূ আর কপাল ভয়ানক কোঁচকাইয়া গেল, মুখ কালো হইয়া উঠিল, গা দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল—তবুও লেজ নড়িল না। তখন তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া জোড়হাতে বলিলেন, 'মহাশয়, আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি কে?'

বানর বলিল, 'আমি পবনের পুত্র। আমার নাম হনুমান।'

তখন ভীম তাড়াতাড়ি হনুমানের পায়ের ধুলা লইতে পারিলে বাঁচেন। হনুমান বড় ভাই, ভীম ছোটো ভাই, কাজেই দু-জনে দু-জনকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। ভীম বলিলেন, 'দাদা, শুনিয়াছি সমুদ্র পার হইবার সময় আপনার বড় ভয়ংকর চেহারা হইয়াছিল। সেই চেহারাটি আমি একবার দেখিতে চাই।'

হনুমান বলিলেন, 'ভাই, ও চেহারা দেখিয়া কাজ নাই; তুমি ভয় পাইবে।'

কিন্তু ভীম ছাড়িবেন কেন? তাঁহার যে বীর বলিয়া বেশ একটু অহংকার আছে। কাজেই শেষটা হনুমানকে সেই চেহারা দেখাইতে হইল।

কী ভয়ংকর বিশাল চেহারা! কোথায় বা তাঁহার মাথা, কোথায় তাঁহার লেজ। সে শরীর বন ছাড়াইয়া, পর্বত ছাড়াইয়া, আকাশ পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিল। জ্বলন্ত সোনার মতো তাহার তেজে ভীমের চক্ষু আপনা হইতেই বুজিয়া আসিল। তাহা দেখিয়া হনুমান বলিলেন, 'আর কাজ নাই, তাহা হইলে ভয় পাইবে।'

ভীম বলিলেন, 'সত্য দাদা, আমি আর তাকাইতে পারিতেছি না। এখন ওটাকে গুটাইয়া লউন।'

তখন হনুমান তাঁহার শরীর ছোট করিয়া ভীমের সহিত কোলাকুলি করিলেন। তারপর বলিলেন, 'ভাই, ঘরে যাও। দরকার হইলে আমাকে ডাকিও, আমি উপস্থিত হইব। যুদ্ধের সময়

তুমি সিংহনাদ করিলে আমি তাহা বাড়াইয়া দিব, আর অর্জুনের রথের চূড়ায় বসিয়া এমন চিৎকার করিব যে, তাহাতেই শত্রু আধমরা হইয়া যাইবে।'

হনুমান ভীমকে এই কথা বলিয়া, আর তাঁহাকে পদ্মফুলের সন্ধান বলিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কৈলাস পর্বতের উপরে কুবেরের সরোবরে এই ফুল ফোটে। ফুলগুলি সোনার, তাহার বোঁটা বৈদূর্যমণির ; আর তাহার গন্ধের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কুবেরের শত-শত রাক্ষস-প্রহরী সরোবরে পাহারা দেয়। ইহারা ভীমকে নিষেধ করিয়া বলিল, 'হাঁ রে, ই কিমন লোক বটেক? কুবেরের মহারাজকু বলিলেক্ নি, পুছিলেক্ নি, আউ ফুল লেবেকে চলিলেক্!'

ভীম বলিলেন, 'কোথায় তোমাদের কুবের মহারাজ যে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব? আমার নাম ভীম, আমি পাণ্ডুর পুত্র। আমরা ক্ষত্রিয়, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করি না। পাহাড়ের উপর ফুল ফুটিয়াছে, তাহা তোমাদের কুবেরের যেমন, আমারও তেমনি। জিজ্ঞাসা আবার কাহাকে করিব?'

এই বলিয়া ভীম জলে নামিলেন। আর রাক্ষসেরাও অমনি 'ধর! মার! কাট! বাঁধ! খা!' বলিতে বলিতে তোমর-পট্টিশ হাতে, দাঁত কড়মড় করিতে করিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু ভীমের গদা যে কেমন জিনিস তাহা তাহারা জানিত না। সেই গদা ঘুটাইয়া ভীম যখন নিমেষের মধ্যে একশটা রাক্ষসের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন, তখন আরগুলি অস্ত্র-শস্ত্র ফেলিয়া চ্যাচাইতে চ্যাচাইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে কুবেরের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। কুবের তাহাদের নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, 'আমি জানি, ভীম দ্রৌপদীর জন্য ফুল নিতে আসিয়াছেন। উহার যত ইচ্ছা ফুল লইয়া যাইতে দাও।'

সুতরাং রাক্ষসেরা ভীমকে আর বাধা দিল না, তিনি সাধ মিটাইয়া ফুল লইলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা ভীমের বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঘটোৎকচের সাহায্যে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কুবেরের কথায় কিছুদিন তাঁহাদিগকে সেই স্থানে থাকিতে হইল। তারপর সেখান হইতে বিদায় লইয়া আবার বদরিকাশ্রমে আসিয়া তাঁহারা অর্জুনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ভীম আর একটা রাক্ষস মারেন। এটার নাম জটাসুর। হতভাগা এমনি চমৎকার ব্রাহ্মণ সাজিয়া আসিয়াছিল যে, পাণ্ডবেরা তাহাকে রাক্ষস বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাহাকে ব্রাহ্মণ মনে করিয়া আদরের সহিত রাখিয়াছেন, আর ইহার মধ্যে দুষ্ট কোনো সুযোগে একদিন যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব আর দৌপদীকে লইয়া ছুট দিয়াছে। তাহার সাজাটাও ভীমের হাতে সে তেমনি করিয়া পাইল।

তারপর ক্রমে অর্জুনের ফিরিবার সময় কাছে আসিলে পাণ্ডবেরা আবার গন্ধমাদন পর্বতে যান। ইহার কিছুদিন পরেই ইন্দ্রের রথে চড়িয়া অর্জুন স্বর্গ হইতে তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্জুনকে পাইয়া পাণ্ডবদের এবং দ্রৌপদীর সুখের সীমা রহিল না।

ইহার পরে পাণ্ডবেরা আবার কাম্যক বনে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার সময় অবশ্য পথে অনেক ঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কথা বিশেষ করিয়া বলিবার দরকার নাই। কেবল ভীম একটি সাপের মুখে পড়িয়া কিরূপ নাকাল হইয়াছিলেন, তাহা একটু শুন।

বদরিকাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া কিছুদিন পরে পাণ্ডবেরা সুবাহু নামক এক কিরাত রাজার

দেশে আসিয়া উপস্থিত হন। এই স্থানে যামুন নামক একটা পর্বত আছে, তাহার কাছে বনের ভিতরে নানারকম শিকার মিলে। ভীম খুবই উৎসাহের সহিত শিকার করিয়া বেড়ান। ইহার মধ্যে একদিন এক ভয়ংকর সাপ তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়াছে। ধরিবামাত্র ভীমের বল ও সাহস কোথায় যেন চলিয়া গেল। তিনি কিছুতেই সাপের বাঁধন এড়াইতে পারিলেন না।

সাপটা আবার মানুষের মতো কথা কয়। সে বলিল যে, বহুকাল পূর্বে পাণ্ডবদেরই বংশে সে নহুষ নামে রাজা ছিল, অগস্ত্য মুনির শাপে এখন সাপ হইয়াছে। ভীমের পরিচয় পাইয়া সে বলিল, 'দেখিতেছি, তুমি আমারই বংশের লোক। কিন্তু তথাপি তোমাকে না খাইয়া থাকিতে পারিতেছি না।'

ভীমের বড় ভাগ্য যে, সেই সময় যুধিষ্ঠির তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীমের দশা দেখিয়া তো তিনি একেবারে অবাক। তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সাপকে অনেক মিনতি করিলেন, কিন্তু সে তাহাতে রাজি হইল না। শেষে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইলে তুমি ভীমকে ছাড়িতে পার?'

সাপ বলিল, 'আমার কথার উত্তর দিতে পার তো ইহাকে ছাড়িয়া দিই; কেননা তাহা হইলে আমার শাপ দূর হইবে।'

যুধিষ্ঠির তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিন্তু সে সর্বনেশে সাপ আবার এমনি ভয়ানক পণ্ডিত যে, ব্রহ্মাণ্ডের যত উৎকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সে যুধিষ্ঠিরকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। যাহা হউক, সে তাঁহাকে ঠকাইতে পারিল না। শেষে খুশি হইয়া বলিল, 'তোমার বিদ্যা দেখিয়া আমি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং তোমার ভাইকে খাইব না।'

বাস্তবিক যুধিষ্ঠির না আসিলে সেদিন সাপের হাতে পড়িয়া নিশ্চয় ভীমের প্রাণ যাইত।

পাণ্ডবেরা কাম্যক বন হইতে দ্বৈত বনে গিয়া একটি সুন্দর সরোবরের ধারে এক কুঁড়েঘরে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে যে কী এক ঘটনা হইল, শুন। দুষ্ট লোকেরা কেবল সাধুদিগকে ক্লেশ দিয়াই সন্তুষ্ট হয় না, ক্লেশটা কেমন হইতেছে তাহা আবার দেখিতে চাহে। পাণ্ডবেরা নিতান্ত কষ্টে বনবাস করিতেছেন, একথা দুর্যোধন প্রভৃতিরা শোনেন, আর তাঁহাদের খালি দুঃখ হয়, 'আহা! উহারা কেমন কষ্ট পাইতেছে তাহার তামাশাটা একবার দেখিতে পাইলাম না, আর আমাদের জাঁক-জমকটাও উহাদের দেখাইতে পারলাম না!' যতই তাঁহারা একথা ভাবেন, ততই তাঁহাদের মনে হয় যে, এ কাজটা না করিলেই চলিতেছে না। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে? ধৃতরাষ্ট্র কি সহজে তাঁহাদিগকে দ্বৈত বনে যাইতে দিবেন?

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষে তাঁহারা ইহার একটা উপায় স্থির করিলেন। দ্বৈত বনে দুর্যোধনের অনেক গোয়ালা প্রজা বাস করে, রাজার গরু-বাছুর রাখার ভার তাদের উপরে। এসকল গরুর খবর লওয়া রাজার একটা কাজ; সুতরাং এই কাজের ছল করিয়া দুর্যোধন দ্বৈত বনে যাইতে চাহিলে ধৃতরাষ্ট্রের অমত হইবে না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে বলিলেন, 'ওখানে গিয়া কাজ নাই। ওখানে পাণ্ডবেরা আছেন; কী জানি, যদি কোনো কথায় তাঁহাদের সহিত ঝগড়া হয়।'

একথায় শকুনি বলিলেন, 'রাম রাম! আমরা কি তাহাদের কাছে যাইব? আমরা গরু দেখিয়া আর দূরে দূরে একটু শিকার করিয়াই চলিয়া আসিব, উহাদের সঙ্গে আমাদের দেখাই হইবে না।'

কাজেই ধৃতরাষ্ট্র শেষে রাজি হইলেন। হুকুম পাইবামাত্র হাতি, ঘোড়া, লোকজন, সৈন্যসামন্ত

সাজিয়া প্রস্তুত। এক লক্ষ গরু দেখিতে হইবে, তাহার জন্য দশ লক্ষ লোক পৃথিবী কাঁপাইয়া দ্বৈত বনে যাত্রা করিল। রাজপুত্রেরা নিজেরা গিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না, আবার পরিবারদিগকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন।

গরু দেখার কাজ দেখিতে দেখিতেই শেষ হইয়া গেল, শিকারেও খুব বেশি সময় লাগিল না। তারপর ক্রমে তাঁহারা সেই সরোবরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যাহার ধারে পাণ্ডবদিগের আশ্রয়। সেই সময়ে সেই সরোবরে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন সপরিবারে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গের ছেলেমেয়েদের স্নানের সুবিধার জন্য সরোবরটিকে বেড়া দিয়া ঘেরা হইয়াছিল।

গন্ধর্বের দারোয়ানেরা দুর্যোধনের লোকদিগকে সরোবরে যাইতে নিষেধ করে। দুর্যোধন আবার তাহা শুনিয়া গন্ধর্বদিগকে তাড়াইয়া দিবার হুকুম দেন। এইরূপে ক্রমেই দুই দলে গালাগালি হইয়া শেষে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

কৌরবদের সাহস খুব ছিল, আর কর্ণ দুর্যোধন ইহারা যোদ্ধাও কম ছিলেন না। কাজেই প্রথমে তাঁহারা গন্ধর্বের লোকদিগকে বেশ একটু জব্দ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু তারপর যখন চিত্রসেন নিজে অসংখ্য গন্ধর্ব লইয়া ক্রোধভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তখন কৌরবদের আর দুর্দশার সীমাই রহিল না। সৈন্যেরা তো প্রাণভয়ে তাদের মা-বাপের নাম লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলই, এমন যে কর্ণ, তিনিও শেষে আর দুর্যোধনের দিকে না চাহিয়াই তাহাদের পিছু-পিছু পলায়ন করিলেন।

আর দুর্যোধন? সে লজ্জার কথা আর কী বলিব! গন্ধর্বেরা তাঁহাকে আর তাঁহার ভাইদিগকে তাঁহাদের সমস্ত জাঁকজমক-সুদ্ধ সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

এদিকে যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগের নিকট আসিয়া দুর্যোধনের দুর্দশার কথা জানাইল। তাহাদের কথা শুনিয়া ভীম বলিলেন, 'বাঃ! আমরা অনেক কষ্টে যাহা করিতাম, গন্ধর্বরাজ আজ আমাদের সে কাজ করিয়া দিল! যেমন দুষ্ট, তাহাদের তেমনি সাজা হইয়াছে!'

যুধিষ্ঠির তখন একটা যজ্ঞ করিতেছিলেন। ভীমের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'ছিঃ, ভীম! এমন সময় এরূপ কথা কি বলিতে আছে? উহাদের অপমান হইলেই তো আমাদের বংশের অপমান! তাহা ছাড়া, উহারা এখন আমাদের আশ্রয় চাহিতেছে। তুমি, অর্জুন, নকুল আর সহদেব শীঘ্র গিয়া উহাদিগকে ছাড়াইয়া আন। আমি যজ্ঞে ব্যস্ত আছি, নহিলে আমি নিজে যাইতাম।'

কাজেই তখন ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব ছুটিয়া চলিলেন।

তাঁহারা প্রথমে মিষ্ট কথায় গন্ধর্বদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। গন্ধর্বেরা তাহা না শুনাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; আর অর্জুনের সহিত খানিক যুদ্ধ করিয়া তাহাদের এমনি দুর্দশা হইল যে, বেচারাদের টিকিবারও সাধ্য নাই, পলাইবারও পথ নাই, মাটি ছাড়িয়া আকাশে উঠিয়াও স্থির হইবার জো নাই। ইহা দেখিয়া তাহাদের রাজা বিষম রাগে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অর্জুনের কাছে তাঁহারও পরাভবে বিলম্ব হইল না। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি বিপাকে পড়িয়া বলিলেন, 'অর্জুন, আমি যে তোমার বন্ধু চিত্রসেন!'

তখন অর্জুন দেখেন, সত্যিই তো! এ যে চিত্রসেন,—সেই স্বর্গে যাঁহার নিকট গান-বাজনা

শিখিয়াছেন। অমনি তাড়াতাড়ি যুদ্ধ ছাড়িয়া দুই বন্ধুতে কোলাকুলি আরম্ভ হইল।

তারপর অর্জুন বলিলেন, 'একি বন্ধু, কৌরবদিগকে বাঁধিয়া আনিলে?'

চিত্রসেন বলিলেন, 'হতভাগারা তোমাদিগকে অপমান করিতে আসিয়াছিল, তাই ইন্দ্রের কথায় ইহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছি।'

অর্জুন বলিলেন, 'তাহা হইবে না। দুর্যোধন আমাদের ভাই। যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত ইচ্ছা, ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।'

চিত্রসেন বলিলেন, 'এমন দুষ্টকে কখনই ছাড়া উচিত নহে। চল, আমরা গিয়া যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা বলি, তারপর তিনি যাহা বলেন তাহাই হইবে।'

যুধিষ্ঠির যে উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, তাহা বোধহয় আর না বলিলেও চলে। তাহাদের দুষ্টবুদ্ধির কথা শুনিয়া তিনি কেবল বলিলেন, 'ভাই, আর কখনো এমন সাহস করিও না। এখন সুখে বাড়ি চলিয়া যাও।'

হায় রে মহারাজ দুর্যোধন! যে পাণ্ডবদিগকে জব্দ করিবার জন্য এত জাঁক-জমকের সহিত আসিলেন, এখন সেই পাণ্ডবদের কৃপায় প্রাণ লইয়া তিনি চোরের মতো ঘরে ফিরিতেছেন! আর ঘরে ফিরিবেনই বা কোন মুখে? তাহার চেয়ে বরং মৃত্যুই তাঁহার ভালো বোধ হইল। সঙ্গের লোকদিগকে তিনি বলিলেন, 'আমার আর বাঁচিয়া কাজ কী? তোমরা ঘরে যাও, দুঃশাসন রাজা হউক। আমি এখানে পুড়িয়া মরিব।'

দুঃশাসন তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কর্ণ আর শকুনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'সেকি দুর্যোধন, তোমার কিসের লজ্জা? পাণ্ডবেরা তোমার রাজ্যে বাস করে, কাজেই তাহারা তোমার প্রজা। সুতরাং বিপদে-আপদে তোমাকে রক্ষা করা তো তাহাদের কাজই হইল। ইহাতে তাহাদের বাহাদুরি কী, আর তোমারই বা লজ্জার কী!'

তবুও সহজে দুর্যোধন শান্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে বুঝাইতে দুটি দিন লাগিয়াছিল।

দুষ্ট লোকের সাজা হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার শিক্ষা হয় না। দুর্যোধন কোথায় ইহার পর হইতে পাণ্ডবদের সহিত ভালো ব্যবহার করিবেন, না, তাঁহার হিংসা আরো বাড়িয়া চলিল।

ইহার মধ্যে একদিন দুর্বাসা মুনি দশ হাজার শিষ্য-সমেত হস্তিনায় আসিলেন। এমন বিষম বদরাগী সর্বনেশে মানুষ এই পৃথিবীতে আর জন্মায় নাই। কথায় কথায় তিনি যাহাকে তাহাকে শাপ দিয়া বসেন। রাত দুপুর হউক না কেন, 'খাইব' বলিলেই খাবার আনিয়া উপস্থিত করিতে না পাইলে নিশ্চয়ই শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন। আবার তাড়াতাড়ি আনিতে পারিলে হয়ত বলিলেন, 'খাইব না।' সঙ্গে সঙ্গে দুটা গালি দেওয়া আশ্চর্য নহে। দুর্যোধন প্রাণপণে এই দুর্বাসা মুনির সেবা করিয়া তাঁহাকে যারপরনাই খুশি করিয়া ফেলিলেন। দুর্বাসা বলিলেন, 'আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি কী চাহ?'

দুর্যোধন বলিলেন, 'আপনি যদি দয়া করিয়া একটিবার দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইবার পর আপনার এই দশ হাজার শিষ্য লইয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে আহার করিতে যান, তবেই আমার ঢের হয়। আমি আর কিছু চাহি না।' দুর্বাসা বলিলেন, 'আচ্ছা, অতি অবশ্য যাইব।'

এই বলিয়া দুর্বাসা চলিয়া গেলেন। আর দুর্যোধনও এই ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন যে,দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইলে আর পাণ্ডবেরা দুর্বাসাকে খাইতে দিতে পারিবে না, সুতরাং মুনি তাহাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিবেন।

ইহার পর একদিন সত্য-সত্যই দুর্বাসা গিয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন দ্রৌপদীর খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, থালায় আর খাবার নাই। সে-যাত্রায় কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে রক্ষা না করিলে তাঁহাদের বড়ই বিপদ হইত। একজনেরও ভাত নাই, অথচ দশ-হাজার শিষ্য লইয়া মুনি উপস্থিত। এখন উপায়? যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে স্নান আহ্নিক করিবার জন্য গঙ্গায় পাঠাইয়া দিলেন; আর দ্রৌপদী মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'হায় হায়! স্নান করিয়া আসিলে ইহাদিগকে কী খাওয়াইব?' উপায় না দেখিয়া দ্রৌপদী মনে মনে কৃষ্ণকে ডাকিলেন। কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নহেন, তিনি দেবতা। কাজেই দ্রৌপদীর দুঃখের কথা জানিতে পারিয়া তিনি সেই মুহূর্তেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ আসিয়াই বলিলেন, 'দ্রৌপদী, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু খাইতে দাও।'

দ্রৌপদী লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'থালায় তো কিছু নাই, কী খাইতে দিব?' কৃষ্ণ বলিলেন, 'অবশ্য কিছু আছে, থালাখানি আন তো!'

কাজেই দ্রৌপদী থালা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। উহার এক পাশে তখনো এক কণা শাক ভাত লাগিয়া ছিল। কৃষ্ণ সেই এক বিন্দু শাক ভাত মুখে দিয়া বলিলেন, 'ইহাতেই বিশ্বাত্মা তুষ্ট হউক!' তারপর ভীমকে বলিলেন, 'মুনিদিগকে ডাক।'

এ সকল কথা বলিতে যত সময় লাগিল, কাজেও তাহার চেয়ে বড় বেশি লাগে নাই। মুনিরা ততক্ষণ সবে স্নান শেষ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে হঠাৎ তাঁহাদের পেট ভরিয়া গেল। সকলে আশ্চর্য হইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। পেটে আর একটি হজমি গুলিরও স্থান নাই। এদিকে যুধিষ্ঠির হয়ত কত কষ্ট করিয়া আহারের আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট গিয়া কী করিয়া মুখ দেখাইবেন? ভাবিয়া-চিন্তিয়া দুর্বাসা বলিলেন, 'এ-যাত্রা আমরা বড়ই বেল্লিক হইয়া গেলাম। এখন যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইতে অতিশয় লজ্জা বোধ হইতেছে, চল এখান হইতে পলায়ন করি!' এইরূপে বিপদ কাটিয়া গেল।

এই সময়ে পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন। এখানে আর একটা ঘটনা হয়, তাহার কথা এখন বলিতেছি।

দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলাকে যে বিবাহ করিয়াছিল তাহার নাম জয়দ্রথ। এই হতভাগ্য একদিন অনেক সৈন্য ও বন্ধুবান্ধব লইয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমের নিকট দিয়া যাইতেছিল। পাণ্ডবেরা তখন শিকার করিতে গিয়াছেন, দ্রৌপদীর নিকট একা ধৌম্য ছাড়া আর কেহই নাই। দ্রৌপদীকে দেখিবামাত্র জয়দ্রথ 'কেমন আছ, সব ভালো তো,' বলিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিল।

একজন ভদ্রলোক বাড়িতে আসিলে তাহার আদর-যত্ন না করিলে নয়। কাজেই দ্রৌপদী জয়দ্রথকে বসিবার জায়গা আর পা ধুইবার জল দিয়া বলিলেন, 'জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করুন, পাণ্ডবেরা শীঘ্র আসিবেন।' কিন্তু জয়দ্রথ বসিবার জন্য আসে নাই। দুষ্ট ভাবিয়াছে, পাণ্ডবেরা আসিবার পূর্বেই দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিবে।

সে প্রথমে দ্রৌপদীকে অনেক মিনতি করিল, তারপর লোভ দেখাইল, শেষে ভয় দেখাইতেও ছাড়িল না। দ্রৌপদী রাগে, ভয়ে, ঘৃণায় তাহাকে গালি দিতে দিতে ধৌম্যকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু দুরাত্মা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দ্রৌপদীকে টানিয়া লইয়া চলিল। দ্রৌপদী তাঁহার গায়ে হাত দিতে বার বার নিষেধ করিলেন। তাহা শুনিল না দেখিয়া ভয়ানক রাগের ভরে তাহাকে টানিয়া

মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু সেই দস্যুর সহিত যুদ্ধ করা কি তাঁহার কাজ? পাপিষ্ঠ ধৌম্যের সম্মুখে তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া চলিল।

ধৌম্য পুরুত মানুষ, তিনি আর কী করিবেন? তিনি তাহাকে গালি দিতে দিতে রথের পিছু-পিছু চলিলেন।

এদিকে পাণ্ডবদিগের শিকার আর ভালো লাগিতেছে না; আর তাঁহাদের মনেও যেন কেমন একটা ভয় আসিতেছে—যেন তাঁহাদের কোনো বিপদ উপস্থিত। তাঁহারা তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরিয়া দেখিলেন, দাসী ধাত্রেয়িকা কাঁদিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে সকল কথাই জানাইল। পাঁচ ভাই তাহা শুনিয়া আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করিলেন না।

কোথায় সে দুরাত্মা? আজ তাহার মাথাটা না জানি কয় টুকরা হয়! পাঁচ ভাই গর্জন করিতে করিতে রথ হাঁকাইয়া চলিলেন। কোথায় সে দুরাত্মা? ঐ ধুলা উড়িতেছে! ঐ পথে দুষ্ট পলায়ন করিতেছে! ঐ শুন ধৌম্যের গলার শব্দ! মার্ মার্! কাট্ কাট্! হতভাগাদের একটারও বুঝি আর মাথা থাকিবে না। ইহার মধ্যে কত সৈন্য কাটা গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। একটা প্রকাণ্ড হাতি শুঁড় উঠাইয়া নকুলকে মারিতে আসিল, খড়্গ দিয়া তাহার দাঁতশুদ্ধ শুঁড় কাটিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু দুরাত্মা জয়দ্রথ কোথায়? ঐ দেখ, পাষণ্ড দ্রৌপদীকে ফেলিয়া পলাইতেছে। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী আর ধৌম্যকে রথে তুলিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সে দুরাত্মা পলাইয়া গেল নাকি? কোথায় যাইবে? ভীম আর অর্জুন যাহার পিছু ছুটিয়াছেন, তাহার কি আর পলাইবার জো আছে? এখন তাঁহারা পাপিষ্ঠের চুলের মুঠি ধরিবেন। আর তাহাকে কি আস্ত রাখিবেন?

যুধিষ্ঠিরও ভাবিতেছেন যে, ভীমার্জুনের হাতে পড়িলে আর হতভাগা আস্ত থাকিবেন না। তাই তিনি বলিতেছেন, 'উহাকে মারিও না যেন, তাহা হইলে দুঃশলার বড়ই কষ্ট হইবে।'

কিন্তু সে দুরাত্মা গেল কোথায়? দুষ্ট বনের ভিতর লুকাইয়াছিল। সেইখানে গিয়া ভীম তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে কী আছড়ান আছড়াইলেন! আছাড় খাইয়া উঠিতে-না-উঠিতেই আবার তাহার মাথায় বিষম লাথি আর হাঁটু দিয়া,—উঃ! কী ভয়ানক সাজা! হতভাগা চ্যাঁচাইতে চ্যাঁচাইতে অজ্ঞান হইয়া গেল।

অর্জুন দেখিলেন যে, জয়দ্রথ মারা যায়, তাই তিনি ভীমকে তাড়াতাড়ি যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করাইয়া দিলেন। তখন ভীম তাহাকে আর মারিলেন না বটে, কিন্তু অর্ধচন্দ্র বাণ দিয়া তাহার মাথার খানিকটা মুড়াইয়া, আর পাঁচ জায়গায় পাঁচটি ঝুঁটি রাখিয়া, তাহাকে এমনি উৎকট সঙ সাজাইলেন যে, দেখিলে বুঝিতে! তারপর তাহাকে দুই ধমক দিয়া বলিলেন, 'খবরদার! ভুলিস না যেন,—সকলের কাছে বলিবি, তুই আমাদের গোলাম।'

জয়দ্রথ কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাতেই রাজি।

এইভাবে তাহাকে আনিয়া যুধিষ্ঠিরের সামনে উপস্থিত করা হইল। তাহার চেহারা দেখিয়া কি আর কেহ হাসি থামাইয়া রাখিতে পারে? যুধিষ্ঠির অবধি হাসিয়া অস্থির। ভীম বলিলেন, 'মহারাজ, এই হতভাগা আমাদের গোলাম হইয়াছে। ইহাকে ছাড়িয়া দিব কি না দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন।'

সাজাটা যে ভালোরকম হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাজেই উহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই মত হইল।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'যাও, এমন কাজ আর করিও না।'

সেখান হইতে বিদায় হইয়াই জয়দ্রথ শিবের তপস্যা আরম্ভ করিল।

তপস্যায় তুষ্ট হইয়া যখন শিব বর দিতে আসিলেন, তখন সে বলিল, 'আমি পাঁচ পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজিত করিব !'

শিব বলিলেন, তুমি চারিজনকে পরাজিত করিবে, কিন্তু অর্জুনকে পারিবে না। অর্জুনকে পরাজিত করিবার শক্তি দেবতাদিগেরও নাই।' এই বলিয়া শিব চলিয়া গেলেন, জয়দ্রথও বাড়ি ফিরিল।

এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘটে। কর্ণ কেমন বীর ছিলেন তাহা শুনিয়াছ। কর্ণ কানে অতি আশ্চর্য কুণ্ডল আর শরীরে কবচ (বর্ম) লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই কুণ্ডল আর কবচ শরীরে থাকিতে তাঁহাকে মারিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। অর্জুনকে ইন্দ্র বিশেষ স্নেহ করিতেন আর কর্ণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহার বড়ই বিপদের আশঙ্কা বুঝিয়া দুঃখিত থাকিতেন। তাই তিনি ভাবিলেন, 'এই কুণ্ডল আর কবচ লইয়া আসিব।'

কর্ণ গঙ্গায় স্নান করিয়া সূর্যের স্তব করিতেন। সে-সময় কেহ তাঁহার নিকট কিছু চাহিলে তিনি তাহাকে ফিরাইতেন না,—এই তাঁহার নিয়ম ছিল। একদিন ঠিক এইরূপ সময়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র কর্ণকে ফাঁকি দিয়া কুণ্ডল আর কবচ আনিতে যাইবেন, একথা সূর্যদেব আগেই জানিতে পারিয়া কর্ণকে সাবধান করিয়া দেন, আর উহা দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু কর্ণ কখনো নিয়ম ভঙ্গ করিতেন না ; কাজেই তিনি বলিলেন, 'আমার যখন নিয়ম আছে, তখন না দিয়া পারিব না।'

একথায় সূর্যদেব বলিলেন, 'তাহাই যদি হয়, তবে কুণ্ডল আর কবচের বদলে ইন্দ্রের নিকট হইতে এক-পুরুষ-ঘাতিনী নামক শক্তি চাহিয়া লইবে।'

কর্ণ প্রথমে ইন্দ্রকে সামান্য ব্রাহ্মণ মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুর আপনার কী চাই ?'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তোমার ঐ কুণ্ডল আর কবচ আমাকে দাও।' কর্ণ কুণ্ডল আর কবচের বদলে কত কী দিতে চাহিলেন—ধন, রত্ন, গরু, বাছুর, এমনকি রাজ্যের কথা পর্যন্ত বাকি রহিল না। ব্রাহ্মণ কি তাহা শোনেন ! তিনি কেবলই বলেন, 'আমার ঐ কুণ্ডল আর কবচ চাই।'

তখন কর্ণ বুঝিতে পারিলেন, এই ব্রাহ্মণ যে-সে ব্রাহ্মণ নহেন—স্বয়ং ইন্দ্র। কাজেই তিনি বলিলেন, 'আমি যদি কুণ্ডল আর কবচ দিই তাহা হইলে আমাকে আপনার এক-পুরুষ-ঘাতিনী শক্তি দিতে হইবে।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা, তাহাই হউক। এই আমার এক-পুরুষ-ঘাতিনী শক্তি তোমাকে দিতেছি। কিন্তু ইহার একটা নিয়ম আছে। যেখানে আর কোনো অস্ত্রে কাজ হইবার নহে, কেবল সেই স্থলেই এ অস্ত্র ছুঁড়িলে নিশ্চয়ই মৃত্যু, যেখানে সেখানে ছুড়িয়া বসিলে ইহা তোমারই গায়ে পড়িবে। এ অস্ত্রে একজনের বেশি লোক মরে না। সেই একজন শত্রু যত বড় যোদ্ধাই হউক, তাহাকে মারিয়া আমার শক্তি আমার নিকট চলিয়া আসিবে।'

কর্ণ তাহাতে রাজি হইয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে শক্তি লইলেন এবং নিজের কুণ্ডল আর কবচ তাঁহাকে খুলিয়া দিলেন।

ইন্দ্র কর্ণের কুণ্ডল আর কবচ লইয়া গিয়াছেন, একথা শুনিয়া দুর্যোধনের দলের যেমন দুঃখ

হইল, পাণ্ডবেরা তেমনই আনন্দ পাইলেন।

এই সময়ে পাণ্ডবেরা কাম্যক বন হইতে দ্বৈত বনে চলিয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছিল।

কাঠে কাঠে ঘষিলে আগুন বাহির হয়। এই উপায়ে পূর্বকালের মুনিঋষিরা অনেক সময় আগুন জ্বালিতেন। যাঁহাদের গৃহে প্রত্যহ অগ্নির পূজা হইত, তাঁহাদের যখন-তখন আগুন জ্বালিবার একটা ব্যবস্থা না রাখিলেই চলিত না। তাঁহাদের সকলেরই অরণী নামক দু-খানি কাঠ থাকিত। এই কাঠ দু-খানি ঘষিয়া তাঁহারা আগুন জ্বালিতেন।

ইহার মধ্যে হইয়াছিল কি—দ্বৈত বনের এক তপস্বী ব্রাহ্মণ একটা গাছে তাঁহার অরণীটি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। একটা হরিণ আসিয়া সেই গাছে ঘা ঘষিতে আরম্ভ করে। ঘষিতে ঘষিতে ব্রাহ্মণের অরণীখানি কেমন করিয়া তাহার শিঙে আটকাইয়া যায়, তাহাতে হরিণও ভয় পাইয়া সেই অরণীসুদ্ধ পলায়ন করে।

তখন ব্রাহ্মণটি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পাণ্ডবদিগকে তাঁহার অরণী আনিয়া দিতে বলায় পাঁচ ভাই মিলিয়া সেই হরিণের পিছু পিছু তাড়া করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তাঁহারা ধরিতে বা মারিতে তো পারিলেনই না, লাভের মধ্যে এই হইল যে, পিপাসা আর পরিশ্রমে তাঁহাদের প্রাণ যায়-যায়। তখন তাঁহারা বিশ্রামের জন্য একটি গাছের তলায় বসিয়া নকুলকে জল আনিতে পাঠাইলেন।

নিকটেই একটা জলাশয় ছিল। নকুল তাহাতে নামিয়া জল খাইতে যাইতেছেন, এমন সময় এক যক্ষ আকাশ হইতে তাঁহাকে বলিল, 'বাছা নকুল, ও জল আমি আগে দখল করিয়াছি। আমার কথার উত্তর দিয়া তবে জল খাও।'

নকুল যক্ষের কথা গ্রাহ্য না করিয়া জল তুলিয়া মুখে দিলেন। সেই জলপান করিবামাত্র তাঁহার মৃত্যু হইল।

এদিকে যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া সহদেবকে বলিলেন, 'নকুলের কেন এত বিলম্ব হইতেছে? তুমি শীঘ্র তাহার অনুসন্ধান কর।'

সহদেব নকুলকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই জলাশয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃতদেহ দেখিবামাত্র কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। তারপর ভয়ানক পিপাসা হওয়াতে তিনি জলাশয়ে নামিয়া জল খাইতে গেলেন। তখন সেই যক্ষ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, 'আগে আমার কথার উত্তর দাও, তারপর জল খাইতে পাইবে।'

যক্ষের সেই কথা অমান্য করিয়া সহদেব সেই জল খাইলেন, অমনি তাঁহার মৃত্যু হইল।

এইরূপে ক্রমে সহদেবকে খুঁজিতে আসিয়া অর্জুন এবং অর্জুনকে খুঁজিতে আসিয়া ভীম সেই যক্ষের নিষেধ অমান্য করিয়া জলাশয়ের জল খাওয়ায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

সর্বশেষে যুধিষ্ঠিরও তাঁহাদের অন্বেষণে সেই জলাশয়ের ধারে আসিয়া তাহাতে মৃত শরীর দর্শনে অনেক দুঃখ করার পর জলপান করিতে উদ্যত হওয়ায় একটা বক তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, 'বাছা, যুধিষ্ঠির, আমিই তোমার ভাইদিগকে মারিয়াছি; আমার কথার জবাব দিয়া তবে জল খাও।' বকের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'এ সকল মহাবীরকে বধ করা পাখির কর্ম নহে। আপনি কে?'

তখন সেই বক তালগাছ-প্রায় বিশাল যক্ষরূপ ধরিয়া বলিল, 'আমি যক্ষ। তোমার ভ্রাতারা

আমার কথা অবহেলা করিয়া জলপান করাতে তাহাদিগকে বধ করিয়াছি। তুমি আগে আমার কথার উত্তর দিয়া তারপর জল খাও।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আপনার প্রশ্ন কী বলুন ; যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।'

একথায় যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে অনেক প্রশ্ন করিল, যুধিষ্ঠির তাহার সকলগুলির উত্তর দিলেন। সকল প্রশ্নের কথা লিখিবার স্থান এ পুস্তকে নাই, দু-একটির কথা মাত্র বলিতেছি।

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'পৃথিবীর চেয়ে ভারী কে? স্বর্গের চেয়ে উঁচু কে? বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী কে? তৃণের চেয়ে কাহার সংখ্যা বেশি?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মাতা পৃথিবীর চেয়ে ভারী, পিতা আকাশের চেয়ে উঁচু, মন বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী, আর চিন্তার সংখ্যা তৃণের চেয়েও বেশি।'

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'কে ঘুমাইলে চোখ বোজে না? কে জন্মিয়া নড়েচড়ে না? কাহার হৃদয় নাই? কে নিজের বেগেতে বড় হয়?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মাছ ঘুমাইলে চোখ বোজে না ; ডিম জন্মিয়া নড়েচড়ে না ; পাথরের হৃদয় নাই ; নদী নিজের বেগেতে বড় হয়।'

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, 'সুখী কে? আশ্চর্য কী? পথ কী? সংবাদ কী?' যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'যাহার ঋণ নাই, আর নিজের ঘরে থাকিয়া দিনের শেষে যে চারিটি শাক ভাত খাইতে পায়, সে-ই সুখী। প্রতিদিন জীবের মৃত্যু হইতেছে, তথাপি লোকে যে চিরদিন বাঁচিতে চায়, ইহাই আশ্চর্য। মহাপুরুষেরা যে পথে যান, তাহাই পথ। সময় যেন পাচক, সে যেন প্রাণীদিগকে দিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিতেছে, ইহাই সংবাদ।'

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ বলিল, 'তোমার ইচ্ছামতো একটি ভাইকে বাঁচাইতে পার।'

একথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'তবে দয়া করিয়া নকুলকে বাঁচাইয়া দিন।'

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিল, ভীম আর আর অর্জুনকে ছাড়িয়া তুমি নকুলকে বাঁচাইতে বলিলে, ইহার কারণ কী?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মাতা কুন্তীর এক পুত্র আমি জীবিত রহিয়াছি। এখন নকুল বাঁচিলে মাতা মাদ্রীরও এক পুত্র থাকে। এইজন্য আমি নকুলকে বাঁচাইতে বলিয়াছি।'

একথায় যক্ষ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব চারজনকেই বাঁচাইয়া দিল। তারপর সে নিজের পরিচয় দিয়া বলিল, 'বাছা, আমি ধর্ম। তোমার মহত্ব দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি বর লও।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'তবে সেই ব্রাহ্মণ যাহাতে তাঁহার অরণীখানি পান তাহা করুন।'

ধর্ম বলিলেন, 'তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমিই হরিণ সাজিয়া অরণী হরণ করিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণ তাহা পাইবেন। এক্ষণে তুমি অন্য বর লও।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমাদের বনবাসের বার বৎসর শেষ হইয়াছে, ইহার পরে আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। সে সময় যেন কেহ আমাদিগকে না চিনিতে পারে, দয়া করিয়া এই বর দিন।'

ধর্ম বলিলেন, 'বাছা, তোমরা ছদ্মবেশ না করিয়াও যদি পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াও, তথাপি তোমাদিগকে কেহ চিনিতে পারিবে না। এখন আর একটি বর চাও।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমার যেন পাপে মতি না হয়, সর্বদা যেন ধর্মপথে চলিতে পারি।'

ধর্ম বলিলেন, 'এ সকল তো তোমার আছেই, এখন তাহা আরও বেশি করিয়া হইবে।' এই বলিয়া তিনি আকাশে মিলাইয়া গেলেন। তাঁহার পূর্বে অবশ্য ব্রাহ্মণের অরণীখানি ফিরিয়া দিতে ভুলিলেন না।

এইরূপে পাণ্ডবদিগের বনবাসের বার বৎসর কাটিয়া গেল। আর একটি বৎসর ভালোয় ভালোয় কাটিলেই তাঁহাদের দুঃখের শেষ হয়। কিন্তু এই শেষের বৎসরটি অতি ভয়ানক বৎসর। এই সময়টুকু এমনভাবে কাটাইতে হইবে, যেন কেহই তাঁহাদের খবর জানিতে না পারে ; জানিতে পারিলে আবার বার বৎসর বনবাস। এ সময়ে দুর্যোধনের লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। সেই সকল ধূর্তকে ফাঁকি দিয়া একটি বৎসর কিরূপে কাটানো যায়, সকলে মিলিয়া সাবধানে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

বিরাটপর্ব

অজ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত। একটি বৎসর বড় বিপদের সময়। কোন্ দেশে কীভাবে থাকিলে এ বিপদে রক্ষা পাওয়া যায়?

পঞ্চাল, চেদি, সুরাষ্ট্র, অবন্তী প্রভৃতি অনেক ভালো ভালো দেশ আছে। ইহাদের মধ্যে মৎস্য দেশের রাজা বিরাট অতি ধার্মিক লোক। ধার্মিকেরা ধার্মিকের আশ্রয় ছাড়িয়া আর কোথায় থাকিবে? সুতরাং পাণ্ডবেরা বিরাটের নিকটেই কোনোরূপ কাজ লইয়া থাকা স্থির করিলেন। যুধিষ্ঠির সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে কী কাজ করিতে পারিবে বল তো?'

একথায় অর্জুন বলিলেন, 'আপনি কী কাজ করিবেন?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ সাজিয়া বিরাটের সভাসদ (অর্থাৎ, সভার লোক) হইব। বলিব, "আমার নাম কঙ্ক, খুব পাশা খেলিতে পারি।" আরো জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, "আমি যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ছিলাম।" এখন ভীম বল তো, তুমি কী করিবে?'

ভীম বলিলেন, 'আমি রাঁধুনী ব্রাহ্মণ সাজিয়া যাইব। পরিচয় চাহিলে বলিব,"আমার নাম বল্লভ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পাচক ছিলাম, একটু-আধটু পালোয়ানীও জানি।" সে দেশের রাঁধুনীদের চেয়ে ঢের ভালো ব্যঞ্জন রাঁধিয়া আর এই বড় কাঠের বোঝা বহিয়া আনিয়া, হুকুম পাইলে দু-একটা পালোয়ান বা ক্ষ্যাপা হাতিকেও ঠ্যাঙাইয়া আমি রাজাকে খুশি রাখিব।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আচ্ছা, অর্জুন কী করিবে?'

অর্জুন বলিলেন, 'আমি রাজবাড়ির মেয়েদের সঙ্গীতের শিক্ষক হইয়া থাকিব। এসব লোকে স্ত্রীলোকের পোশাক পরে, আমিও তাহাই পরিব। ধনুকের গুণের ঘষায় হাতে যে দাগ হইয়াছে, বালা পরিয়া তাহা ঢাকিব। স্ত্রীলোকের মতোন কাপড় পরিব, মাথায় বেণী রাখিব, কানে কুণ্ডল দুলাইব, কথাবার্তা স্ত্রীলোকের মতোন করিয়া কহিব। তাহা হইলেই আর কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না। পরিচয় চাহিলে বলিব, আমার নাম বৃহন্নলা, আমি দ্রৌপদীর নিকট ছিলাম।'

তারপর যুধিষ্ঠির নকুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নকুল, তুমি কী করিবে?'

নকুল বলিলেন, 'আমি বলিব, আমার নাম গ্রন্থিক, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়াশালার কর্তা ছিলাম, ঘোড়ার কথা আমার মতোন কেহই জানে না।'

তারপর যুধিষ্ঠির সহদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সহদেব কী করিবে?'

সহদেব বলিলেন, 'আমি গরু দেখাশোনার কাজ লইব। বলিব, আমার নাম তন্ত্রিপাল। আমি গরু সম্বন্ধে সকল রকম কাজ বিশেষরূপে জানি।'

সকলের শেষে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দ্রৌপদী তো কখনো কোনো ক্লেশের কাজ করেন নাই, তিনি এক বৎসর কী করিয়া কাটাইবেন?'

দ্রৌপদী বলিলেন, 'আমি বিরাট রাজার রানী সুদেষ্ণার নিকট কাজ লইব। জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, আমি সৈরিন্ধ্রী (অর্থাৎ যে চুল বাঁধা, মালা গাঁথা ইত্যাদি কাজ করে), মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাড়িতে দ্রৌপদীর নিকট ছিলাম।'

এইরূপে সকল পরামর্শ স্থির করিয়া পাণ্ডবেরা সঙ্গের লোকদের বিদায় দিলেন। চাকরদিগকে বলিলেন, 'তোমরা দ্বারকায় চলিয়া যাও।' ধৌম্যকে বলিলেন, 'সারথি, পাচকগণ আর দ্রৌপদীর দাসীকে লইয়া আপনি রাজা দ্রুপদের বাড়িতে গিয়া থাকুন।'

তারপর তাঁহারা উপস্থিত ব্রাহ্মণ মুনিদিগের আশীর্বাদ লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন তাহা কেহই জানিতে পারিল না। অবশ্য আমরা জানি, তাঁহারা মৎস্য দেশে গিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম ছিল।

পাহাড়ের আড়াল দিয়া, বনের ভিতর দিয়া, বহু কষ্টে অতি সাবধানে পথ চলিয়া পাণ্ডবেরা ক্রমে দশার্ণ, পঞ্চাল, সুরসেন প্রভৃতি দেশ অতিক্রম পূর্বক শেষে বিরাট নগরের কাছে উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের এই চিন্তা হইল যে, এই সকল অস্ত্র লইয়া নগরের ভিতরে গেলে তাঁহাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে; সুতরাং এগুলিকে একটা ভালো জায়গায় লুকাইয়া রাখা আবশ্যক।

সেখানে একটা শ্মশানের পাশে পাহাড়ের উপরে প্রকাণ্ড শমী গাছ ছিল। অর্জুন বলিলেন, 'এই গাছে অস্ত্র-শস্ত্র রাখিলে কেহই জানিতে পারিবে না।' সেই শমী গাছে উঠিয়া নকুল তাঁহাদের সকলের ধনুক, তূণ, শঙ্খ, বর্ম, খড়গ প্রভৃতি বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। তারপর শ্মশান হইতে একটা মড়া আনিয়া তাহাও ঐ গাছে রাখিলেন। মরা বাঁধিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে গন্ধে আর ভূতের ভয়ে কেহ আর সে গাছের নিকট আসিবে না।

তারপর তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেকের আর একটি করিয়া নাম রাখিলেন— যুধিষ্ঠির 'জয়,' ভীম, 'জয়ন্ত,' অর্জুন 'বিজয়,' নকুল 'জয়ৎসেন,' সহদেব 'জয়দ্বল,—এইগুলি তাঁহাদের গোপনীয় নাম, অর্থাৎ এসকল নামের কথা আর কেহ জানিতে পারিবে না। কাজেই ইহার

কোনো একটা নাম লইলে কেহ বুঝিয়া ফেলিবার ভয় রহিল না।

মহারাজ বিরাট পাত্রমিত্র সমেত সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বেশে, পাশা হাতে ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বিরাট সভার লোকদিগকে বলিলেন, 'উনি কে আসিতেছেন? গরিবের মতোন পোশাক বটে, কিন্তু চেহারা দেখিলে মনে হয় কোনো রাজা হইবেন।'

যুধিষ্ঠির আস্তে আস্তে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজের জয় হোক! দুঃখে পড়িয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। দয়া করিয়া আশ্রয় দিলে বড় উপকার হয়।'

বিরাটকে বলিলেন, 'মহারাজ, আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম কঙ্ক, রাজা যুধিষ্ঠিরের বন্ধু ছিলাম। আমি পাশা খেলায় বিশেষ দক্ষ।'

বিরাট যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়াই ভালোবাসিয়াছিলেন, তাহাতে আবার তাঁহাদের নিজের পাশা খেলায় খুব শখ। কাজেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে আদর করিয়া কাছে রাখিলেন। সকলকে বলিয়া দিলেন, 'ইনি আমার বন্ধু; তোমরা আমাকে যেমন মান্য কর, ইহাকেও তেমনি মান্য করিবে।'

তারপর রসুই বামুনের সাজে ভীম আসিয়া উপস্থিত—হাতা বেড়ি হাতে, সিংহের মতো চেহারা। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই বিরাট ভারি আশ্চর্য হইয়া গেলেন। রাজার হুকুমে কয়েকজন লোক ছুটিয়া ভীমের পরিচয় লইতে গেল। ভীম তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া একেবারে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমার নাম বল্লভ; আমি পাচক, অতি উত্তম ব্যঞ্জন রাঁধিতে পারি; আমাকে রাখিতে আজ্ঞা হউক।'

বিরাট কহিলেন, 'তোমার চেহারা দেখিয়া তোমাকে তো রাঁধুনি বলিয়া মনে হয় না?'

ভীম বলিলেন, 'মহারাজ, আমি রাঁধুনিই বটে, আপনার চাকর; পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রধান পাচক ছিলাম। অল্প-স্বল্প পালোয়ানীও জানি। আমার কাজ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।'

এইরূপে ভীম বিরাট রাজার রসুই মহলের কর্তা হইয়া পরম সুখে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে দ্রৌপদী একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া সৈরিন্ধ্রীর বেশে রাজপথ দিয়া চলিলেন। পথের লোকে এমন সুন্দর মানুষ কখনো দেখে নাই। তাহারা আশ্চর্য হইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, 'আমি সৈরিন্ধ্রী, কাজ খুঁজিতেছি।' কিন্তু তাঁহার একথা কেহ বিশ্বাস করে না। রাণী সুদেষ্ণাও ছাদ হইতে দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রৌপদী বলিলেন, 'আমার স্বামী পাঁচজন গন্ধর্ব। কোনো কারণে তাঁহারা এখন বড়ই দুঃখে পড়িয়াছেন, আর আমি সৈরিন্ধ্রীর কাজ করিয়া দিন কাটাইতেছি। আগে আমি সত্যভামা আর দ্রৌপদীর নিকট কাজ করিয়াছিলাম। এখন আপনার নিকট আসিয়াছি, দয়া করিয়া আশ্রয় দিলে এখানে থাকিব।'

সুদেষ্ণা আহ্লাদের সহিত দ্রৌপদীকে সৈরিন্ধ্রীর কাজে নিযুক্ত করিলেন।

দ্রৌপদী বলিলেন, 'মা, আমি কখনো উচ্ছিষ্ট ছুঁই না, বা কোনো নীচ কাজ করি না। আমার গন্ধর্ব স্বামীরা যদিও দুঃখে পড়িয়াছেন, তবুও তাহারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করেন। কেহ আমার অপমান করিলে তাঁহারা তাহাকে মারিয়া ফেলেন।'

এইরূপে ক্রমে অর্জুন, সহদেব আর নকুল এক এক জন করিয়া বিরাট রাজার কাজ

লইলেন। অর্জুন হইলেন রাজকুমারী উত্তরার গানের শিক্ষক। সহদেব আর নকুল হইলেন গোশাল এবং ঘোড়াশালের কর্তা। অর্জুন এখন স্ত্রীলোকের মতোন পোশাক পরেন আর বাড়ির ভিতরেই থাকেন। ভীমও তাঁহার কাজ সারিয়া রান্নার মহলের বাহিরে আসিবার অবসর পান না। কাজেই তাঁহাদের কথা কেহ জানিতে পারিল না।

এইরূপে দিন যায়। পাণ্ডবদের কাজ দেখিয়া বিরাট তাঁহাদের সকলের উপরই বিশেষ সন্তুষ্ট। ভীম ইহার মধ্যে জীমূত নামক একটা পালোয়ানকে হারাইয়া রাজার নিকট অনেক পুরস্কার পাইয়াছেন। সুতরাং মোটের উপরে তাঁহারা সুখেই আছেন বলিতে হইবে।

কিন্তু হায়! দ্রৌপদীর সময় নিতান্তই কষ্টে কাটিতে লাগিল। সুদেষ্ণা তাহাকে খুবই স্নেহ করিতেন, কিন্তু সুদেষ্ণার ভাই কীচক তাঁহাকে দেখিতে পাইলেই অপমান করিত। দ্রৌপদী তাহা সহিতে না পারিয়া তাহাকে কত গালি দিতেন, কত মিনতি করিতেন, কত ভয় দেখাইতেন। দুরাত্মা তথাপি আরো বেশি করিয়া তাঁহাকে অপমান করিত।

একদিন সুদেষ্ণা কিছু খাবার আনিবার জন্য দ্রৌপদীকে কীচকের বাড়িতে পাঠান। সেদিন তাঁহার প্রতি সে এত অভদ্রতা করে যে, তিনি রাগ থামাইতে না পারিয়া তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেন। তারপর ভয়ে তিনি ছুটিয়া একেবারে রাজসভায় উপস্থিত হন।

পাপিষ্ঠ তাঁহার পিছু পিছু সেখানে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাঁহার গায়ে লাথি মারিল। সেখানে যুধিষ্ঠির আর ভীম উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মনে ইহাতে কী ভয়ানক ক্লেশ হইল বুঝিতেই পার। ভীম রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রমাগত একটা গাছের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন সর্বনাশ উপস্থিত, ভীম হয়ত এখন ঐ গাছ লইয়া সভার সকলকে গুঁড়া করিবেন। তাই তিনি ভীমকে শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 'কী পাচক ঠাকুর, কাঠের জন্য গাছের দিকে তাকাইতেছ? কাঠের গাছ বাহিরে গিয়া খোঁজ।'

সভার লোকেরা কীচককে অনেক নিন্দা করিতে লাগিল, কিন্তু রাজা তাহাকে কিছু বলিলেন না। কীচককে তিনি বড়ই ভয় করিতেন। সে তাঁহার সেনাপতি ছিল, তাহার জোরেই তিনি রাজত্ব করিতেন। বাস্তবিকই বিরাট কেবল নামেই সে দেশের রাজা ছিলেন, দেশ শাসন করিত কীচক। দ্রৌপদীর কষ্ট দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'সৈরিন্ধ্রী, ঘরে যাও। তোমর গন্ধর্ব স্বামীরা সময় বুঝিয়া হয়ত উহার বিচার করিবেন।'

একথায় দ্রৌপদী চোখের জল মুছিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন। সেখানে সুদেষ্ণা তাঁহার নিকট সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তুমি যদি বল, তবে দুষ্টকে এখনই কাটিয়া ফেলি।' দ্রৌপদী বলিলেন, আমার যাঁহারা আছেন, তাঁহারাই উহাকে বধ করিবেন।'

রাত্রিতে দ্রৌপদী চুপি চুপি ভীমের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছেন। এতক্ষণ যে কীচককে মারেন নাই, সে কেবল লোকে জানিতে পারার ভয়ে। নির্জন স্থানে তাহাকে একবার পাইলেই আর তিনি এক মুহূর্তও দেরি করিতেন না।

রাজবাড়ির মেয়েদের সঙ্গীতের ঘরটি ঠিক এইরূপই নিরিবিলি স্থান ছিল। সে স্থানে দিনের বেলায় মেয়েরা নাচ গান করিত, রাত্রিতে কেহ সেখানে থাকিত না। সেদিন রাত্রে কীচকের একলা সেই ঘরে যাওয়ার কথা ছিল। ভীম তাহা জানিতে পারিয়া তাহার আগেই চুপি-চুপি সেখানে গিয়া চাদরমুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন।

অনেক রাত্রে কীচক সেখানে আসিয়াছে। অন্ধকারে ভীমকে দেখিয়া সে মনে করিল বুঝি দ্রৌপদী সেখানে শুইয়া আছেন। তাই দুষ্ট তাঁহার সঙ্গে তামাশা আরম্ভ করিল। সে বলিল ,'বাড়ির লোকে বলে, আমার মতো সুন্দর মানুষ আর নাই।'

তাহাতে ভীম বলিলেন, 'আর আমার এই হাতখানির মতোন মোলায়েম হাতও কোথাও নাই।'

একথা বলিয়াই তিনি সেই দুষ্টের চুলের মুঠি ধরিলেন। তারপর কী হইল বুঝিয়া লও।

কীচকও যেমন-তেমন বীর ছিল না, সে খানিকক্ষণ খুবই যুদ্ধ করিল। কিন্তু ভীমের কাছে তাহার বড়াই আর কতক্ষণ খাটিবে? সেই 'মোলায়েম' হাতের চড় ভালোমতো খাইয়া তাহাকে আর বেশি কথা কহিতে হইল না। তখন ভীম সেই দুষ্টকে ধরিয়া তাহার এমনি সাজা করিলেন যে, তাহার হাড়গোড় ভাঙিয়া, হাত, পা আর মাথা পেটের ভিতর ঢুকিয়া একতাল মাংস মাত্র অবশিষ্ট রহিল। আজও কেহ কাহাকেও নিতান্ত ভয়ানক সাজা দিলে লোকে বলে, 'কীচক-বধ' করিয়াছে।

তারপর দ্রৌপদীকে ডাকিয়া কীচকের দশা দেখাইয়া ভীম চুপি চুপি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। লোকে দ্রৌপদীর নিকট শুনিল যে, তাঁহার গন্ধর্ব স্বামিগণের হাতেই কীচকের সাজা হইয়াছে।

এই ঘটনার সংবাদে কীচকের ভাইয়েরা আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে শ্মশানে লইয়া চলিল। তাহারা তাহাকে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিবার সময় দ্রৌপদী সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দুষ্টেরা বলিল, 'এই হতভাগীর জন্যই তো আমাদের দাদার প্রাণ গেল। চল, তাঁহার সঙ্গে ইহাকেও নিয়া পোড়াই!' এই বলিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি বিরাটের নিকট গিয়া বলিল, 'যাহার জন্য কীচক মরিয়াছেন, সেই হতভাগী সৈরিন্ধ্রীকেও আমরা তাঁহার সঙ্গে পোড়াইতে চাহি।'

বিরাট এইসকল দুষ্ট লোককে বড়ই ভয় করিতেন, সুতরাং তিনি উহাদের কথায় রাজি হইলেন।

হায় হায়! যাঁহার পায়ের ধুলা পাইয়া লোকে আপনাকে ধন্য মনে করিত, দেবতারা পর্যন্ত যাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিতেন, সেই দ্রৌপদী দেবীর কপালে কিনা এতই দুঃখ আর অপমান ছিল। দুরাত্মারা তাঁহাকে কীচকের সঙ্গে শ্মশানে লইয়া চলিলে, একটি লোকও তাহাদিগকে বারণ করিল না। দ্রৌপদী কেবল এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—'হে জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল, তোমরা কোথায়? আমাকে রক্ষা কর!'

ভীম তাঁহার ভয়ানক কার্যের শেষে সবে একটু নিদ্রার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় দ্রৌপদীর সেই কান্না তাঁহার কানে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি পোশাক বদলাইয়া, একটি গোপনীয় পথে শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দশ ব্যাম (৩৫ হাত—সাড়ে তিন হাতে এক ব্যাম) লম্বা প্রকাণ্ড একটি গাছ ছিল, সেই গাছ তুলিয়া লইয়া তিনি যখন ঘোরতর গর্জনে সেই দুরাত্মাদিগকে তাড়া করিলেন, তখন যে তাঁহাকে নিতান্তই ভয়ংকর দেখা গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র 'বাবা গো, ঐ গন্ধর্ব আসিতেছে!' বলিয়া দ্রৌপদীকে ফেলিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতে লাগিল। কিন্তু পলাইয়া আর কতদূর যাইবে? ভীম সেই গাছ দিয়া দেখিতে দেখিতে তাহাদের মাথা গুঁড়া করিয়া দিলেন। উহারা একশত পাঁচজন

ছিল ; তাহার একটিও প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিল না।

তারপর দ্রৌপদীকে শান্ত করিয়া ভীম পুনরায় ঘরে চলিয়া আসিলেন। এদিকে দেশের সকল লোক গন্ধর্বের ভয়ে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজে রাজা আসিয়া রানীকে বলিলেন, 'এই মেয়েটি আমাদের এখানে থাকিলে বড় ভয়ের কথা দেখিতেছি। উহাকে বল, সে অন্যত্র চলিয়া যাউক।' দ্রৌপদী ঘরে ফিরিবামাত্রই সুদেষ্ণা তাঁহাকে একথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া দ্রৌপদী বলিলেন, 'মা, আর তেরটি দিন দয়া করিয়া অপেক্ষা করুন, তারপর আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। এই সময়ের মধ্যেই আমার স্বামিগণের দুঃখ দূর হইবে।'

দুঃখ দূর হওয়ার অর্থ বোধহয় বুঝিয়াছ—অর্থাৎ তের দিন গেলে অজ্ঞাত বাসের এক বৎসর শেষ হইবে।

অজ্ঞাত বাসের সময় ফুরাইয়া আসিল। এতদিন দুর্যোধনের দলের লোকেরা কী করিতেছিলেন? তাঁহার দেশ-বিদেশে লোক পাঠাইয়া প্রাণপণে পাণ্ডবদিগকে খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু কোনোমতেই তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারেন নাই। দূতেরা ফিরিয়া আসিয়া খালি এক কথাই বলে, 'মহারাজ, কত খুঁজিলাম, কোথাও পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাইলাম না।

দূতগণের কথা শুনিয়া কৌরবরা যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। যাহা হউক, দূতেরা এই একটা ভালো সংবাদ আনিল যে, বিরাটের সেনাপতি কীচক মারা গিয়াছে। এই কীচকের জন্য সকল রাজাই বিরাটকে ভয় করিয়া চলিতেন। দুর্যোধনের সভায় তখন ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মা উপস্থিত ছিলেন। বিরাট কীচকের সাহায্যে এই সুশর্মাকে বার বার পরাজয় করাতে ইঁহার মনে বিরাটের উপরে চিরকালই ভারি রাগ ছিল। এখন কীচক মারা যাওয়াতে সুশর্মা ভাবিলেন যে, সেই সকল পরাজয়ের শোধ লওয়ার উত্তম সুযোগ উপস্থিত। তাই তিনি এইবেলা বিরাটের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধনরত্ন ও গরু-বাছুর কাড়িয়া লইবার জন্য কৌরবদিগকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিলেন।

কৌরবদিগের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতির মতো লোক থাকিতে কি আর অন্যায় কাজের জন্য তাঁহাদিগকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিতে বেশি সময় লাগে? সুশর্মা কথাটা পাড়িতে-না-পাড়িতেই স্থির হইল যে, তিনি তখনি বিরাটের গোয়ালাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার গরু চুরি করিতে যাইবেন, আর কৌরবেরা তাহার পরের দিনই দলবল-সমেত গিয়া সেই সৎকার্যে সহায়তা করিবেন। এমন সুযোগ পাইয়া সুশর্মা আর একটুও সময় নষ্ট করিলেন না।

বিরাট সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় এক গোয়ালা ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে আসিয়া সংবাদ দিল, 'মহারাজ, ত্রিগর্ত দেশের লোকেরা আমাদিগকে পরাজয় করিয়া হাজার হাজার গরু লইয়া গিয়াছে।'

যেই এই সংবাদ পাওয়া, অমনি রাজ্যময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। চারিদিকে কেবল 'সাজ সাজ' 'ধর ধর' 'মার মার' শব্দ। সিপাহি, সৈন্য, রথ, হাতি, ঘোড়া সব সাজিয়া প্রস্তুত হইল, নিশান উড়িতে লাগিল, মেঘের গর্জনের ন্যায় রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল ; তাহার সহিত অস্ত্রের ঝন-ঝন মিশিয়া গেল।

যোদ্ধারা বর্ম আঁটিয়া অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত। নিজে বিরাট সাজিয়াছেন,তাঁহার ভাই শতানীক সাজিয়াছেন, জ্যেষ্ঠপুত্র শঙ্খও সাজিয়াছেন। আর আর যোদ্ধার তো কথাই না। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল আর সহদেবকেও রাজা যুদ্ধের পোশাক পরাইয়া, উত্তম উত্তম অস্ত্র দিয়া

চমৎকার রথে চড়াইয়া সঙ্গে লইয়াছেন।

বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় দুই দলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অন্ধকারের সহিত সেই যুদ্ধ আরো ঘনাইয়া আসিল।

দুঃখের বিষয়, আয়োজনের ঘটা যেমন হইয়াছিল, আসল যুদ্ধটা তেমন করিয়া হইতে পারে নাই। প্রথমে কয়েক ঘণ্টা খুবই যুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরেই দেখা গেল যে, সুশর্মা বিরাটের সারথিকে মারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। তখন বিরাটের সৈন্যদল রণস্থলের যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

এদিকে যুধিষ্ঠির ভীমকে বলিতেছেন, 'ভীম, দেখিতেছ কী? বিরাটকে লইয়া গেল। শীঘ্র তাঁহাকে ছাড়াইয়া আন। এতদিন যাঁহার আশ্রয়ে সুখে বাস করিলাম, এ সময়ে তাঁহার উপকার করা উচিত।'

ভীম বলিলেন, 'হাঁ, নিশ্চয়। এই দেখুন না, আমি এই গাছ দিয়া—'

গাছের নাম শুনিয়া যুধিষ্ঠির ব্যস্তভাবে বলিলেন, 'না না, গাছ লইয়া নয়। তাহা হইলে তোমাকে চিনিয়া ফেলিবে। তুমি সাধারণ লোকের মতো অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাও। নকুল তোমার সঙ্গে যাউক।'

ভীম তাহাতেই রাজি হইয়া চলিয়া গেলেন। হাতে গাছ না থাকিলেই কী! ভীম তো! বিরাটকে তিনি ডাকিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই', তাহা শুনিয়া সুশর্মা পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটা কী অদ্ভুত মানুষ ঝড়ের মতোন ছুটিয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই অদ্ভুত মানুষ গদার ঘায় তাঁহার ঘোড়া, সিপাহি প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল।

সুশর্মা আর উপায় না দেখিয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আর করিবেন কি, তাহার পূর্বেই ভীমের গদার ঘায় তাঁহার রথের ঘোড়া আর সারথি চুরমার হইয়া গিয়াছে। ততক্ষণে সহদেব প্রভৃতিও ভীমের সাহায্য করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নিজে বিরাটও ভরসা পাইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

সুশর্মা ভাবিলেন, বড়ই বিপদ। এইবেলা পালাই।

কিন্তু হায়! যুদ্ধের সময় ভীমের সম্মুখ হইতে পালাইবার যেমন দরকার হয় কাজটি তেমনি কঠিন হইয়া উঠে। সুশর্মা কয়েক পা যাইতে-না-যাইতেই ভীম তাঁহার চুলের মুঠি ধরিয়া বসিলেন। তারপর আছাড়, কিল, চড় প্রভৃতি কোনো সাজাই বাকি রহিল না—বাকি রহিল খালি প্রাণ বাহির করিয়া দেওয়া।

তখন বিরাটের গরু ও সুশর্মাকে লইয়া সকলে এক জায়গায় আসিয়া মিলিলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছামতো সুশর্মাকে কিছু মিষ্ট উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই ঘটনায় বিরাট যে পাণ্ডবদিগের উপর নিতান্তই সন্তুষ্ট হইলেন, একথা বলাই বাহুল্য। তিনি বলিলেন, 'আপনাদের কৃপায় আজ আমার প্রাণ মান সব বজায় রহিল। এখন বলুন, আপনাদের কী দিয়া সন্তুষ্ট করিব?'

একথার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মহারাজ যে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, ইহাই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার। আপনি সুখে থাকুন।'

তারপর যুদ্ধজয়ের সংবাদ লইয়া দূতেরা বিরাট নগরের দিকে ছুটিয়া চলিল। অন্য সকলে সে রাত্রি যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাইয়া পরদিন বাড়ি ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বিরাট নগরে অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিরাট দলবল লইয়া সুশর্মার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, বাড়িতে রাজপুত্র উত্তর আর কয়েকজন কর্মচারী ছাড়া আর কেহই নাই। ইহার মধ্যে দুর্যোধন অসংখ্য সৈন্য আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি বড় বড় বীর সমেত আসিয়া মৎস্য দেশে উপস্থিত। তাঁহারা আসিয়াই বিরাটের গোয়ালাদিগকে ঠেঙাইয়া, একেবারে ষাট হাজার গরু লইয়া প্রস্থান করিলেন। গোয়ালারা মার খাইয়া চ্যাচাইতে চ্যাচাইতে আসিয়া রাজবাড়িতে খবর দিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, তখন রাজবাড়িতে যোদ্ধা ছিল না ; ছিলেন কেবল রাজপুত্র উত্তর। তিনি বাড়ির ভিতর হইতে এই সংবাদ শুনিয়া স্ত্রীলোকদিগের নিকট বাহাদুরি লইবার জন্য বলিতে লাগিলেন, 'কী করি, একজন সারথি নাই। ভালো একটি সারথি পাইলে আমি ভীষ্ম-টিষ্মকে মারিয়া এখনই গরু ছাড়াইয়া আনিতে পারিতাম। কৌরবেরা দেশ খালি পাইয়া গরু চুরি করিয়া নিতেছে, আমি সেখানে থাকিলে দেখিতাম, কেমন করিয়া নেয় !'

একথা শুনিয়া অর্জুন চুপি-চুপি দ্রৌপদীকে কি যেন শিখাইয়া দিলেন। তারপর দ্রৌপদী আসিয়া উত্তরকে বলিলেন, 'রাজপুত্র, আপনাদের বৃহন্নলা নামক ঐ হাতি-হেন সুশ্রী ওস্তাদটি আগে অর্জুনের সারথি ছিলেন। উনি অর্জুনের শিষ্য, আর যুদ্ধেও তাঁহার চেয়ে কম নহেন। পাণ্ডবদের ওখানে থাকার সময়ে তাঁহার কথা আমি বেশ জানিয়াছি। এমন সারথি আর কোথাও নাই।'

উত্তর বলিলেন, 'তাহা তো বুঝিলাম। কিন্তু আমি নিজে তাহাকে কেমন করিয়া আমার সারথি হইতে বলি ?'

দ্রৌপদী বলিলেন, 'আপনার ভগ্নী উত্তরা বলিলে উনি নিশ্চয় রাজি হইবেন। আর উঁহাকে সঙ্গে নিলে আপনারও যুদ্ধে জিতিয়া আশা নিশ্চিত।'

উত্তরাকে অর্জুন নিজের কন্যার মতো স্নেহ করিতেন ; তাঁহার আবদার তিনি কিছুতেই না রাখিয়া পারিতেন না। উত্তরের কথায় রাজকুমারী যখন অর্জুনের নিকট আসিয়া মধুর স্নেহ আর আদরের সহিত তাঁহাকে সারথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন আর তাঁহার 'না' বলিবার উপায় রহিল না। আর তাঁহার 'না' বলিবার ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং তিনি উত্তরার সঙ্গেই রাজপুত্রের নিকট চলিলেন। উত্তর তাঁহাকে বলিলেন 'বৃহন্নলা, আমি কৌরবদের হাত হইতে গরু ছাড়াইয়া আনিতে যাইব। তুমি আমার সারথি হইবে ?'

অর্জুন বলিলেন, 'আমি গাইয়ে-বাজিয়ে মানুষ, সারথি-ফারতি হওয়া কি আমার কাজ ? নাচিতে বলিলে বরং চেষ্টা করিতে পারি।'

উত্তরা কহিলেন, 'আগে তো সারথির কাজটা চালাইয়া দাও, শেষে নাচিবে এখন।'

এইরূপে হাসি-তামাশার ভিতরে অর্জুন সারথির সাজ পরিতে লাগিলেন। ভঙ্গির আর সীমা নাই ! যেন কতই আনাড়ী, জন্মেও যেন বর্ম চোখে দেখেন নাই। সেটাকে উল্টা করিয়া পরিয়া বসিলেন। মেয়েরা তো তাহা দেখিয়া হাসিয়া কুটিপাটি !

যাহা হউক, শেষে সাজগোজ করিয়া দুইজনেই রওনা হইলেন। যাইবার সময় উত্তরা বলিলেন, 'ভীষ্ম, দ্রোণ, এঁদের পোশাকগুলি কিন্তু আনা চাই, আমার পুতুল সাজাইব !'

তাহাতে অর্জুন হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার দাদা যদি উঁহাদিগকে পরাজয় করিতে পারেন তবে আনিব।'

এইরূপে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। উত্তরের উৎসাহ আর ধরে না। তিনি ক্রমাগতই বলিতেছেন, 'কোথায় গেল কৌরবরা? বৃহন্নলা, শীঘ্র চল, এখনি গরু ছাড়াইয়া আনিব।'

অর্জুন রথ চালাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। খানিক পরেই তাঁহারা সেই শ্মশানে আর শমী গাছের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে কৌরবদের সৈন্য দেখা যাইতেছিল—যেন সাগরের জল পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সেই সৈন্যের দল দেখিয়াই ভয়ে উত্তরের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'ও বৃহন্নলা, আমাকে এ কোথায় আনিলে? আমি ছেলেমানুষ, এত বড় সৈন্য আর ভয়ানক বীরের সহিত কেমন করিয়া যুদ্ধ করিব? ওমা, আমার কী হইবে? আমাকে ঘরে লইয়া চল।'

অর্জুন বলিলেন, 'সেকি রাজপুত্র! এত বড়াই করিয়াছিলেন, সে সব এখন কোথায়? এখন খালিহাতে ফিরিলে লোকে বলিবে কী? আমি তো গরু না লইয়া ফিরিতে পারিব না।'

উত্তরা বলিলেন, 'গরু যায় সেও ভালো। গালি খাই সেও ভালো। আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না।'

এই বলিয়া রাজপুত্র রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দে-ছুট।

কী বিপদ! বুঝি বেচারা সবই মাটি করে! কাজেই অর্জুনকে তাঁহার পিছু-পিছু ছুটিতে হইল। ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার মাথার লম্বা বেণী এলাইয়া গেল, গায়ের চাদর হাওয়ায় উড়িতে লাগিল।

অর্জুন একশত পা গিয়াই উত্তরের চুল ধরিলেন। তখন যে উত্তরের কান্না!—'ও বৃহন্নলা শীঘ্র ঘরে চল! তোমাকে মোহর দিব, হীরা দিব, ঘোড়া দিব, রথ দিব, হাতি দিব, আমাকে ছাড়িয়া দাও!'

অর্জুন তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, 'রাজপুত্র, তোমার কোনো ভয় নাই। তুমি যুদ্ধ করিতে না চাও, আমার সারথি হও। আমি যুদ্ধ করিয়া গরু ছাড়াইব।'

এইরূপে উত্তরকে শান্ত করিয়া অর্জুন তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইয়া সেখানে হইতে চলিয়া আসিলেন।

ওদিকে কৌরবদের লোকেরা এ সকল ঘটনার অর্থ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। উত্তরকে পালাইতে আর অর্জুনকে ছুটিতে দেখিয়া প্রথমে কেহ কেহ হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরেই তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, 'এ ব্যক্তি কে? স্ত্রীলোকের মতো কতকটা চেহারা বটে, কিন্তু আবার পুরুষের মতোও দেখিতেছি। মাথা, ঘাড় আর হাত ঠিক অর্জুনের মতো। এ ব্যক্তি নিশ্চয় অর্জুন, নহিলে এমন তেজিয়ান চেহারা কাহার? আর এমন সাহসই বা কাহার যে একেলা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে?

তখন দ্রোণ ভীষ্মকে বলিলেন, 'ভীষ্ম,আজ কিন্তু অর্জুনের হাতে আমাদের রক্ষা নাই। যুদ্ধে শিবকে খুশি করিয়াছে, তারপর এতদিন ক্লেশ পাইয়া রাগিয়া আছে; ও কি আমাদিগকে সহজে ছাড়িবে?'

একথায় কর্ণ বলিলেন, 'আমার আর দুর্যোধনের যে ক্ষমতা, অর্জুনের তাহার এক আনাও নাই।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'এ যদি অর্জুন হয় তবে তো ভালোই হইল। অজ্ঞাতবাস শেষ না হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই আবার বার বৎসর ইহাদিগকে বনবাস করিতে হইবে।

ইহাদের এইরূপ কথাবার্তা চলিয়াছে, ততক্ষণে অর্জুন উত্তরকে লইয়া সেই শমী গাছের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। শমী গাছের তলায় আসিয়া তিনি বলিলেন, 'রাজপুত্র, গাছে উঠিয়া ওই অস্ত্রগুলি নামাও।'

এ কথায় উত্তর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'ও গাছে তো মড়া বাঁধা রহিয়াছে, ছুঁইলে অশুচি হইবে যে!'

অর্জুন বলিলেন, 'উহা মড়া নহে, অস্ত্র। মড়া ছুঁইতে আমি তোমাকে কেন বলিব?'

তখন উত্তর গাছে উঠিয়া অস্ত্র নামাইলেন। তারপর তাহাদের বাঁধন খুলিয়া তাহাদের চেহারা দেখিয়া তিনি তো একেবারে অবাক! এমন অস্ত্র তিনি আর কখনো দেখেন নাই, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৃহন্নলা, এ-সকল অস্ত্র কাহার?'

অর্জুন বলিলেন, 'এসব পাণ্ডবদিগের।'

পাণ্ডবদিগের নাম শুনিয়া উত্তর আরো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'এসব যদি পাণ্ডবদিগের অস্ত্র হয়, তবে এখন তাঁহারা কোথায়?'

অর্জুন বলিলেন, 'তাঁহারা তোমার বাড়িতেই আছেন। আমি অর্জুন; তোমার পিতার যে কঙ্ক নামে সভাসদ্ আছেন, তিনি যুধিষ্ঠির; বল্লভ নামে ঐ ষণ্ডা পাচকটি ভীম, গ্রন্থিক নামে যে লোকটি ঘোড়াশালে কাজ করে সে নকুল; আর গোশালার কর্তা যে তন্ত্রিপাল সে সহদেব; তোমার বাড়িতে যিনি সৈরিন্ধ্রীর কাজ করেন, তিনি দ্রোপদী।' উত্তরের নিকট এ সকল কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের ন্যায় মহাপুরুষেরা তাঁহাদের বাড়িতে সামান্য চাকরের মতো বাস করিতেছেন, একথা কি সহজে বিশ্বাস হয়? কাজেই উত্তর অর্জুনের কথা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, 'শুনিয়াছি অর্জুনের দশটি নাম আছে; আপনি যদি অর্জুন হন,তবে সেই দশটি নাম আর তাহাদের অর্থ বলুন দেখি।'

অর্জুন বলিলেন, 'অর্জুন মানে সাদা, নির্মল। আমি নির্মল কাজ করি, এইজন্য আমি "অর্জুন"। দেশ জয় করিয়া ধন আনি, তাই আমি "ধনঞ্জয়"। যুদ্ধে আমি সর্বদা জয়লাভ করি, তাই আমি "বিজয়"। আমার রথের ঘোড়াগুলি সাদা, তাই আমি "শ্বেতবাহন"। আমার জন্মের দিন উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ছিল, তাই আমি "ফাল্গুনী"। দৈত্যদিগকে হারাইয়া ইন্দ্রের নিকট কিরীট অর্থাৎ মুকুট পুরস্কার পাইয়াছিলাম, তাই আমি "কিরীটি"। যুদ্ধের সময় আমি বীভৎস অর্থাৎ নিষ্ঠুর কাজ করি না, তাই আমি "বীভৎসু"। আমি সব্য অর্থাৎ বাম হাতেও ডান হাতের ন্যায় তীর ছাড়িতে পারি, তাই আমি "সব্যসাচী"। ভয়ানক শত্রুকেও আমি জয় করিয়া থাকি, তাই আমি "জিষ্ণু"। আর রঙ কালো বলিয়া আমি "কৃষ্ণ"।

তখন উত্তর জোড়হাতে অর্জুনকে নমস্কার করিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, 'মহাশয়, আমি না জানিয়া আপনার নিকট অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন!'

অর্জুন বলিলেন, 'আমি তোমার উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নাই। ভয় পাইয়ো না; অস্ত্রগুলি রথে তোল, তোমার গরু ছাড়াইয়া দিতেছি।'

এতক্ষণে উত্তরের খুব সাহস হইয়াছে, কারণ অর্জুন সঙ্গে থাকিলে আর কীসের ভয়? তারপর আর সারথির কাজ করিতে তিনি কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না।

তারপর অর্জুন হাত হইতে বালার গোছা খুলিয়া ঝকঝকে সোনার কবচ আঁটিয়া পরিলেন, সাদা কাপড় দিয়া মাথার বেণী বেশ করিয়া বাঁধিলেন। শেষে সেই সুন্দর রথে চড়িয়া, নানারূপ

অস্ত্র মনে মনে ডাকিবামাত্র তাহারা উপস্থিত হইয়া জোড়হাতে বলিল, 'আমরা আসিয়াছি, কী করিতে হইবে অনুমতি করুন।'

অর্জুন বলিলেন, 'তোমরা যুদ্ধের সময় আমার সঙ্গে থাকিয়া আমার কাজ করিবে।'

এইরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অর্জুন গাণ্ডীবে টঙ্কার ও তাঁহার বিশাল শঙ্খে ফুঁ দিবামাত্র উত্তর ভয়ে কাঁপিতে-কাঁপিতে রথের ভিতরে বসিয়া পড়িলেন।

তাহা দেখিয়া অর্জুন বলিলেন, 'কী হইয়াছে? ভয় পাইতেছ কেন?'

উত্তর বলিলেন, 'উঃ! আমার কান ফাটিয়া গেল! মাথা ঘুরিয়া গেল! শঙ্খের আর ধনুকের শব্দ এমন ভয়ানক হইতে পারে, তাহা তো আমি জানিতাম না!'

যাহা হউক, শেষে উত্তরের ভয় গেল।

এদিকে সেই ধনুকের টঙ্কার আর শঙ্খের শব্দ শুনিয়া কৌরবদের আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে, উহা অর্জুনের ধনুক আর শঙ্খ। দুর্যোধনের তখন ভারি আনন্দ। তিনি ভাবিলেন যে, অর্জুন সময় ফুরাইবার পূর্বেই দেখা দিয়াছেন, সুতরাং পাণ্ডবদিগকে আবার বার বৎসর বনবাস করিতে হইবে।

কর্ণের খুবই উৎসাহ। তিনি ভাবিলেন যে, অর্জুনকে মারিয়া একটা নিতান্ত বাহাদুরি কাণ্ড করিবেন।

যাঁহারা একটু শান্ত ও ধার্মিক, তাঁহারা বলিলেন, 'আজ অর্জুনের হাতে বড়ই বিপদ দেখা যাইতেছে, সকলে সাবধানে থাকুন!'

এইরূপ নানারকম কথাবার্তা হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, 'অজ্ঞাতবাসের এখনো বাকি আছে।' কেহ বলিতেছেন, 'না, বাকি নাই, তাহা হইলে অর্জুন কখনি এমন করিয়া আসিতেন না।' শেষে ভীষ্ম ভালোমতো হিসাব করিয়া বলিলেন, 'আমি দেখিতেছি পাণ্ডবদের তের বৎসর পূর্ণ হইয়া পাঁচ ছয় দিন বেশি হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের যাহা করার কথা ছিল, তাহা ভালোরূপেই করিয়াছেন, তাহাতে ভুল নাই।'

তারপর ভীষ্মের কথায় সৈন্যদিগকে চারি ভাগ করিয়া, এক ভাগের সহিত দুর্যোধন নিজেকে বাঁচাইবার জন্য হস্তিনায় যাত্রা করিলেন ; আর এক ভাগ গরু লইয়া চলিল ; আর দুই ভাগ লইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি অর্জুনকে আটকাইতে প্রস্তুত হইলেন।

এমন সময় অর্জুনের দুইটি বাণ আসিয়া দ্রোণের পায়ের কাছে পড়িল। আর দুইটি বাণ তাঁহার কানের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। দ্রোণ হইলেন অর্জুনের গুরু। এতদিন পরে দেখা হইল, প্রণাম করিয়া দুটি কুশল মঙ্গল তো জিজ্ঞাসা করা চাই। এত দূরে থাকিয়া সে কাজ আর কিরূপে হইবে? তাই অর্জুন গুরুর পায়ের কাছে বাণ ফেলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। আর এইসব কাজের অর্থ বুঝিতে পারিয়া দ্রোণের বিশেষ আনন্দ হইল। এদিকে অর্জুন যখন দেখিলেন যে, দুর্যোধনের পলায়ন করিবার চেষ্টা, তখন উত্তরকে বলিলেন, 'আগে ঐ হতভাগার কাছে চল।'

অর্জুনের রথকে দুর্যোধনের দিকে ছুটিতে দেখিয়া কৃপ দ্রোণকে বলিলেন, 'আর কারুর ভাবনা ভাবিয়া কাজ নাই। ঐ দেখ দুর্যোধনের এখন বড়ই বেগতিক।'

অর্জুন দুর্যোধনের দিকে চলিয়াছেন, তাঁহাকে আটকাইবার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। কিন্তু অর্জুনকে আটকায় কাহার সাধ্য! যে তাঁহার সামনে আসিতেছে, তাহারই তিনি দুর্দশার একশেষ করিতেছেন। কেহ পালাইতেছে, কেহ মারা যাইতেছে। অনেকে

ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া মার খাইতেছে।

অর্জুনকে আটকাইতে গিয়া কর্ণের এক ভাই মারা গেল। কর্ণ তাহাতে বিষম রাগের সহিত আসিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। দু-জনে কিছুকাল এমনি ভয়ানক যুদ্ধ হইল যে, তাহার আর তুলনা নাই। শেষে দেখা গেল যে, কর্ণ হাতে, মাথায়, উরুতে, কপালে আর ঘাড়ে বিষম বাণের খোঁচা খাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতেছেন।

এইরূপে একে একে সকলেই অর্জুনের হাতে নাকাল হইতে লাগিলেন। কর্ণ পালাইলে আসিলেন কৃপ, কৃপ পালাইলে দ্রোণ। দ্রোণকে অর্জুন কিছুতেই অস্ত্র মারিতে চাহেন নাই। কিন্তু দ্রোণ অর্জুনের গায় বাণ মারিতে আরম্ভ করিলেন, কাজেই অর্জুনকেও যুদ্ধ করিতে হইল। তাহার ফলে দ্রোণও বেশ ফাঁপরে পড়িয়াছিলেন; ইহার মধ্যে অশ্বত্থামা আসিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করাতে, সেই ফাঁকে দ্রোণ সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া রক্ষা পান। তারপর কর্ণ আবার আসিয়াছিলেন, আর তাঁহার সাজাও তেমনি হইয়াছিল। এবার বুকে সাংঘাতিক বাণ খাইয়া তিনি রণস্থলেই অজ্ঞান হইয়া যান। তারপর কোনোমতে উঠিয়া পলায়ন করেন।

এইরূপে কত লোক অর্জুনের কাছে জব্দ হইল, তাহা কত বলিব! সকলে একসঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। নিজে ভীষ্ম অজ্ঞান হইয়া গেলেন, তাঁহার সারথি রথ হাঁকাইয়া তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

দুর্যোধন দুইবার অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। প্রথমবার পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে অর্জুন অনেক ঠাট্টা করায় রাগের ভরে আবার আসেন। এবারে ভীষ্ম প্রভৃতি সকলে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া অর্জুনের উপর বাণ মারিতে আরম্ভ করিলে, অর্জুন অতি চমৎকার উপায়ে তাঁহাদিগকে জব্দ করেন। এবারে কাহাকেও মারিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি 'সম্মোহন' নামক অস্ত্র ছুড়িয়া মারিলেন। সেই আশ্চর্য অস্ত্র ছুড়িয়া শঙ্খে ফুঁ দিবামাত্রই সকলে অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন উত্তরার সেই কথা মনে করিয়া তনি উত্তরকে বলিলেন, 'তুমি শীঘ্র গিয়া দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা আর দুর্যোধনের গায়ের কাপড়গুলি লইয়া আইস। সাবধান, ভীষ্মের কাছে যাইও না, তিনি এই অস্ত্র থামাইবার সংকেত জানেন হয়ত তিনি অজ্ঞান হন নাই।'

অর্জুনের কথা যে ঠিক তাহার পরিচয় হাতে-হাতেই পাওয়া গেল। কর্ণ দুর্যোধন প্রভৃতির কাপড় আনিয়া উত্তর ভালো করিয়া রথে বসিতে-না-বসিতেই ভীষ্ম উঠিয়া আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু অর্জুনের দশ বাণ খাইয়া বুড়ার আর যুদ্ধ করিতে হইল না।

এদিকে দুর্যোধন জাগিয়া উঠিয়াই ভারি চোটপাট আরম্ভ করিয়াছেন, 'আপনারা কী জন্য অর্জুনকে এত সহজে ছাড়িয়া দিতেছেন? শীঘ্র উহার ঘাড় ভাঙিয়া দিন!'

তখন ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন, 'দুর্যোধন, তোমার বুদ্ধি কোথায় ছিল? অজ্ঞান হইয়া যখন গড়াগড়ি খাইতেছিলে, তখন অর্জুন ইচ্ছা করিলেই তো তোমাদের কর্ম শেষ করিয়া দিতে পারিত। সে ধার্মিক লোক, তাই দয়া করিয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাই ঢের; এখন প্রাণ থাকিতে ঘরে ফিরিয়া চল।'

আর দুর্যোধনের মুখে কথা আছে! তাঁহার মাথা হেঁট হইয়া গিয়াছে, লম্বা নিঃশ্বাস বহিতেছে। এদিকে অর্জুন বাণের দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিকে নমস্কার করিয়া আর এক বাণে দুর্যোধনের মুকুটটি দুইখান করিয়া গরু লইয়া শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে ঘরে ফিরিলেন।

ফিরবার সময় পথে অর্জুন উত্তরকে বলিলেন, 'সাবধান! ঘরে ফিরিয়া কিন্তু আমার নাম করিও না। আমরা যে তোমাদের এখানে আছি, তাহা যেন তোমাদের লোকেরা জানিতে না পারে।'

তারপর সেই শমী গাছের নিকটে আসিয়া অর্জুন আবার বৃহন্নলার বেশে রাজপুত্রের সারথি হইয়া বসিলেন। গোয়ালারা তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে বসাইয়া তাড়াতাড়ি নগরে সংবাদ পাঠাইল যে, যুদ্ধ জিতিয়া গরু ছাড়ানো হইয়াছে।

এদিকে রাজা বিরাট দেশে ফিরিয়া মেয়েদের নিকট শুনিলেন যে, উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া কৌরবদিগের নিকট হইতে গরু ছাড়াইয়া আনিতে গিয়াছেন। এই সংবাদে তাঁহার মনে কিরূপ চিন্তা ও ভয় হইল, তাহা বুঝিতেই পার। তিনি তাড়াতাড়ি সৈন্যদিগকে বলিলেন, 'তোমরা শীঘ্র তাহাকে খুঁজিতে যাও। হায় হায়! একে ছেলেমানুষ, তাহাতে বৃহন্নলা সারথি; সে কি আর এতক্ষণ বাঁচিয়া আছে!'

এ কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মহারাজ, কোনো ভয় নাই। বৃহন্নলা যখন সারথি, তখন দেব, দানব, যক্ষ প্রভৃতি সকলে মিলিয়াও রাজকুমারের কিছুই করিতে পারিবে না।'

এমন সময় সংবাদ আসিল যে, যুদ্ধ জিতিয়া গরু সব ছাড়ানো হইয়াছে। তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার তো জয় হইবেই।' এই সংবাদ শুনিয়া বিরাটের কী আনন্দই হইল! তিনি দূতগণকে পুরস্কার দিয়া তখনি নগরে একটা ভারি ধুমধামের ব্যবস্থা করিলেন।

তারপর সৈরিন্ধ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাশা আন, আমি কঙ্কর সহিত পাশা খেলিব।'

পাশা আসিল; খেলা আরম্ভ হইল। রাজার মন আজ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি পাশা খেলিতে খেলিতে বলিলেন, 'কঙ্ক,আজ আমার পুত্র কৌরবদিগকে হারাইয়াছে!'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মহারাজ, বৃহন্নলা সারথি, হারাইবেন না তো কী?'

একথায় তো রাজা একেবারে চটিয়া লাল। 'কী! আমার পুত্র কি উহাদিগকে হারাইতে পারে না! তুমি যে কেবল বার বার বৃহন্নলা বৃহন্নলা করিতেছ? খবরদার প্রাণের মায়া থাকে তো আর এমন বেয়াদপি করিও না!'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এ–সব বীরকে কি বৃহন্নলা ছাড়া আর কেহ হারাইতে পারে?'

ইহার পর রাজা আর রাগ থামাইতে না পারিয়া, যুধিষ্ঠিরের মুখে পাশা ছুড়িয়া মারিলেন। পাশার ঘায় যুধিষ্ঠিরের নাক দিয়া দর–দর ধারে রক্ত পড়িয়া তাঁহার অঞ্জলি ভরিয়া গেল। দ্রৌপদী তাড়াতাড়ি সোনার গামলায় জল আনিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় দ্বারী আসিয়া বলিল, 'রাজকুমার বৃহন্নলার সহিত দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন।' তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'শীঘ্র তাঁহাদিগকে এইখানে লইয়া আইস।'

যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, সর্বনাশ উপস্থিত। অর্জুন আসিয়া তাঁহার সে অবস্থা দেখিলে আর বিরাটকে আস্ত রাখিবেন না। কাজেই তিনি দ্বারীর কানে কানে বলিয়া দিলেন যে, বৃহন্নলা যেন এখানে না আসে। সুতরাং উত্তর একাই সেখানে আসিলেন।

উত্তর যুধিষ্ঠিরের মুখে রক্ত দেখিয়াই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, এমন অন্যায় কাজ কে করিল? ইহাকে কে আঘাত করিল?'

রাজা বলিলেন, 'আমিই করিয়াছি। আমি যতই তোমার প্রশংসা করি, ততই এ বামুন খালি বৃহন্নলার কথা বলে। কাজেই শেষে আমি উহাকে মারিয়াছি।'

উত্তর বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ রাগিলে সর্বনাশ হইবে। শীঘ্র ইহাকে সন্তুষ্ট করুন।'

একথায় রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মহারাজ, আমি পূর্বেই ক্ষমা করিয়াছি।'

যুধিষ্ঠিরের রক্ত পরিষ্কার হইলে বৃহন্নলা সেখানে আসিয়া রাজাকে নমস্কার করিলেন। রাজা বৃহন্নলার সামনেই উত্তরকে বলিতে লাগিলেন, 'বাবা, তুমি আমার মান রাখিয়াছ। তোমার মতোন পুত্র কি আর কাহারও হয়! এতগুলি মহা মহা বীরের সহিত না জানি কেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলে!'

উত্তর বলিলেন, 'বাবা আমার কিছুই করিতে হয় নাই। এক দেবপুত্র আসিয়া আমার হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন; তিনিই কৌরবদিগকে তাড়াইয়া গরু ছাড়াইয়া আনিয়াছেন।'

তখন বিরাট বলিলেন, 'তবে তো সেই দেবপুত্রের পূজা করিতে হয়। তিনি কোথায়?'

উত্তর বলিলেন, 'তিনি কাল পরশু আসিবেন।'

যুদ্ধের সংবাদে সকলেই খুব খুশি হইল। আর উত্তরা সেই কাপড়গুলি পাইয়া যে কত খুশি হইলেন, তাহা আর লিখিয়া কী বুঝাইব!

এইরূপ অজ্ঞাতবাস শেষ হইল। পাঁচ ভাই উত্তরকে লইয়া পরামর্শ করিলেন যে, আর দু-দিন পরে তাঁহারা নিজেদের পরিচয় দিবেন। কিরূপ করিয়া পরিচয় দেওয়া হইবে তাহাও স্থির হইল।

যেদিন পরিচয় দিবার কথা, সেদিন পাণ্ডবেরা স্নানের পর সুন্দর সাদা পোশাক আর অলংকার পরিয়া বিরাটের সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। বিরাট সভায় আসিয়া দেখেন, এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! সভাসদ কঙ্ক সাজগোজ করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া আছেন। তিনি বিরক্তিভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেকি কঙ্ক! আমার সিংহাসনে কেন বসিতে গেলে?'

একথায় অর্জুন হাসিয়া বলিলেন, 'মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের সিংহাসনেও বসিতে পারেন। আপনার সিংহাসনে বসাতে তাঁহার কী অন্যায় হইল?'

বিরাট বলিলেন, 'ইনি যদি রাজা যুধিষ্ঠির হন, তবে তাঁহার ভ্রাতাগণ আর দ্রৌপদী দেবী কোথায়?'

এ প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন একে-একে সকলেরই পরিচয় দিলেন। তারপর উত্তর অর্জুনের অনেক প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 'যে দেবপুত্র কৌরবদিগের সহিত ভয়ংকর যুদ্ধ করিয়া গরু ছাড়াইয়াছিলেন, তিনি এই অর্জুন।'

সকল কথা শুনিয়া বিরাটের যেমন আশ্চর্য বোধ হইল, তেমনি তিনি আনন্দিতও হইলেন। পাণ্ডবদিগকে যত প্রকারে আদর দেখানো সম্ভব মনে হইল, তিনি তাহার কিছুই বাকি রাখিলেন না। তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'আমার কী সৌভাগ্য। কী সৌভাগ্য!' বিশেষত অর্জুনের প্রতি তাঁহার যে কীরূপ স্নেহ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, নিজের কন্যা উত্তরার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কিন্তু একথায় অর্জুন রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'আমি উত্তরার গুরু; তাঁহাকে সর্বদা আমার কন্যার মতো ভাবিয়া স্নেহ করিয়াছি। তিনিও আমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন। তাঁহার সহিত কি আমার

বিবাহের কথা হইতে পারে? আমার পুত্র অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হইবে।'

এই প্রস্তাবে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। রূপে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বীরত্বে অভিমন্যুর মতোন এমন সুপাত্র আর হয় না। কাজেই সুন্দর দিন দেখিয়া মহা সমারোহে অভিমন্যু আর উত্তরার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে নানা দেশ হইতে বিরাট এবং পাণ্ডবদিগের আত্মীয়-স্বজন আর রাজারা আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ, বলরাম, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি কেহই বাকি ছিলেন না।

উদ্যোগপর্ব

অভিমন্যু আর উত্তরার বিবাহের পরে বিরাটের বাড়িতে রাজা এবং যোদ্ধাদের মস্ত এক সভা হইল। বিবাহে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বড় বড় বীর, এবং সকলেই পাণ্ডবদিগের বন্ধু। ইঁহারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এখন কী উপায়ে পাণ্ডবেরা নিজ রাজ্য ফিরাইয়া পাইতে পারেন। সেই কপট পাশা খেলায় হারিয়া পাণ্ডবেরা বার বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞা করেন। সে প্রতিজ্ঞা তাঁহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তথাপি দুরাত্মা দুর্যোধনের দল এখন বলিতেছে যে, তের বৎসর না যাইতে তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াছে। আসলে তাহাদের রাজ্য ছাড়িয়া দিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। তাই পাণ্ডবদিগের বন্ধুগণ স্থির করিলেন যে, যদি সহজে উহারা রাজ্য ছাড়িয়া না দেয়, তবে যুদ্ধ করিয়া তাহা আদায় করিতে হইবে।

এদিকে দুর্যোধন প্রভৃতিও চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন না। পাণ্ডবেরা যে তাঁহাদের রাজ্য সহজে ছাড়িবে না, একথা তাঁহারা বেশ জানিতেন। সুতরাং দুই দলেরই যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইল। একদিকে যেমন সৈন্যসামন্ত এবং অস্ত্রশস্ত্রের যোগাড় হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমন বড় বড় বীরদিগকে ডাকিয়া নিজের দলে আনিবার চেষ্টারও ত্রুটি হইল না।

কৃষ্ণের সাহায্য পাওয়া একটা মস্ত কথা। সেজন্য দুর্যোধন আর অর্জুন এক সময়েই দ্বারকায় যাত্রা করেন এবং প্রায় একই সময়ে সেখানে উপস্থিত হন। কৃষ্ণ তখন নিদ্রায়। দুর্যোধন আগেই

তাঁহার শয়ন-ঘরে গিয়া তাঁহার মাথার নিকট একটি বড় আসন অধিকার করিলেন ; পরে অর্জুন আসিয়া বিনীতভাবে কৃষ্ণের পায়ের কাছে বসিলেন।

ঘুম ভাঙিলে প্রথমে পায়ের দিকে চোখ পড়ে। কাজেই কৃষ্ণ জাগিয়া আগে দেখিলেন অর্জুনকে, তারপর দেখিলেন দুর্যোধনকে। দুইজনকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী জন্য আসিয়াছ?'

দুর্যোধন হাসিমুখে বলিলেন, 'যুদ্ধে আপনার সাহায্য চাহিতে আসিয়াছি আর আগে আমি আসিয়াছি, কাজেই আমার কথাই আপনাকে রাখিতে হইবে।'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'তুমি আগে আসিয়াছ সত্য। আর আমি আগে অর্জুনকে দেখিয়াছি, একথাও সত্য। সুতরাং আমি দু'জনকেই সাহায্য করিব। একদিকে "নারায়ণী সৈন্য" নামক আমার অতি ভয়ংকর এক অর্বুদ সৈন্য থাকিবে, অপরদিকে আমি নিজে শুধু হাতে থাকিব, কিন্তু যুদ্ধ করিব না। এই দুয়ের মধ্যে যাহার যাহা ইচ্ছা, নিতে পারে। অর্জুন বয়সে ছোট, সুতরাং তাহাকেই আগে জিজ্ঞাসা করি। বল তো অর্জুন, ইহার মধ্যে তোমার কোনটা পছন্দ হয়?'

অর্জুন বলিলেন, 'আমি সৈন্য চাহি না, আপনাকে চাহি।'

কাজেই অর্জুন পাইলেন কৃষ্ণকে আর দুর্যোধন পাইলেন এক অর্বুদ সৈন্য। আর দু'জনেই মনে করিলেন, 'আমি খুব জিতিয়াছি।'

সেখান হইতে দুর্যোধন বলরামের নিকট গেলেন। কিন্তু বলরাম বলিলেন, 'আমি তোমাদের কাহাকেও সাহায্য করিব না, তোমরা প্রস্থান কর।'

এদিকে কৃষ্ণ আর অর্জুন স্থির করিলেন যে, যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইবেন।

শল্য কী করিয়াছিলেন শুনিবে? সে হাসির কথা। শল্য পাণ্ডবদিগের মাতুল, মাদ্রীর ভাই। তিনি পাণ্ডবদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বিস্তর সৈন্য লইয়া তাঁহার রাজ্য মদ্র দেশ হইতে যাত্রা করিলেন। পথে দুর্যোধন তাঁহাকে হাত করিবার জন্য তাঁহার এতই সমাদর করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে দেবতারও মন ভুলিয়া যায়। যেখানেই শল্য বিশ্রাম করিবেন, সেইখানেই দুর্যোধন চমৎকার একটি বৈঠকখানা করিয়া রাখিয়াছেন। বৈঠকখানাগুলি দেখিয়া শল্য ভাবিলেন, 'বাঃ! পাণ্ডবেরা আমার কতই যত্ন করিতেছে!' এ দুর্যোধনের চাতুরি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। একটা বৈঠকখানার কারুকার্য তাঁহার বড় ভালো লাগায় তিনি বলিলেন, 'ইহার কারিকরকে ডাক বকশিশ দিব।' অমনি নিজে দুর্যোধন কারিকর সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত। শল্য তাঁহাকে বলিলেন, 'কারিকর, বল, তুমি কি পুরস্কার চাও, আমি তাহাই দিতেছি।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'মামা, আপনার কথা যেন মিথ্যা না হয়। আমি এই চাই যে, আপনি আমাদের দলে আসিয়া সেনাপতি হউন।'

সে সকল লোক কথায় বড় খাঁটি ছিলেন। শল্যের আর পাণ্ডবদিগকে সাহায্য করা হইল না। দুর্যোধনকে তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি যুধিষ্ঠিরের সহিত দেখা করিয়া আসিতেছি।'

যুধিষ্ঠিরের সহিত দেখা হইলে শল্য তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, 'তোমাদের দুঃখের শেষ হইয়াছে, এখন তোমাদের শত্রুদিগকে মারিয়া সুখে রাজত্ব কর। তারপর পথে দুর্যোধনের ফাঁকিতে পড়িয়া যে সকল কথা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। সে কথায় যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'মামা, আপনি আপনার কথা রাখিয়া ভালো করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের

একটু উপকার করিতে হইবে। কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আপনি কর্ণের সারথি হইয়া এমন উপায় করিবেন, যাহাতে তাহার তেজ কমিয়া যায়।'

শল্য বলিলেন, 'সে বিষয়ে তোমরা কোনো চিন্তা করিও না। আমার যতদূর সাধ্য, তোমাদের উপকার করিব।'

এইরূপে বড় বড় বীরগণ ক্রমে দুই দলের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পাণ্ডবদিগের দলে প্রথমে আসিলেন সাত্যকি। ইনি অসাধারণ যোদ্ধা, কৃষ্ণের আত্মীয় এবং অর্জুনের ছাত্র ও বন্ধু। ইহার সঙ্গে এক অক্ষৌহিণী* সৈন্য আসিল। তারপর চেদী দেশের রাজা মহাবীর ধৃষ্ঠকেতু এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন। তারপর মগধের রাজা জরাসন্ধের পুত্র জগৎসেন এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া আসিলেন। তারপর দ্রুপদ, বিরাট উঁহারা অনেক লক্ষ যোদ্ধা আর সৈন্যের যোগাড় করিলেন। এইরূপে পাণ্ডবদের পক্ষে সাত অক্ষৌহিনী সৈন্য হইল।

দুর্যোধনের দলে—

ভগদত্তের এক অক্ষৌহিনী, ভূরিশ্রবার এক অক্ষৌহিণী, শল্যের এক অক্ষৌহিণী, কৃতবর্মার এক অক্ষৌহিণী, জয়দ্রথের এক অক্ষৌহিনী, কম্বোজের রাজা সুদক্ষিণের এক অক্ষৌহিণী, ইহা ছাড়া দক্ষিণাপথ, অবন্তী প্রভৃতি নানা দেশ হইতে আরও পাঁচ অক্ষৌহিনী, সর্বসুদ্ধ এগার অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল।

এইরূপে দুই দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আর অল্পদিনের মধ্যেই ভয়ংকর মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইবে, রক্তে দেশ ভাসিয়া যাইবে, ঘরে ঘরে কান্না উঠিবে। দেশের যত ক্ষত্রিয় বীর, প্রায় সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। হায়! আর অল্প দিন পরে হয়ত উঁহাদের কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না।

যুদ্ধ কী ভয়ংকর কাজ, আর ক্ষত্রিয়ের কর্ম কী কঠিন! মানুষকে মারিয়া মানুষ মনে করিবে যে, 'ধর্ম' করিলাম। কয়েকজন লোক একটা রাজ্য লইয়া ঝগড়া করিতেছে, তাহার জন্য দেশসুদ্ধ লোক কাটাকাটি করিয়া মরিবে।

এমন যুদ্ধ কে সহজে করিতে চায়? পাণ্ডবেরা তো তাহা চাহেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, 'আমাদের সমুদয় রাজ্য না দেয়, কেবল আমরা নিজহাতে যেটুকু জয় করিয়া লইয়াছিলাম, তাহাই দেউক। তাহাও যদি না দেয়, পাঁচজনকে পাঁচখানি গ্রাম মাত্র দিলেও আমরা সন্তুষ্ট হইব।'

কিন্তু দুষ্ট লোক লোভে পড়িলে কি আর তাহার ভালো-মন্দ জ্ঞান থাকে? কত লোক দুর্যোধনকে বুঝাইল, কিছুতেই তাঁহার চৈতন্য হইল না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি

---

*	১ হাতি	১ রথ	৩ ঘোড়া	৫ পদাতিতে	এক 'পত্তি'।
৩ পত্তি অর্থাৎ	৩ ,,	৩ ,,	৯ ,,	১৫ ,,	এক 'সেনা মুখ'।
৩ সেনা মুখ ,,	৯ ,,	৯ ,,	২৭ ,,	৪০ ,,	এক 'গুল্ম'।
৩ গুল্ম ,,	২৭ ,,	৮১ ,,		১৩৫ ,,	এক 'গণ'।
৩ গণ ,,	৮১ ,,	৮১ ,,	২৪৩ ,,	৪০৫ ,,	এক 'বাহিনী'।
৩ বাহিনী ,,	২৪৩ ,,	২৪৩ ,,	৭২৯ ,,	১২১৫ ,,	এক 'পৃতনা'।
৩ পৃতনা ,,	৭২৯ ,,	৭২৯ ,,	২১৮৭ ,,	৩৬৪৫ ,,	এক 'চমু'।
৩ চমু ,,	২১৮৭ ,,	২১৮৭ ,,	৬৫৬১ ,,	১০৯৩৫ ,,	এক 'অনিকিনী'।
১০ অনিকিনী ,,	২১৮৭০ ,,	২১৮৭০ ,,	৬৫৬১০ ,,	১০৯৩৫০ ,,	এক 'অক্ষৌহিণী'।

সকলে মিলিয়া কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া শুনিবে না তাহার কাছে কথা বলিয়া কী ফল? কর্ণ, শকুনি প্রভৃতিরা দুর্যোধনকে ক্রমাগত যুদ্ধ করিবার উৎসাহ দিয়া এমন করিয়া তুলিলেন যে, তিনি আর কাহারও কথায় কান দিতে চাহেন না।

ধৃতরাষ্ট্র মুখে দুর্যোধনের নিন্দা করিয়াছিলেন, আর পাণ্ডবদিগের সহিত বন্ধুতা করার কথা বার বার বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সরলভাবে বলেন নাই, কাজেই তাঁহার কথায় কোনো ফল হয় নাই।

সকলের শেষে কৃষ্ণ এই যুদ্ধ থামাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার কথা রাখা দূরে থাকুক, দুর্যোধন তাঁহাকে অপমান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। রাজ্য দিবার কথায় রাজি করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ দুর্যোধনের নিকট পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচখানি গ্রাম মাত্র চাহিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে দুর্যোধন বলেন কি যে, খুব সরু ছুঁচের আগায় যতটুকু জায়গা বিঁধে তাহার অর্ধেকও বিনা যুদ্ধে দিবেন না।

ইহার পর আবার বুদ্ধিমানেরা কৃষ্ণকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া আর কাজে তাহা করিতে সাহস হয় নাই। তিনি ধমকের চোটে দুষ্টদিগকে জব্দ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসেন। আসিবার পূর্বেই কৃষ্ণ কর্ণকে নির্জনে ডাকিয়া বলিলেন, 'কর্ণ, তুমি কাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছ? জান কি পাণ্ডবেরা তোমার ছোট ভাই? তুমি এখনি আমার সঙ্গে চল, তোমার ভাইদের সহিত তোমার পরিচয় করাইয়া দিই। পাণ্ডবেরা তোমাকে চিনিতে পারিলে তোমায় মাথায় করিয়া রাখিবেন। তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে তুমি, আর পাণ্ডবদের প্রধান কাজ হইবে তোমার সেবা করা আর তোমার আজ্ঞা পালন করা। তুমি আর অর্জুন, দুই ভাই মিলিয়া এই পৃথিবীতে কত বড় বড় কাজ করিবে, আর তাহা দেখিয়া আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।'

কর্ণ বলিলেন, 'কৃষ্ণ, তোমার সকল কথাই সত্য। কিন্তু তুমি আমাকে কী মনে করিয়াছ? দুর্যোধনের অনুগ্রহে আমি রাজ্য পাইয়া সুখে বাস করিতেছি। এই দুর্যোধনকে আমার ভরসায় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমি তাহাকে ছাড়িয়া যাইব? আমার দ্বারা তাহা কখনই হইবে না। পাণ্ডবেরা আমার ভাই হইলেই কী? লোকে তো জানে, আমি অধিরথ সারথির পুত্র। এখন যুদ্ধের আরম্ভেই যদি আমি পাণ্ডবদিগের সাহিত মিলিতে যাই, তবে সকলে বলিবে আমি কাপুরুষ। না কৃষ্ণ, তোমার কথা আমি রাখিতে পারিব না।'

বনবাসে যাইবার সময় কুন্তীকে পাণ্ডবেরা বিদুরের বাড়িতে রাখিয়া যান। কৃষ্ণও যুদ্ধ থামাইবার চেষ্টায় আসিয়া এবারে বিদুরের বাড়িতেই ছিলেন। কাজেই তাঁহার নিকট কুন্তীর কোনো কথাই জানিতে বাকি থাকে নাই।

কৃষ্ণ চলিয়া যাইবার পরে, যুদ্ধের কথা ভাবিয়া, কুন্তীর মনে বড়ই ক্লেশ হইতে লাগিল। পুত্রগণ যুদ্ধ করিয়া একজন আর একজনকে মারিবে, মায়ের প্রাণে একথা কি সহ্য হইতে পারে? তাই তিনি মনে করিলেন, তিনি নিজে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

কর্ণ রোজ গঙ্গায় স্নান করিয়া সূর্যের স্তব করিতেন। স্নানের সময় কুন্তী গঙ্গার ধারে গিয়া সেই স্তবের শব্দে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং তাঁহারই ছায়ায় বসিয়া স্তব শেষ হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্তবের শেষে কর্ণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জোড়হাতে বলিলেন, 'হে দেবি, আমি অধিরথ এবং রাধার পুত্র কর্ণ, আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনার কী

চাহি?' কুন্তী বলিলেন, 'বাছা, তুমি আমারই পুত্র। রাধার পুত্র তুমি কখনি নহ; সারথির ঘরে তোমার জন্মও হয় নাই। নিজের ভাইদিগকে না চিনিতে পারিয়া, কেন তুমি বাবা, দুর্যোধনের সেবা করিতেছ? তোমার ভাইদের কাছে তুমি আইস। যেমন কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই, তেমনি আমার কর্ণ আর অর্জুন হউক। পাঁচ ভাইয়ের প্রভু হইয়া তুমি সুখে রাজত্ব কর। সারথির পুত্র বলিয়া যেন তোমার দুর্নাম না থাকে।'

একথায় কর্ণ বলিলেন, 'আপনার কথায় আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। জন্মকালে আপনি আমাকে ফেলিয়া দিয়াছিলেন; মায়ের কাজ আমার প্রতি কিছুই করেন নাই। এখন যে আমাকে স্নেহ দেখাইতেছেন, তাহাও কেবল আপনার পুত্রদিগের উপকারের জন্য। এমন অবস্থায় আমি আপনার কথায় দুর্যোধনকে ছাড়িতে যাইব কেন? তবে, আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাই এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব ইহাদের কাহারও আমি কোনো অনিষ্ট করিব না। কিন্তু অর্জুনকে ছাড়িতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নহি। যুদ্ধে হয় আমি তাহাকে মারিব, না হয় সে আমাকে মারিবে। আপনার পাঁচ পুত্রই লোকে জানে, তাহার অধিক পুত্র আপনার থাকা ভালো নহে।'

এই বলিয়া কর্ণ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কুন্তীও কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিলেন।

যুদ্ধ আর কিছুতেই থামিল না। সুতরাং তাহার আয়োজন বিধিমতেই হইতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রের প্রকাণ্ড মাঠের ভিতর দিয়া হিরন্বতী নদী বহিতেছে। সেই নদীর ধারে যুধিষ্ঠির তাঁহার সৈন্য সাজাইতে লাগিলেন। দুর্যোধনের লোকেরাও তাহারই সামনে আসিয়া শিবির প্রস্তুত করিল। দেখিতে দেখিতে সেই মাঠের চেহারা এমন বদলাইয়া গেল যে, তাহা চেনা ভার। খাল, পুকুর, রাস্তা, তাঁবু ইত্যাদিতে সে মাঠ নগরের মতো হইয়া গিয়াছে। তাহার ভিতরেই মিস্ত্রি, মজুর পাচক, বৈদ্য কিছুরই অভাব নাই। আটা, ঘি, ডাল, চাল, ঔষধ-পত্র, কাঠ, কয়লা ইত্যাদি কোনো দরকারী জিনিসেরই ত্রুটি দেখা যায় না।

আর অস্ত্রের কথা কী বলিব! মানুষের বুদ্ধিতে মানুষকে মারিবার যত রকম উৎকট উপায় হইতে পারে, সকলই প্রস্তুত। রাশি রাশি তোমর (লোহার কাঁটা-পরানো ডাণ্ডা) আছে; ইহার ঘায় হাড় গুঁড়া এবং বুক ফোঁড়া একসঙ্গেই সব হইতে পারে। ভালোমতো এপিঠ ওপিঠ করিয়া ফুঁড়িতে হইলে, তাহার জন্য শক্তির (লোহার বল্লমের) আয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। পাশ (ফাঁস) আছে আঁটি-আঁটি। এ জিনিস শত্রুর গলায় লাগাইয়া টানিলে—বুঝিতেই পার। আর যদি শত্রুর চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে কাবু করিতে হয়, তাহার জন্য অসংখ্য 'কচ-গ্রহ-বিক্ষেপ' (লম্বা লাঠির আগায় সাংঘাতিক আঠা) রহিয়াছে। কিংবা যদি আঁকশি লাগাইয়া তাহাকে টানিবার দরকার পরে, সে আঁকশিরও ঐ পর্বতাকার ঢিবি। এ অস্ত্রের নাম 'কর-গ্রহ-বিক্ষেপ'। বালি, তেল আর ঝোলাগুড়ের অন্ত নাই। এ সব জিনিস গরম করিয়া শত্রুর গায় ঢালিয়া দিতে হইবে ; তাহার জন্য এই বড় বড় হাতাও আছে। মুখ-বাঁধা ভারী ভারী হাঁড়ির ভিতরে ভয়ানক ভয়ানক সাপ। শত্রুর ভিড়ের মধ্যেই এই সকল হাঁড়ি ফেলিয়া দিতে পারিলে বেশ কাজ দেয়। ধূপ-ধুনা জ্বালাইয়া ফেলিতে পারিলেও মন্দ হয় না, তাহার ঢিবি পর্বতপ্রমাণ। কুল-কাঁটার মতোন বাঁকানো কাঁটা-পরানো ভয়ানক বল্লম, তার নাম 'অঙ্কুশ তোমর'। এ অস্ত্র শত্রুর পেটে বিঁধিয়া টানিলে পেটের ভিতরের জিনিস তখনি বাহির হইয়া আসে।

ইহা ছাড়া ঢাল, তলোয়ার, খাড়া, বর্শা, লাঠি, গদা, তীর, ধনুক প্রভৃতি সাধারণ অস্ত্র যে

কত আছে তাহার তো হিসাবই হয় না। দা, কুড়াল, খুন্তি, কোদাল, এমনকি লাঙ্গল পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

এ সকল অস্ত্র বোধহয় সাধারণ সৈন্যের জন্য। বড় বড় ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা এ সকল অস্ত্রের কোনো-কোনোটা যে ব্যবহার করিতেন না, এমন নহে। মোটের উপর তাঁহাদের যুদ্ধ-কৌশল ইহা অপেক্ষা অনেক উঁচুদরের। আর তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র যে অতি আশ্চর্য রকমের, তাহাও আমাদের দেখিতে বাকি নাই।

সকল আয়োজন শেষ হইলে দুর্যোধন জোড়হাতে ভীষ্মকে বলিলেন, 'হে পিতামহ, আপনি যুদ্ধবিদ্যায় শুক্রের সমান পণ্ডিত, আপনি আমাদের সেনাপতি হউন। আপনার পশ্চাতে আমরা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে যাইব।'

ভীষ্ম বলিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হউক। তোমাকে কথা দিয়াছি, সুতরাং তোমার হইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কিন্তু আমার কাছে তোমরাও যেমন, পাণ্ডবেরাও তেমনি। এইজন্য আমি কখনি তাহাদিগকে বধ করিতে পারিব না। তোমার অপর শত্রু রোজ হাজার হাজার মারিব।'

কর্ণের লম্বা-চওড়া কথা কহিবার অভ্যাস, সেজন্য তিনি ভীষ্মের নিকট অনেক বকুনি খান, কাজেই দু'জনের মধ্যে একটু চটাচটি আছে। তাহার উপর আবার দুর্যোধনের দলের রথী এবং মহারথীদিগের নাম করিতে গিয়া ভীষ্ম কর্ণকে অর্ধরথ (অর্থাৎ, আধখানা রথী) বলাতে এই বিরোধ আরো বাড়িয়া গেল।

শেষে ভীষ্ম বলিলেন, 'কর্ণ আমার সঙ্গে বড়ই রেষারেষি করে, আমি তাহার সঙ্গে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে পারিব না।' তাহাতে কর্ণ বলিলেন, 'আমি ভীষ্ম থাকিতে এ যুদ্ধে হাত দিতেছি না। উনি মারা যাউন, তারপর আমি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব।'

এইরূপে দুর্যোধনের পক্ষে ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়া, অন্য যোদ্ধারা তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পাণ্ডবদিগের পক্ষে দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখন্ডী ও জরাসন্ধের পুত্র সহদেব এই সাতজনকে সেনাপতি করা হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন হইলেন প্রধান সেনাপতি। ইহাদের আবার পরিচালক হইলেন অর্জুন। এমন সময়ে দুর্যোধন একদিন উলুক নামক এক দূতকে বলিলেন, 'তুমি পাণ্ডবদিগকে আর কৃষ্ণকে খুব করিয়া গালি দিয়া আইস।'

কিরূপ গালি দিতে হইবে তাহাও দুর্যোধন অবশ্য বলিয়া দিলেন। তত কথা লিখিবার স্থান নাই। আর থাকিলেই বা তাহা লিখিয়া দরকার কী? ভালো কথা হইলে, তবে না হয় লিখিতাম। দুর্যোধনের হুকুম পাওয়ামাত্র উলুক পাণ্ডবদিগের নিকট গিয়া তাঁহার কথাগুলি অবিকল মুখস্থ বলিয়া দিল।

এই সকল গালির উত্তরে পাণ্ডবরা বলিলেন, 'উলুক, দুর্যোধনকে বলিবে যে, তাঁহার উচিত সাজা পাওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর বেশি বিলম্ব নাই।'

উলুক চলিয়া গেলে পাণ্ডবেরা সৈন্য ভাগ করিয়া গুছাইতে লাগিলেন। বড় বড় সেনাপতিগণ কে কোন দলের কর্তা হইবেন, এ সকল ঠিক করাই সকলের প্রথম কাজ। এই কাজ শেষ হইয়া গেলে আর আয়োজনের কিছুই বাকি রহিল না, এখন শত্রু আসিলেই হয়।

দুর্যোধনের দলেও অবশ্য এইরূপ অয়োজন চলিতেছিল। দুই পক্ষের যোদ্ধাদিগের কে কেমন বীর, ভীষ্ম দুর্যোধনকে তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, 'তোমার জন্য আমি

পাণ্ডবদিগের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ হউন আর অর্জুনই হউন, কাহাকেও আমি সহজে ছাড়িব না। উহাদের মধ্যে কেবল শিখণ্ডীর গায় আমি অস্ত্রাঘাত করিতে প্রস্তুত নহি, আর সকলের সহিতই যুদ্ধ করিব।'

একথায় দুর্যোধন আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন? শিখণ্ডীর গায় আপনি যে অস্ত্রাঘাত করিবেন না, তাহার কারণ কী?

ভীষ্ম বলিলেন, 'স্ত্রীলোকের গায় হাত তুলিতে নাই, তাই মারিব না।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'শিখণ্ডী তো দ্রুপদের পুত্র। সে স্ত্রীলোক হইল কিরূপে?'

ভীষ্ম বলিলেন, 'শিখণ্ডীর কথা তবে বলি, শুন। আমার ভাই বিচিত্রবীর্যের সহিত বিবাহ দিবার জন্য আমি কাশী রাজার তিনটি কন্যাকে স্বয়ংবর সভা হইতে জোর করিয়া লইয়া আসি। উহাদের বড়টির নাম অম্বা। অম্বা বলিল, আমি মনে মনে শাল্বকে বিবাহ করিয়াছি। কাজেই আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া আর দুটি মেয়ের সহিত বিবাহ দিলাম।

অম্বা শাল্বের কাছে গেল, কিন্তু আমি তাহাকে জোর করিয়া আনায় অপমান বোধ করিয়া, আর হয়ত কতকটা আমার ভয়ে সে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। এরূপে সেই কন্যা নিতান্ত দুঃখে পড়িয়া ভাবিল, এখন কোথায় যাই—শাল্ব অপমান করিল, পিতার ঘরে গেলেও তাহারা আমাকে ঘৃণা করিবে। হায়! ভীষ্ম আমার এই দুঃখের কারণ, উহাকে শাস্তি দিতে পারিলে তবে আমার মন শান্ত হয়। এই মনে করিয়া সে কত দেশ যে ঘুরিল, আর কত মুনি-ঋষির নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিয়া যে কাঁদিল! শেষে আমার গুরু পরশুরাম তাহার প্রতি দয়া করিয়া আমায় শাসন করিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত আমার ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি আমাকে হারাইতে না পারিয়া অম্বাকে বলিলেন, 'আমি তো অনেক যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু ভীষ্ম আমাকে হারাইয়া দিল। আমার আর ক্ষমতা নাই, তুমি চলিয়া যাও।'

তারপর অম্বা অনেক তপস্যা করিয়া আমাকে মারিবার জন্য শিবের নিকট বর লাভ করে। সেই বরের জোরে এখন সে শিখণ্ডী হইয়া জন্মিয়াছে। আমি জানি, এ সেই অম্বা—এ পুরুষ নহে। কাজেই আমি ইহার গায় অস্ত্রাঘাত করিতে পারিব না।'

যুদ্ধের পূর্বে দুর্যোধন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দাদামহাশয়, আপনি 'একেলা যথাসাধ্য যুদ্ধ করিলে, কত সময়ের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সকল সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পারেন?'

ভীষ্ম বলিলেন, 'আমি ইচ্ছা করিলে এক মাসে পাণ্ডবদের সকল সৈন্য মারিতে পারি।'

এই কথা একে-একে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলে দ্রোণ বলিলেন, 'আমিও এক মাসে পারি।'

কৃপ বলিলেন, 'আমার দু'মাস সময় লাগে।'

অশ্বত্থামা বলিলেন, 'আমার দশদিন লাগে।'

কর্ণ বলিলেন, 'আমি পাঁচদিনেই উহাদের সকল সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পারি।'

কর্ণের কথা শুনিয়া ভীষ্ম হো হো শব্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'অর্জুনের সঙ্গে কিনা এখনো দেখা হয় নাই, তাই তুমি এমন কথা বলিতেছ।'

যুধিষ্ঠিরের চরেরা ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির এই সকল কথা শুনিয়া তাহা যুধিষ্ঠিরের নিকট বলাতে তিনি অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অর্জুন, তুমি কতক্ষণে কৌরবদিগের সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে পার?'

অর্জুন বলিলেন, ‘কৃষ্ণ সহায় থাকিলে, আমি এক নিমিষে সকল সৈন্য শেষ করিয়া দিতে পারি। শিব আমাকে পাশুপাত নামক সে অস্ত্র দিয়াছেন, তাহা আমার নিকট আছে। ইহা দিয়া তিনি প্রলয়ের সময় সকল সৃষ্টি নাশ করেন। অস্ত্রের সংকেত ভীষ্মও জানেন না, দ্রোণও জানেন না, কৃপ অশ্বত্থামা বা কর্ণও জানেন না। এসকল বড় বড় অস্ত্র সাধারণ যুদ্ধে ব্যবহার করিতে নাই। আমরা সাদাসিধা যুদ্ধ করিয়াই জয়লাভ করিব।’

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে দুর্যোধনের শিবির হইয়াছিল। যুদ্ধের দিনের নির্মল প্রভাতে তাঁহার লোকেরা স্নানান্তে মালা আর সাদা কাপড় পরিয়া অসীম উৎসাহভরে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মাঠের পূর্ব ভাগে পশ্চিমমুখ হইয়া যুধিষ্ঠিরের দলও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ; সহস্র সহস্র ঢাক আর অযুত শঙ্খ মহা ঘোর রবে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে।

ভীষ্মপর্ব

যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে এইরূপ নিয়ম হইল যে, —

যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলিয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়াছে, যে আশ্রয় চাহিতেছে, আর যে অন্যের সাহিত যুদ্ধে ব্যস্ত, এরূপ লোককে কেহ বধ করিবে না। যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময় দুই দলের লোকই বন্ধুর মতো ব্যবহার করিবে। গালির উত্তরে শুধু গালিই দিবে, অস্ত্রাঘাত করিবে না। যুদ্ধের স্থান হইতে কেহ বাহির হইয়া গেলে আর তাহাকে মারিবে না। রথী রথীর সহিত, হাতি হাতির সহিত, ঘোড়া ঘোড়ার সহিত, পদাতি পদাতির সাহিত—এইভাবে যুদ্ধ হইবে। মারিবার সময় বলিয়া মারিবে। অচেতন লোককে, আর সারথির সহিত অস্ত্রবাহক বাজনাদার ইহাদিগকে কখনো প্রহার করিবে না।

এই সময়ে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত জানিয়া ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিতে আসিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের তখন নিতান্তই দুঃখের অবস্থা। পুত্রগণের ব্যবহার আর যুদ্ধের ভীষণ ফলের কথা

ভাবিয়া আর তিনি কূল-কিনারা পাইতেছেন না। এমন সময় ব্যাসদেব আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'এ কাজটা ভালো হইতেছে না; তুমি ইহাদিগকে বারণ কর। রাজ্যের তোমার এতটা কী প্রয়োজন যে তাহার জন্য এত পাপ করিতে যাইতেছ? পাণ্ডবদের রাজ্য তাহাদের ফিরাইয়া দাও।'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'আমি তো যাহাতে ধর্ম হয় তাহাই চাই; কিন্তু উহারা যে আমার কথা শুনে না।'

ব্যাসদেব তখন বলিলেন, 'যাহা হইবার তাহা হইবেই; তুমি দুঃখ করিও না। যদি যুদ্ধ দেখিতে চাও, আমি তোমাকে চক্ষু দিতে পারি।'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'আত্মীয়গণের মৃত্যু আমি দেখিতে পারিব না। আপনার কৃপায় যুদ্ধের সকল সংবাদ যেন শুনিতে পাই।'

এ কথায় ব্যাস সঞ্জয়কে দেখাইয়া বলিলেন, 'তোমার এই সঞ্জয়ের নিকট তুমি সকল কথা শুনিতে পাইবে। আমার বরে যুদ্ধের কোনো সংবাদই ইহার অজানা থাকিবে না। দেখা হউক, অদেখা হউক, সকল ঘটনাই, এমনকি লোকের মনের কথা পর্যন্ত সে জানিতে পারিয়া তোমাকে শুনাইবে। যুদ্ধের ভিতর গিয়াও সে সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিবে, অস্ত্রে তাহার কোনো অনিষ্ট হইবে না।'

এইরূপ কথাবার্তার খানিক পরে ব্যাসদেব সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে পাণ্ডব ও কৌরবদিগের সৈন্যসকল যুদ্ধক্ষেত্রে সামনা-সামনি ব্যূহ বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই।

'ব্যূহ' বাঁধা কাহাকে বলে জান? সৈন্যরা তো যুদ্ধের সময় তাহাদের ইচ্ছামতো এলোমেলোভাবে দাঁড়াইতে পায় না। তাহাদিগকে কোনো একটা বিশেষ নিয়মে বেশ জমাটরূপে গুছাইয়া দাঁড় করাইতে হয়। এইরূপ কায়দা করিয়া দাঁড়ানোর নাম 'ব্যূহ'। এক-এক রকম নাম, যেমন 'চক্র ব্যূহ' 'গরুড় ব্যূহ' ইত্যাদি।

পাণ্ডবদিগের ব্যূহ দেখিয়া দুর্যোধন দ্রোণকে বলিলেন, 'গুরুদেব, দেখুন পাণ্ডবদের কত সৈন্য! ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদের ব্যূহ নির্মাণ করিয়াছে। উহাদের দলে খুব বড় বড় বীর আছে। তেমনি আমাদেরও তাহার চেয়ে বেশি আছে। তাহা ছাড়া আমাদের সৈন্য ঢের, উহাদের সৈন্য কম। আমাদের ব্যূহের মাঝখানে ভীষ্ম রহিয়াছেন, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যূহে ঢুকিবার পথে পথে আপনারা সকলে আছেন।'

একথা শুনিয়া ভীষ্ম সিংহনাদপূর্বক তাঁহার শঙ্খে ফুঁ দিলেন। সেই শঙ্খের সঙ্গে সঙ্গে হাজার শঙ্খ, শিঙ্গা, ঢাক প্রভৃতি বাজিয়া রণস্থলে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল।

ইহার উত্তরে পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইতে কৃষ্ণের 'পাঞ্চজন্য', অর্জুনের 'দেবদত্ত', ভীমের 'পৌণ্ড্র', যুধিষ্ঠিরের 'অনন্তবিজয়', নকুলের 'সুঘোষ' আর সহদেবের 'মণিপুষ্পক' নামক মহা শঙ্খের ভয়ানক শব্দের সহিত, দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতি সকলের শঙ্খের শব্দ মিলিয়া আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া কৌরবদিগের আতঙ্ক জন্মাইয়া দিল।

তখন অর্জুন গাণ্ডীব হাতে করিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, 'একবার দুই দলের মাঝখানে রথ লইয়া চলুন, কে কে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া লই।'

এ কথায় কৃষ্ণ দুই দলের মাঝখানে রথ লইয়া গেলে অর্জুন দেখিলেন যে, জ্যেঠা খুড়া মামা

ভাই ভ্রাতুষ্পুত্র বন্ধু প্রভৃতি যত ভক্তি মান্য স্নেহ এবং ভালোবাসার পাত্র, সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। রাজ্যের জন্য সকলেই কাটাকাটি করিয়া প্রাণ দিতে আসিয়াছে। ইহা দেখিয়া দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিলে। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণকে বলিলেন, 'হায়! আমি কাহাকে মারিয়া রাজ্য লইতে আসিয়াছি? এমন রাজ্য পাইয়া ফল কী? এইরূপ ভয়ানক পাপ করার চেয়ে শত্রুর হাতে মারা যাওয়াও তো ভালো!'

এই বলিয়া তিনি গাণ্ডীব ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সেদিন কৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে না থাকিলে আর কি অর্জুনের যুদ্ধ করা হইত? তাঁহার মনের দুঃখ দূর করিয়া তাঁহার দ্বারা যুদ্ধ করাইতে কৃষ্ণকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দেন, তাহাতে 'ভগবদগীতা' নামক অমূল্য পুস্তকই হইয়া গিয়াছে। বড় হইয়া তোমরা তাহা পড়িবে। যাহা হউক, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের মন শান্ত হওয়াতে, আবার তাঁহার যুদ্ধে উৎসাহ আসিল।

এমন সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির বর্ম আর অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক রথ হইতে নামিয়া কীসের জন্য ভীষ্মের রথের দিকে হাঁটিয়া চলিয়াছেন? তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব আর অন্যান্য বীরেরাও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু ইহাদের কেহই যুধিষ্ঠিরের কার্যের অর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না। ভীম অর্জুন নকুল আর সহদেব বলিলেন, 'দাদা, যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এমন সময় আপনি আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়াছেন?'

যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন; কিন্তু কথা বলিলেন না। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'উনি যুদ্ধারম্ভের পূর্বে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য প্রভৃতি গুরুজনদিগকে প্রণাম করিতে চলিয়াছেন। ইহাতে উঁহার জয়লাভ হইবে।'

এদিকে কৌরব-পক্ষের লোকেরাও যুধিষ্ঠিরকে এরূপ করিতে দেখিয়া নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলিল, 'কাপুরুষ! ভয় পাইয়াছে!' কেহ বলিল, 'তাই ভীষ্মের পায়ে ধরিতে চলিয়াছে!' কেহ বলিল, 'এমন সব ভাই থাকিতে এত ভয়! ছি!'

যাহা হউক, যুধিষ্ঠির ততক্ষণে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পায় ধরিয়া বলিলেন, 'দাদামশায়, আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, অনুমতি দিন আর আশীর্বাদ করুন।'

ভীষ্ম বলিলেন, 'আশীর্বাদ করি ভাই, তোমার জয় হোক! তুমি না আসিলে হয়ত আমার রাগ থাকিত, কিন্তু তুমি আসিতে বড়ই খুশি হইলাম। বল, তোমার আর কী চাই? ভাই, মানুষ টাকার দাস। দুর্যোধনের টাকায় আমি আটকা পড়িয়াছি, কাজেই তোমার হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিব না। আর যাহা চাও, তাহাই দিব।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আপনাকে কী করিয়া পরাজয় করিব, দয়া করিয়া তাহা বলিয়া দিন।'

ভীষ্ম বলিলেন, 'আমাকে পরাজয় করার সাধ্য কাহারও নাই, আর এখন আমার মরিবার সময়ও উপস্থিত হয় নাই। তুমি আবার আমার নিকট আসিও।'

তখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া দ্রোণের নিকট গেলেন। দ্রোণের সহিতও তাঁহার ঐরূপ কথাবার্তা হইল। তাঁহাকে পরাজয় করিবার উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দ্রোণ বলিলেন, 'আমি বাঁচিয়া থাকিতে আমাকে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না। আমাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা কর। সত্যবাদী লোকের মুখে নিতান্ত অপ্রিয় সংবাদ শুনিলেই আমি অস্ত্র ছাড়িয়া দিব। এমনি সময়ে আমাকে মারিবার সুযোগ।'

সেখান হইতে যুধিষ্ঠির কৃপের নিকট গেলেন। সেখানেও ঐরূপই কথাবার্তা হইল। কৃপ বলিলেন, 'আমি অমর, কাজেই আমাকে মারা সম্ভব হইবে না। কিন্তু তথাপি নিশ্চয় তোমার জয় হইবে। আমি সর্বদা তোমাকে আশীর্বাদ করিব।'

কৃপের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির শল্যের নিকট গেলেন, এবং যুদ্ধের সময় কর্ণের তেজ কমাইয়া দিবার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। শল্য বলিলেন, 'আমি তাহা নিশ্চয় করিব। নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, তোমার জয় অবশ্য হইবে।'

ইহার মধ্যে কৃষ্ণ কর্ণকে বলিলেন, 'কর্ণ, ভীষ্ম থাকিতে তো তুমি আর ও-পক্ষে যুদ্ধ করিতেছ না, ততদিন আমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ কর না কেন?' এ কথার উত্তরে কর্ণ বলিলেন, 'আমি কিছুতেই দুর্যোধনের অনিষ্ট করিতে পারিব না।'

ফিরিয়া আসিবার সময় যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে কৌরবদিগকে বলিলেন, এখানে যদি আমার বন্ধু কেহ থাকেন, তবে তিনি আসুন; আমরা পরম আদরে তাঁহাকে আমাদের দলে লইব।'

একথায় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র যুযুৎসু আহ্লাদের সাহিত বলিলেন, 'মহারাজ, আমি আপনার হইয়া যুদ্ধ করিব।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'এস ভাই, তুমি আমাদের হইলে।'

তারপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সে যে কী ভয়ানক যুদ্ধ তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। সে যুদ্ধে বৃষ্টির ধারার ন্যায় ক্রমাগত বাণ পড়িয়াছিল। ঝড়ের সময় যেমন গাছের ফল পড়ে, সেইরূপ করিয়া লোকের মাথা পড়িয়াছিল, কাটা মানুষের পাহাড় হইতে রক্তের নদী বহিয়া চলিয়াছিল। তখনকার ভয়ানক শব্দের কথা আর কী বলিব! তেমন শব্দ আর কখনো হয় নাই।

সে সময়ে ভীষ্ম দ্রোণ অর্জুন ভীম প্রভৃতি বড় বড় যোদ্ধাদের বীরত্ব ও ক্ষমতা দেখিয়া দেবতারা পর্যন্ত আশ্চর্য হইয়া যান। অনেকবারই তাঁহাদিগকে এ-কথা মানিতে হইয়াছে যে, 'এমন অদ্ভুত কাজ আমরাও করিতে পারি কি না সন্দেহ।' ইঁহাদের এক-একজন যখন রাগিয়া দাঁড়াইতেন, তখন শত-শত যোদ্ধা মিলিয়াও তাঁহাকে আটকাইতে পারেন নাই। হাজার হাজার লোক মারিয়া তবে তাঁহারা থামিয়াছেন। ভীষ্ম দ্রোণ বা অর্জুনের এক এক বাণে অথবা ভীমের এক এক গদাঘাতে এক-একটা হাতি তৎক্ষণাৎ মারা যাইতে ক্রমাগতই দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডবদের পুত্ররাই* কি কম যুদ্ধ করিয়াছিলেন! অভিমন্যুর যুদ্ধ দেখিয়া ভীষ্ম প্রভৃতিরা বার বার বলিয়াছিলেন, 'ঠিক যেন অর্জুন!' ভীষ্মের সহিত তাঁহার খুবই যুদ্ধ হয়। তখন ভীষ্ম অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার কিছু করিতে পারেন নাই। অভিমন্যু তাঁহার সমুদয় বাণ কাটিয়া রথের ধ্বজা উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

আহা! উত্তরের কথা মনে করিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়! বেচারা সেদিন ভালো করিয়া যুদ্ধ করিতে-না-করিতেই শল্যের হাতে মারা গেলেন। তিনি এক প্রকাণ্ড হাতিতে চড়িয়া শল্যকে আক্রমণ করেন। হাতি শল্যের রথের ঘোড়াগুলিকে মারিয়া ফেলিল। কিন্তু শল্য তাহার পরেই উত্তরকে এমন ভয়ঙ্কর একটা শক্তি ছুড়িয়া মারিলেন যে, তাঁহার বর্ম ভেদ করিয়া একেবারে তাঁহার দেহের ভিতর ঢুকিয়া গেল। সেই শক্তির ঘায়ে উত্তর হাতে হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

---

* দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম প্রতিবিন্ধ্য, সুতসেন, শ্রুতকর্মা, শতানীক, শ্রুতসেন। সুভদ্রার এক পুত্র, তাঁহার নাম অভিমন্যু।

উত্তরের দাদা শ্বেত ইহাতে অসহ্য শোক পাইয়া রাগের সহিত কৌরবদিগকে আক্রমণ করেন। খানিক যুদ্ধের পর একটা ভয়ানক বাণের ঘায় তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলে তাঁহার সারথি তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করে। কিন্তু অল্পক্ষণের ভিতরেই তিনি আবার আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এবার তিনি শল্যকে এমনি তেজের সহিত আক্রমণ করিলেন যে, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরেরা আসিয়া সাহায্য না করিলে শল্যের প্রাণরক্ষা করাই কঠিন হইত। ভীষ্মের দল আসাতে শল্যও বাঁচিয়া গেলেন, আর যুদ্ধও আবার ঘোরতর হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধে ভীষ্ম কত লোককে যে মারিলেন তাহার সংখ্যা নাই।

শ্বেতও সেই সময়ে অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। সৈন্যরা তাঁহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষ্মের নিকট গিয়া আশ্রয় লয়। ভীষ্ম ছাড়া আর কেহই শ্বেতের সম্মুখে স্থির থাকিতে পারেন নাই। এমনকি ভীষ্মও এক-এক বার শ্বেতের হাতে রীতিমতো জব্দ হইতে লাগিলেন। একবার তো সকলে মনে করিল, বুঝি শ্বেতের হাতে তাঁহার মৃত্যুই হয়।

তখনি ভীষ্ম যারপরনাই রাগের সহিত শ্বেতকে অনেকগুলি বাণ মারিলেন। শ্বেতও তাহা সব আটকাইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম অমনি আর এক ধনুক লইয়া শ্বেতের রথের ঘোড়া ধ্বজ আর সারথিকে মারিয়া ফেলিলেন, কাজেই তাঁহাকে রথ হইতে লাফাইয়া পড়িতে হইল। তখন তিনি ধনুক রাখিয়া ভীষ্মকে একটা ভয়ানক শক্তি ছুড়িয়া মারেন, কিন্তু তাহা ভীষ্মের বাণে খণ্ড-খণ্ড হইয়া যায়। শক্তি বৃথা হওয়ায় শ্বেত গদা লইয়া যেই ভীষ্মের উপরে তাহা ছুড়িতে যাইবেন, অমনি ভীষ্ম তাহা এড়াইবার জন্য রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। সে গদা রথের উপর পড়িবামাত্র রথ, ঘোড়া, সারথি কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

এদিকে দ্রোণ কৃপ শল্য প্রভৃতি যোদ্ধারা ভীষ্মের সাহায্যের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ভীষ্মের নূতন রথ আসিয়াছে। শ্বেতের পক্ষেও সাত্যকি ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং কিছুকাল সকলে মিলিয়া আবার যুদ্ধ চলিল। এমন সময় ভীষ্ম কী যে এক সাংঘাতিক বাণ ছুড়িয়া বসিলেন, শ্বেতের তাহা বারণ করিবার ক্ষমতাই হইল না। সে বাণ তাঁহার বর্ম ও শরীর ভেদ করিয়া মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেল।

শ্বেতের মৃত্যুর পর সেদিন আর পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে উৎসাহ রহিল না। এদিকে ভীষ্ম শ্বেতকে মারিয়া এতই তেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, মনে হইল বুঝি তিনি সকলকে মারিয়া শেষ করেন। তখন সন্ধ্যাও হইয়াছিল, কাজেই যুধিষ্ঠির সেদিনের মতোন যুদ্ধ শেষ করিয়া দিয়া দুঃখের সহিত শিবিরে ফিরিলেন।

সে রাত্রিতে যুধিষ্ঠিরের মনে বড় চিন্তা হইতে লাগিলেন। তিনি সকলকে বলিলেন, 'এমনভাবে বন্ধুবান্ধব মরিতে দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে। কাল হইতে তোমরা আরো ভালো করিয়া যুদ্ধ কর।'

যুধিষ্ঠিরের চিন্তা দেখিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা শান্ত হওয়ায়, পরদিন যুদ্ধের পরামর্শ আরম্ভ হইল। তখন যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, 'এবারে ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ করিয়া আমাদের সৈন্য সাজাইব।'

পরদিন ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহ করিয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য সাজানো হইল। কৌরবেরাও তাঁহাদের সৈন্য দিয়া অন্যরূপ ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। সেইদিনকার যুদ্ধও নিতান্ত ভয়ানক হইয়াছিল।

সেদিন অর্জুনের যুদ্ধে কৌরবেরা বড়ই অস্থির হইয়া উঠে। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন ভীষ্মকে

বলিলেন, 'দাদামহাশয়, আপনারা থাকিতে কি অর্জুন সব সৈন্য মারিয়া শেষ করিবে? একটু ভালো করিয়া যুদ্ধ করুন।'

তখন অর্জুন আর ভীষ্মের এমনি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল যে, তেমন যুদ্ধ আর হয় নাই। সে যুদ্ধ দেখিয়া অন্য সকলেরও উৎসাহ বাড়িয়া যাওয়াতে তাহারা পাগলের মতো হইয়া কাটাকাটি আরম্ভ করিল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রোণেরও সেদিন কম যুদ্ধ হয় নাই। যুদ্ধ করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি, ঘোড়া আর ধনুক কাটা গেল। তখন তিনি ভাবিলেন যে, গদা লইয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিবেন কিন্তু রথ হইতে নামিবার পূর্বেই দ্রোণ সেই মহা গদা কাটিয়া খণ্ড-খণ্ড করিলেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল তলোয়ার লইয়া দ্রোণকে মারিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার বাণের মুখে অগ্রসর হয় কাহার সাধ্য! ধৃষ্টদ্যুম্ন ঢাল দিয়া বাণ ফিরাইতে ব্যস্ত রহিলেন, তাঁহার আর যুদ্ধ করা হইল না।

এই সময় ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নের সাহায্য করিতে আসিয়া কী অদ্ভুত কাণ্ডই দেখাইলেন! কলিঙ্গ আর তাঁহার পুত্র শক্রদেব কিছুকাল তাঁহার সহিত খুব যুদ্ধ করিতেছিলেন। এমনকি তাঁহাদের ভয়ে তাঁহার সঙ্গের চেদীদেশীয় সৈন্যগুলি তাঁহাদের ফেলিয়া পলায়ন করিতেও ত্রুটি করে নাই। শক্রদেব ভীমের ঘোড়া অবধি মারিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহার পরেই ভীম এমন এক গদা ছুড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে শক্রদেব আর তাঁহার সারথির শরীর চূর্ণ হইয়া গেল।

তারপর ভানুমানের সহিত ভীমের যুদ্ধ হয়। ভানুমান ছিলেন হাতির উপরে, আর ভীম মাটির উপরে। ভীম খড়গ হাতে এক লাফে সেই হাতির উপরে উঠিয়া, ভানুমান এবং হাতি উভয়কেই কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর ভীম হাতি ঘোড়া যাহা সম্মুখে পান তাহাই খড়গ দিয়া খণ্ড-খণ্ড করেন। লাথির চোটে কত মানুষ পুঁতিয়া গেল। হাঁটুর গুঁতায় কত যোদ্ধা ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। এ সকল কাণ্ড দেখিয়া কে কোথায় পালাইবে তাহা ঠিক করিতে পারিল না।

তারপর ভীম কলিঙ্গ আর কেতুমানকে মারিয়া, দুই হাজার সাত শত কলিঙ্গ-সেনা বধ করিলেন।

আর একস্থানে দুর্যোধন অনেক যোদ্ধা লইয়া অভিমন্যুকে ঘিরিয়াছেন। অভিমন্যুর তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। কিন্তু অর্জুন যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রকে দুরাত্মারা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, তখন আর তিনি তাঁহার কাছে না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। এদিকে ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বড় বড় বীরেরা অর্জুনকে আটকাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। তখন অর্জুন এমনি ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাকে আটকানো দূরে থাকুক, উঁহাদের নিজেদের প্রাণ বাঁচানোই ভার হইল। চারিদিকে খালি যোদ্ধাদের মাথা কাটিয়া পড়িতেছে, ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া ভীষ্ম তাড়াতাড়ি দ্রোণাচার্যকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ঐ দেখ, অর্জুন কী আরম্ভ করিয়াছে! আজ উহার সঙ্গে পারা যাইবে না। বেলাও শেষ হইয়াছে, শীঘ্র যুদ্ধ থামাইয়া দাও।'

কাজেই তখন যুদ্ধশেষের শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল; কৌরব সৈন্যরাও বলিল, 'আঃ, বাঁচিলাম!'

পরদিন কৌরবেরা 'গরুড়' ও পাণ্ডবেরা 'অর্ধচন্দ্র' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজাইলেন। সেদিন ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ভীম, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব প্রভৃতি সকলেই খুব যুদ্ধ করেন। যুধিষ্ঠির আর ধৃষ্টদ্যুম্ন এমনই যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, ভীষ্ম আর দ্রোণ দু-জনে মিলিয়াও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারেন নাই। কৌরব সৈন্যেরা ভীষ্ম-

দ্রোণের কথা না শুনিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখেই পালাইতে লাগিল।

ইহা দেখিয়া দুর্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন, 'সৈন্য সব মারা যাইতেছে, আর আপনারা চুপ করিয়া আছেন! তাহাতে বোধ হয় পাণ্ডবদের উপকার করাই আপনাদের উদ্দেশ্য। এমন জানিলে আমি কখনি যুদ্ধ করিতে আসিতাম না।'

এ কথায় ভীষ্ম বলিলেন, 'পাণ্ডবেরা যে কত বড় বীর, তাহা তোমাকে বার বার বলিয়াছি। আমি বুড়া মানুষ, তথাপি আমার যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি, দেখ।'

এই বলিয়া ভীষ্ম ক্রোধভরে এমনই যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, কাহার সাধ্য তাঁহার সামনে দাঁড়ায়! চারিদিকে কেবল 'হায় হায়', 'রক্ষা কর', 'বাবা গো' এইরূপ শব্দ। পাণ্ডবপক্ষের এক-এক যোদ্ধার নাম করিয়া তিনি বলিলেন, 'এই তোমাকে কাটিলাম', আর অমনি তাহার মাথা কাটিয়া পড়ে। সেই বুড়া মানুষ তখন এমনি বেগের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন যে, তাঁহার বাণই কেবল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, 'অর্জুন, এই তো সময়! তুমি যে বলিয়াছিলে ভীষ্ম দ্রোণ সকলকে মারিবে ; এখন তোমার কথা রাখ।' অর্জুন বলিলেন, 'ভীষ্মের নিকট রথ লইয়া চলুন।'

কিন্তু অর্জুন অনেক যুদ্ধ করিয়াও ভীষ্মকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। বুড়া বাণে বাণে কৃষ্ণ-অর্জুনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন তিনি যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু ভীষ্মের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, চুপ করিয়া থাকিলে বুঝি বা তিনিই এখন পাণ্ডবদিগের সকলকে মারিয়া শেষ করেন। কাজেই তিনি রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, 'আজই আমি কৌরবদিগের সকলকে মারিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিব।'

এই বলিয়া তিনি তাঁহার সেই সুদর্শন চক্র নামক আশ্চর্য অস্ত্র হাতে ভীষ্মকে মারিবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। তিনি কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, 'তুমি সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, তোমার হাতে মরিলে তো আমি অমনি স্বর্গে যাইব! এখনি আমাকে কাট!'

এমন সময় অর্জুন নিতান্ত লজ্জিত ও কাতরভাবে আসিয়া কৃষ্ণের পায় ধরিয়া বলিলেন, 'আপনি শান্ত হউন, আমি আর যুদ্ধে অবহেলা করিব না।' এ কথায় কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া আবার আসিয়া ঘোড়ার রাশ হাতে লইলেন। ইহার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্জুন কী ভীষণ যুদ্ধ করিলেন তাহা আর কী বলিব! তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অদ্ভুত ইন্দ্র-অস্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য বাণ উল্কাধারার ন্যায় অবিরাম ছুটিয়া গিয়া কৌরবদিগকে ধানের মতো কাটিতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা, বাহ্লীক প্রভৃতি সকলে হারিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া কৌরব সৈন্যেরা সেই যে রণস্থল হইতে চেঁচাইয়া ছুট, শিবিরের ভিতর না গিয়া আর থামিল না।

পরদিন আবার মহারণ আরম্ভ হইল। প্রথমে ভীষ্ম অর্জুন আর অভিমন্যু প্রভৃতি ঘোর যুদ্ধ করেন। তারপর ধৃষ্টদ্যুম্ন কিছুকাল সংযমুনির পুত্রের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়া, গদাঘাতে তাঁহার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন।

কিন্তু সেদিনকার যুদ্ধে বাস্তবিকই ভয়ানক কাণ্ড যদি কেহ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ভীম। ভীম গদাঘাতে হাতি ঘোড়া রথী পদাতি সকলকে পিষিতে আরম্ভ করিলে দুর্যোধন তাঁহাকে মারিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দেন। সে সকল সৈন্য মারা গেলে কিছুকাল ভীম আর সাত্যকির সহিত অলম্বুষের যুদ্ধ চলে। তারপর দুর্যোধনের সহিত ভীমের দেখা হয়। দুর্যোধন

একবার বাণাঘাতে ভীমকে অজ্ঞান করিয়া দেন। ভীম অবিলম্বে আবার উঠিয়া দুর্যোধনকে মারেন আট বাণ, শল্যকে পঁচিশ। শল্য বেগতিক দেখিয়া তখনি পলায়ন করিলেন।

তখন সোনানী, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, আলোপুর, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট এবং যম নামক দুর্যোধনের চৌদ্দ ভাই একসঙ্গে আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করেন। তিনি তাঁহাদিগকে হাতের কাছে পাইয়া মনের সুখে এক-একটি করিয়া সংহার করিতে লাগিলেন। প্রথমে সোনানী, তারপর জলসন্ধ, তারপর সুষেণ, তারপর উগ্র, বীরবাহু, ভীমরথ ও সুলোচন—দেখিতে দেখিতে সাতটি প্রাণ গেল। ইহার পর আর বাকি সাতটির ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন ভিন্ন উপায় রহিল না।

এ সকল কাণ্ড দেখিয়া ভীষ্ম কৌরবদিগকে বহিলেন, 'ঐ দেখ, ভীম বোকাগুলিকে পাইয়া একেবারে শেষ করিলেন, তোমরা শীঘ্র যাও!'

সে কথায় ভগদত্ত ভীমকে আক্রমণ করিয়া খানিক যুদ্ধের পর একবার তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। ভীম অজ্ঞান হওয়ামাত্রই বিশাল বিশাল হাতির উপরে অগণ্য রাক্ষস লইয়া ঘোর বেগে ঘটোৎকচ আসিয়া উপস্থিত। তখন ভগদত্তকে বাঁচানো কঠিন হইল। ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ভীষ্ম তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করিয়া সেদিনকার মতোন কৌরবদিগকে ঘটোৎকচের হাত হইতে রক্ষা করিলেন।

পরদিন প্রভাতে কৌরবেরা 'মকর' ব্যূহ ও পাণ্ডবেরা 'শ্যেন' ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে ভীমার্জুন আর ভীষ্মের যুদ্ধ হইল, তারপর দ্রোণ আর সাত্যকির। সাত্যকি দ্রোণের হাতে একটু জব্দ হইয়া আসিলে ভীম দ্রোণকে অনেক বাণ মারিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেন। ইহাতে ভীষ্ম দ্রোণ শল্য রোষভরে ভীমকে আক্রমণ করায়, অভিমন্যু দ্রৌপদীর পুত্রগণসহ ভীমের সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এমন সময় শিখণ্ডী ধনুর্বাণ হাতে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ভীষ্ম তো তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। শিখণ্ডী যতই বাণ মারেন, ভীষ্মের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ততক্ষণে দ্রোণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় শিখণ্ডীকে পলায়ন করিতে হইল।

তারপর সকলে যুদ্ধে মাতিয়া রণস্থলে ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত করিলেন। বেলা যায়, তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। সেদিন সাত্যকি দুর্যোধনের অনেক সৈন্য মারেন। দুর্যোধন দশ হাজার সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে থামাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই দশ হাজার সৈন্যও তাঁহার হাতে মারা গেল।

সেই সময় ভূরিশ্রবা আসিয়া সাত্যকিকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করাতে তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করল। সাত্যকির দশ পুত্র তাঁহার সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু ভূরিশ্রবার বজ্রসম বাণের আঘাতে দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ চূর্ণ হইয়া গেল। তারপর বেলা আর আতি অল্পই অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু এই সল্প সময়ের মধ্যেই অর্জুন পঁচিশ হাজার মহারথী মারিয়া শেষ করিলেন। এইরূপে সেদিনকার যুদ্ধ শেষ হইল।

পরদিন পাণ্ডবদের 'মকর' ব্যূহ এবং কৌরবদের 'ক্রৌঞ্চ' ব্যূহ করিয়া সৈন্য সাজানো হইল। সেদিনের যুদ্ধে ভীম এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের যে বীরত্ব দেখা গিয়াছিল তাহার তুলনা দুর্লভ। ভীমকে দেখিতে পাইয়াই দুঃশাসন তাঁহার আর বারটি ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এস ভাইসকল, আজ ইহাদের মারিব।'

তখন হাজার হাজার রথী লইয়া তের ভাই ভীমকে আক্রমণ করিলেন। ভীমের তাহা গ্রাহ্যই হইল না। তিনি ভবিলেন, আগে রথীগুলিকে শেষ করিয়া লই। তারপর তিনি গদা হাতে রথ হইতে নামিয়া একদিক হইতে কৌরব সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া ভীমের শূন্য রথখানি দেখিয়া ব্যস্তভাবে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হায় হায়! শূন্য রথ কেন? ভীম কোথায়?'

সারথি বলিল, 'তিনি কৌরব সৈন্য মারিবার জন্য গদা হাতে নামিয়া গিয়াছেন।'

ভীম যে পথে গিয়াছেন, গদার ঘায়ে ক্রমাগত হাতি মারিয়া গিয়াছেন। সেই হাতিগুলি দেখিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। ভীম তখন ছোট ছোট সৈন্য শেষ করিয়া রাজা মারিতে ব্যস্ত। অতঃপর তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে দুর্যোধনের কতকগুলি ভাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্মোহন অস্ত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে অজ্ঞান করিয়া ফেলাতে বেচারারা যুদ্ধ করিতে পাইল না। ইহার পর দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তোলেন। পাণ্ডবগণ কিছুতেই তখন তাঁহাকে বারণ করিতে পারেন নাই। তারপর ভীষ্ম আর অর্জুনের কিছুকাল ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এইরূপে সমস্ত দিনই নানা স্থানে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কোনো বিশেষ ঘটনা সেদিন ঘটে নাই।

সেদিনকার যুদ্ধ শেষ হইলে, যুধিষ্ঠির ভীম আর ধৃষ্টদ্যুম্নকে আদর করিয়া মনের সুখে শিবিরে গেলেন।

পরদিন কৌরবদিগের হইল 'মণ্ডপ' ব্যূহ আর পাণ্ডবদের 'বজ্র' ব্যূহ। সেদিন প্রথম বেলায় বিরাটের পুত্র শঙ্খ দ্রোণের হাতে মারা যান।

সাত্যকি আর অলম্বুষে সেদিন খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। অলম্বুষ রাক্ষস, ঘোর মায়াবী ; তাই সে আগে মায়া দ্বারা সাত্যকিকে ভুলাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইন্দ্র-অস্ত্র দিয়া তিনি রাক্ষসের সকল মায়া উড়াইয়া দিলেন। তখন সে পালাইতে পারিলে বাঁচে।

অর্জুনের পুত্র ইরাবান বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ঘটোৎকচ ভগদত্তকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু ভগদত্ত অসাধারণ যোদ্ধা, তাঁহার যুদ্ধ কেহ সহিতে পারে নাই। ঘটোৎকচ কিছুকাল তাঁহার সঙ্গে তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

শল্য সেদিন নকুল ও সহদেবকে আক্রমণ করিতে গিয়া একটু জব্দ হন। মেঘ যেমন সূর্যকে ঢাকে, সহদেবও তেমনি করিয়া বাণের দ্বারা শল্যকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। শল্য সহদেবের মামা ; কাজেই তাঁহার বাণে আচ্ছন্ন হইয়াও তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। খানিক বেশ জোরের সহিত যুদ্ধ চলিয়াছিল। তারপর সহদেবের এক বাণ খাইয়া শল্য আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সারথি দেখিল মদ্ররাজ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং সে রথ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা দুই প্রহরের সময় শ্রুতায়ু যুধিষ্ঠিরের বাণ খাইয়া পলায়ন করেন। ভীষ্ম দ্রোণ আর অর্জুনও সেদিন বহু সৈন্য বধ করেন। তারপর ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সেদিনকার যুদ্ধও থামিল।

পরদিন প্রাতে কৌরবেরা সাগরের মতো ভয়ানক এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। তাহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, 'তুমি "শৃঙ্গাটক" ব্যূহ রচনা কর।' সেদিন সকালবেলা ভীষ্ম অসীম তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে এক ভীম ছাড়া এমন কেহই উপস্থিত ছিল না যে তাঁহাকে আটকায়। ভীম ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন, আর দুর্যোধন ভ্রাতাগণ-সহ তাঁহাকে

রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভীমের প্রথম কাজ হইল ভীষ্মের সারথিটিকে সংহার করা। সারথি নাই, ঘোড়া কে থামাইবে? তাহারা রথ লইয়া রণস্থলময় ছুটাছুটি করিতেছে। সেই ফাঁকে ভীমও দুর্যোধনের ভাই সুনাভের মাথাটি কাটিয়া বসিয়া আছেন।

সুনাভের মৃত্যুতে আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত পণ্ডিত ও বিশালাক্ষ নামক দুর্যোধনের আর সাত ভাই ক্ষেপিয়া ভীমকে মারিতে লাগিলেন। ভীম তাঁহাদিগকে সম্মুখে পাইয়া আর সংহার করিতে বিলম্ব করিলেন না।

তাহা দেখিয়া দুর্যোধন কাঁদিতে কাঁদিতে ভীষ্মকে বলিলেন, 'দাদামহাশয়, ভীম তো ভাইগুলিকে মারিয়া ফেলিল। আপনার যুদ্ধে উৎসাহ নাই।'

ভীষ্ম বালিলেন , 'আগে কথা শুন নাই। ভীম কি তোমাদিগকে পাইলে ছাড়িবে? আমি আর দ্রোণ যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি, করিবও।'

অর্জুনের পুত্র ইরাবান সেদিন অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। শকুনি আর তাঁহার ছয় ভাই মিলিয়া ইরাবানকে আক্রমণ করেন। সাত জনে মিলিয়া চারিদিক হইতে মারেন, কাজেই ইরাবান প্রথমে তাঁহাদিগকে কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার শরীর অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, দর-দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন ইরাবান অসিচর্ম (খড়গ ও ঢাল) হাতে রথ হইতে নামিলেন। শত্রুরা এই সুযোগে তাঁহাকে মারিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তাহারা আর কোনো অনিষ্ট করিবার পূর্বে শকুনি ছাড়া তাহাদের আর সকলে ইরাবানের খড়গে খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল। ভাইদিগের মৃত্যুতে শকুনি পলায়ন করিলেন। দুর্যোধন ইরাবানকে মারিবার নিমিত্ত আর্যশৃঙ্গ নামক এক ভয়ংকর রাক্ষসকে পাঠাইয়া দিলেন। দুরাত্মা যুদ্ধ করিতে আসিয়াই মায়াবলে দুই হাজার অশ্বারোহী রাক্ষস আনিয়া ফেলিল। রাক্ষসের দল যুদ্ধ করিতেছে, সেই অবসরে মায়াবী আর্যশৃঙ্গ আকাশে উড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ইরাবানও মায়া জানিতেন, কাজই আকাশে উঠিয়াও রাক্ষস তাঁহার কিছু করিতে পারিল না। তিনি খড়গ দিয়া দুষ্টকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ইরাবান নাগের দেশের লোক। নাগেরা যুদ্ধের সংবাদ পাইয়া দলে দলে তাঁহার সাহায্য করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাক্ষসও তখন গরুড় হইয়া সে সকল সাপ গিলিতে আরম্ভ করিল।

হায়! ইহাতে কী সর্বনাশই হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া ইরাবান এমন আশ্চর্য হইয়া গেলেন যে, মুহূর্তের জন্য তিনি হতভম্ব হইয়া গেলেন। সেই সুযোগে দুষ্ট রাক্ষস তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল।

অর্জুন অন্যদিকে ভয়ানক যুদ্ধে ব্যস্ত। ইরাবানের মৃত্যুর কথা তিনি তখন জানিতে পারিলেন না। ভীষ্ম দ্রোণ ভীম দ্রুপদ প্রভৃতিও তখন প্রত্যেকে হাজার হাজার করিয়া সৈন্য মারিতেছেন। সে সময়ের অবস্থা কী ভীষণ! যোদ্ধাদিগের কী বিষম রাগ, যেন সকলকে ভূতে পাইয়াছে। ঘটোৎকচ ভীষ্ম দ্রোণ ভগদত্ত ইঁহারা সকলেই অতি অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইলেন। সেদিন বিকালবেলায় অর্ধেক যুদ্ধ ঘটোৎকচ একেলাই করিয়াছিলেন। তখন তাহার ভয় বা ক্লান্তি কিছুই দেখা যায় নাই।

ভীমকে মারিবার জন্য দুর্যোধনের ভ্রাতারা দ্রোণকে সাহায্য করিয়া খুবই তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু ভীম যখন দ্রোণের সাক্ষাতেই তাঁহাদের এক-একটি করিয়া, ক্রমাগত

বুঢ়োরস্ক, কুণ্ডলী, অনাধৃষ্য, কণ্ডভেদী, বৈরাট, বিশালাক্ষ, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনকধ্বজ এই নয়টিকে বধ করিলেন, তখন অবশিষ্টেরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ যমের মতো ভাবিয়া আর পালাইবার পথ পান না।

ইহারা পালাইয়া গেলে ভীম অন্যান্য যোদ্ধাগণকে মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীষ্ম দ্রোণ ভগদত্ত ও কৃপ—ইহাদের সাধ্য হইল না যে, তাঁহাকে বারণ করেন।

রাত্রি হইল, তথাপি যুদ্ধের শেষ নাই। ঘোর অন্ধকার হইলে তবে সেদিন সকলে শিবিরে গেলেন।

রাত্রিতে দুর্যোধন কর্ণ আর শকুনিকে বলিলেন, 'পাণ্ডবদিগকে কেহই মারিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ কী? আমার মনে বড়ই ভয় হইয়াছে।'

একথায় কর্ণ বলিলেন, 'ভীষ্ম কেবল বড়াই করেন, আসলে তাঁহার ক্ষমতা নাই। উঁহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলুন, দেখিবেন আমি দু-দিনের মধ্যে পাণ্ডবদিগকে মারিয়া শেষ করিব।'

দুর্যোধন তখন ভীষ্মের শিবিরে গিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক বলিলেন, 'দাদামহাশয়, পাণ্ডবদিগকে মারিতে এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? আপনার যদি তাঁহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা না থাকে, তবে না-হয় একবার কর্ণকে বলিয়া দেখুন না! তিনি তাঁহাদিগকে বধ করিবেন।'

এমন অপমানের কথায় ভীষ্মের মনে যে নিতান্তই ক্লেশ হইবে, তাহা আশ্চর্য কী! তিনি খানিক চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলেন; তারপর বলিলেন, 'আমি প্রাণপণে তোমার উপকার করিতেছি, তথাপি তুমি কেন আমাকে এমন কঠিন কথা কহিতেছ? যে পাণ্ডবেরা খাণ্ডবদাহন করিল, নিবাত কবচগণকে মারিল, তোমাকে গন্ধর্বের হাত হইতে বাঁচাইল, বিরাটের দেশে তোমাদিগকে হারাইয়া গরু ছাড়াইয়া লইল আর তোমাদের পোশাক লইয়া উত্তরাকে পুতুল খেলিতে দিল, তাঁহারা যে অসাধারণ বীর ইহা বুঝিতে পার না? যাহা হউক, কাল আমি এমন যুদ্ধ করিব যে, লোকে চিরদিন সেই যুদ্ধের কথা বলিবে।'

পরদিন যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক হইল। সকালবেলায় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আর অভিমন্যুকে মারিতে আসিয়া রাক্ষস অলম্বুষ খুব জব্দ হয়। তারপর দ্রোণ অর্জুন সাত্যকি ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন। মধ্যাহ্নকাল হইতে যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। অর্জুন তখন এমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, কৌরব সৈন্যরা পালাইবারও অবসর পায় নাই।

কিন্তু শেষবেলায় একেলা ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। কাহারও আর এমন ক্ষমতা হইল না যে, তাঁহাকে আটকায়। ভীষ্মের ধনুষ্টঙ্কার অন্য সকল শব্দকে ডুবাইয়া দিল। তাঁহার বাণ যাহার গায়ে লাগিল, তাহাকে ভেদ না করিয়া ছাড়িল না। পাণ্ডব সৈন্যরা অস্ত্র ফেলিয়া এলো চুলে চ্যাঁচাইয়া পালাইতে লাগিল। কাহার সাধ্য তাহাদিগকে ফিরায়! কৃষ্ণ ক্রমাগত অর্জুনকে বলিতেছেন, 'অর্জুন, কী দেখিতেছ? ভীষ্মকে মার!'

অর্জুন বলিলেন, 'রাজ্যের জন্য যদি এমন কাজই করিতে হয়, তবে আর বনে গিয়া ক্লেশ পাইলাম কেন? আচ্ছা চলুন, আপনার কথাই রাখিতেছি।' কিন্তু অর্জুন কিছুতেই ভীষ্মকে বারণ করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ চাবুক হাতে নিজেই ভীষ্মকে মারিতে চলিলেন। ইহাতে অর্জুন লজ্জিত হইয়া আরো উৎসাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ভীষ্মের তেজ কমা দূরে থাকুক, বোধ হইল যেন আরো বাড়িয়া গিয়াছে। আগুন লাগিলে উলুবনের যেমন দশা হয়, ভীষ্মের হাতে পড়িয়া পাণ্ডব সৈন্যদেরও প্রায় তেমনি হইল।

যতক্ষণ আলো ছিল, ততক্ষণ ভীষ্ম এইরূপ করিয়া যুদ্ধ করেন। তারপর অন্ধকার আসিয়া সৈন্যদের বাঁচাইয়া দিল।

সে রাত্রে পাণ্ডবেরা ভীষ্মের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কাতরভাবে বলিলেন, 'দাদামহাশয়, আমরা তো কিছুতেই আপনার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। আমাদের রাজ্য পাওয়ার কী উপায় হইবে? আর,কত লোক যে মরিতেছে, তাহাই বা কিরূপে বারণ হইবে? আপনাকে বধ করিবার উপায় বলিয়া দিন।'

ভীষ্ম বলিলেন, 'আমার হাতে অস্ত্র থাকিলে দেবতারাও আমাকে পরাজয় করিতে পারেন না। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলে আমাকে মারা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং এক উপায় বলিয়া দিই। শিখণ্ডীকে দেখিলে আমি অস্ত্র ত্যাগ করি, অর্জুন এই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া আমার গায় বাণ মারুক। এই আমার বধের উপায়। আমি অনুমতি দিতেছি, তোমরা মনের সুখে আমায় প্রহার কর। আমার এই কথামতো কাজ করিলে নিশ্চয় তোমাদের জয়লাভ হইবে।'

এইরূপ কথাবার্তার পর পাণ্ডবেরা সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। শিবিরে আসিয়া অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, 'ছেলেবেলায় খেলা করিতে করিতে ধুলা-সুদ্ধ দাদামশায়কে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার গায় ধুলা মাখাইয়া দিতাম, কোলে উঠিয়া ডাকিতাম, "বাবা।" সেই দাদামহাশয়কে কী করিয়া মারিব? আমি তাহা পারিব না। মরি সেও ভালো।'

যাহা হউক, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুনের মনের এই দুঃখ শীঘ্রই দূর হইয়া গেল। ভীষ্মকে না মারিলে জয় নাই, সুতরাং যে উপায়ে হউক, তাঁহাকে মারিতে হইবে।

রাত্রি প্রভাত হইলে পাণ্ডবেরা রণবাদ্য বাজাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আজ শিখণ্ডী সকলের আগে, অপর যোদ্ধারা তাঁহার পশ্চাতে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র ভীষ্ম পূর্বদিনের ন্যায় একধার হইতে পাণ্ডব সৈন্য শেষ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী তাঁহাকে বারণ করিবার জন্য ক্রমাগত বাণ মারিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। শিখণ্ডীর বাণ খাইয়া তিনি হাসেন আর বলেন, 'তোমার যা খুশি কর, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।'

শিখণ্ডী তাহার উত্তরে বলিলেন, 'তুমি যুদ্ধ কর আর না কর, আমার হাতে আজ তোমার রক্ষা নাই!'

এইরূপে শিখণ্ডী ভীষ্মকে বাণ মারিতেছেন, আর ভীষ্ম তাঁহার দিকে না তাকাইয়া ক্রমাগত পাণ্ডবদিগের সৈন্য মারিতেছেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে কোনোমতেই বারণ করিতে পারিতেছেন না। তাহা দেখিয়া অর্জুন মহা-রোষে কৌরব সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন।

দুর্যোধনের নিজের এমন ক্ষমতা নাই যে, তিনি অর্জুনকে আটকান; কাজেই তিনি ভীষ্মকে বলিলেন, 'দাদামহাশয়, অর্জুন তো সব মারিয়া শেষ করিল, আপনি ভালো করিয়া যুদ্ধ করুন!'

তাহা শুনিয়া ভীষ্ম বলিলেন, 'আমি তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, রোজ দশহাজার সৈন্য মারিব। সেইমতো আমি রোজ দশ হাজার সৈন্য মারিয়াছি। আজ যুদ্ধে প্রাণ দিয়া তুমি যে একদিন আমাকে অন্ন দিয়াছ সেই ঋণ শোধ করিব!'

এই বলিয়া তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এদিকে শিখণ্ডীর বাণের বিরাম নাই। অর্জুন ক্রমাগত তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন, 'ভয় নাই! দাদামহাশয়কে আক্রমণ কর। আমি বাণ মারিয়া তাঁহাকে বধ করিব।'

অর্জুনকে বারণ করিবার জন্য দুঃশাসন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু খানিক যুদ্ধের

পরেই অর্জুনের বাণ সহিতে না পারিয়া ভীষ্মের রথে গিয়া তাঁহাকে আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

এদিকে ভগদত্ত কৃপ শল্য কৃতবর্মা বিন্দ অনুবিন্দ জয়দ্রথ চিত্রসেন বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণ ইহারা সকলে মিলিয়া ভীমকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহার কিছুই করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হাজার হাজার বাণ সহ্য করিয়া ভীম তাঁহাদের সকলকে বাণে বাণে অস্থির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় অর্জুন আসিয়া ভীমের সহিত মিলিলেন। তখন কৌরবদেরও ভীষ্ম দুর্যোধন ও বৃহদ্বল প্রভৃতি সকলে সেখানে আসিলেন, যুদ্ধ বড় ভীষণ হইয়া উঠিল। এই গোলমালের ভিতরে শিখণ্ডী তাঁহার নিজের কাজ ভুলেন নাই। সুযোগ পাইলেই তিনি ভীষ্মের গায়ে বাণ মারিতেছেন।

যুধিষ্ঠির এই সময়ে ভীষ্মের খুব কাছে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, 'যুধিষ্ঠির, অনেক প্রাণী বধ করিয়াছি, আমার আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছ নাই। আমাকে যদি সুখী করিতে চাহ, তবে শীঘ্রই অর্জুনকে লইয়া আমাকে বধ কর।'

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা শীঘ্র আইস। আজ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে।' ইহার পর হইতে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া পাণ্ডবগণ ভীষ্মের বধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৌরবরাও সকলে মিলিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কোনোরূপ আয়োজনই করিতে বাকি রাখিলেন না। তখন কিরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। আর ভীষ্মের কথা কী বলিব! 'আজ মরিতেই হইবে' এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। যেমন করিয়া মরিলে ক্ষত্রিয় স্বর্গে যায়, সেইরূপ করিয়া মরিতে হইবে। রণস্থলে ধর্মযুদ্ধে শত্রু সংহার করিতে করিতে প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর গৌরবের কথা হইতে পারে না। ভীষ্মের ন্যায় মহাবীর ও মহাপুরুষ আজ সেই গৌরবের সুযোগ পাইয়া আর তাহা ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন। তাই তিনি আজ মরিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। ঐ দেখ, পাণ্ডবদের দলের সোম নামক সৈন্যগণ দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে শেষ হইয়া গেল। ঐ শুন, মেঘ-গর্জনের ন্যায় তাঁহার ধনুকের শব্দ অবিরাম শুনা যাইতেছ। কৃষ্ণ অর্জুন আর শিখণ্ডী ব্যতীত আর কেহই সেই ধনুকের সম্মুখে টিকিতে পারিতেছেন না।

শিখণ্ডী ভীষ্মের বুকে দশ বাণ মারিলেন। ভীষ্ম তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। অর্জুন ক্রমাগত তাঁহাকে বলিতেছেন, 'মার মার!' শিখণ্ডী উৎসাহ পাইয়া বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাপুরুষ সে সকল বানের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, একদিকে অর্জুনকে নিবারণ আর একদিকে পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিতে ব্যস্ত।

এই সময়ে দুঃশাসন একা পাণ্ডবদিগের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিলেন। তখন তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া কেহই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই। অর্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে এড়াইয়া যাইতে পারিল না।

শিখণ্ডী ভীষ্মকে বাণ মারিতে এক মুহূর্তও অবহেলা করিতেছেন না। ভীষ্ম হাসিতে হাসিতে তাঁহার সকল বাণ অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমাগত পাণ্ডবসৈন্য বধ করিতেছেন। দুর্যোধন প্রভৃতি সকলে প্রাণপণে ভীষ্মের সাহায্যের জন্য ব্যস্ত; কিন্তু অর্জুনের তেজে তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইতেছে। অর্জুনের গাণ্ডীব হইতে ভীষণ বাণ-বৃষ্টির আর বিরাম নাই, কৌরব সৈন্যদের আর বুঝি কিছু অবশিষ্ট থাকিল না! কৃপ শল্য দুঃশাসন বিকর্ণ ও বিংশতি সকলেই পলাইয়া গেলেন। মৃতদেহে রণস্থল ছাইয়া গেল।

কিন্তু ভীষ্ম একাই যে অদ্ভুত কাজ করিতেছিলেন, অন্যেরা পালাইয়া যাওয়াতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না।

অর্জুনের কাছে পাণ্ডব পক্ষের যে সকল রাজা ছিলেন, ভীষ্ম তাঁহাদের সকলকেই মারিয়া শেষ করেন। দশ হাজার গজারোহী, সাত জন মহারথ, চৌদ্দ হাজার পদাতি, এক হাজার হাতি, দশ হাজার ঘোড়া, তাহা ছাড়া বিরাটের ভাই শতানীক প্রভৃতি হাজার হাজার যোদ্ধা সেদিন তাঁহার হাতে মারা যান।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, 'অর্জুন, তুমি শীঘ্র ভীষ্মকে বারণ কর। উঁহাকে মারিতে পারিলেই জয় হইবে।'

অমনি অর্জুন বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্মও সে সকল বাণ খণ্ড খণ্ড করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তারপর ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন অভিমন্যু সাত্যকি ঘটোৎকচ প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষের সকলে তাঁহার বাণে অস্থির হইয়া উঠিতে অর্জুন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন।

শিখণ্ডীর বিশ্রাম নাই, আবার অর্জুন তাঁহার সাহায্য করিতেছেন।

সাত্যকি চেকিতান ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট দ্রুপদ নকুল সহদেব অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ প্রভৃতি সকলে মিলিয়াও তাঁহাকে বাণ মারিতে ত্রুটি করিতেছেন না। তথাপি ভীষ্ম কিছুমাত্র কাতর নহেন। তাঁহার যুদ্ধ তেমনি চলিয়াছে।

এমন সময় অর্জুন ভীষ্মের ধনুক কাটিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া দ্রোণ কৃতবর্মা জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা শল শল্য ও ভগদত্ত মিলিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিতে যাওয়ায়, সাত্যকি ভীম ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট ঘটোৎকচ আর অভিমন্যু অর্জুনের সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসিলেন।

এদিকে শিখণ্ডী বাণে বাণে ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন। ভীষ্ম ধনুক হাতে লইলেই অর্জুন তাহা কাটিয়া ফেলিতেছেন। তাহাতে ভীষ্ম এক শক্তি ছুড়িয়া মারিলে তাহাও তিনি কাটিতে বাকি রাখেন নাই।

তখন ভীষ্ম মনে মনে বলিলেন, 'কৃষ্ণ না থাকিলে এখনো আমি এক বাণেই পাণ্ডবদিগকে মারিতে পারি। কিন্তু আমি পাণ্ডবদিগকে মারিব না, শিখণ্ডীর সহিতও যুদ্ধ করিব না। এই আমার মরিবার সুযোগ।'

ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অপর বসুগণ আকাশ হইতে বলিলেন, 'তাহাই ঠিক ভীষ্ম, আর যুদ্ধে কাজ নাই।'

একথায় স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেবতারা ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর এই সময় হইতে ভীষ্ম অর্জুনের সহিত যুদ্ধের চেষ্টা ছাড়িয়া দিলেন। এতক্ষণ শিখণ্ডী তাঁহাকে যে সকল বাণ মারিতেছিলেন তাহা তাঁহার গ্রাহ্য হয় নাই। অতঃপর অর্জুন গাণ্ডীব লইয়া তাঁহার গায় ভয়ংকর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম তখন অন্যান্য যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু অর্জুনের বাণে জর্জরিত হইয়াও তিনি তাঁহাকে আর আঘাত করিলেন না। অর্জুন অবসর পাইয়া ক্রমাগত তাঁহার ধনুক কাটিয়া তাঁহার উপর বাণ মারিতে লাগিলেন।

এই সময় দুঃশাসন ভীষ্মের কাছে ছিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, 'দুঃশাসন, এ সকল তো শিখণ্ডীর বাণ নয়, এগুলি নিশ্চয় অর্জুনের। দেখ, আমার বর্ম ভেদ করিয়া বাণগুলি শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতেছে।'

এই বলিয়া তিনি অর্জুনের প্রতি একটা শক্তি ছুড়িয়া মারিলেন। অর্জুন তিন বাণে তাহা খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর ভীষ্ম ঢাল আর খড়গ হাতে লইয়া মনে করিলেন, 'হয় মরিব, না হয় সকলকে মারিব।' কিন্তু তিনি খড়গ চর্ম হাতে রথ হইতে নামিবার পূর্বেই তাহাও অর্জুন কাটিয়া শতখণ্ড করিলেন।

এদিকে কৌরবেরা ভীষ্মকে রক্ষার জন্য কত চেষ্টাই করিতেছেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে কিছুই করিবার অবসর দিতেছেন না। অর্জুনের বাণে ভীষ্মের শরীর এইরূপ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে ভীষ্ম রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিয়া। 'হায় হায়! হায় হায়!' শব্দে দেবতারা চিৎকার করিয়া উঠিলেন। 'হায় হায়! হায় হায়!' শব্দে যোদ্ধাগণ কাঁদিতে লাগিল। শরীরে এত বাণ বিঁধিয়াছিল যে, রথ হইতে পড়িয়াও ভীষ্ম শূন্যেই রহিয়া গেলেন। তাঁহার শরীরে মাটি ছুঁইতে পাইল না। লোক মৃত্যুর সময় কোমল বিছানায় শয়ন করে; কিন্তু ভীষ্মের হইল 'শরশয্যা', অর্থাৎ বাণের বিছানা।

সেই মহাবীর শরশয্যায় শুইয়া স্বর্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তখন আকাশ হইতে দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে মহাবীর, হে মহাপুরুষ! সূর্য এখনো আকাশের দক্ষিণ ভাগে রহিয়াছেন। মহাপুরুষের মৃত্যুর ইহা সময় নহে। তুমি কি এমন অসময়ে প্রাণত্যাগ করিবে?'

ভীষ্ম বলিলেন, 'আমি তো প্রাণত্যাগ করি নাই!'

মানস-সরোবরবাসী হংসগণ আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল। তাহারা বলিল, 'এখনো সূর্যদেব আকাশের দক্ষিণ ভাগেই রহিয়াছেন, মহাত্মা ভীষ্ম কি এমন সময় প্রাণত্যাগ করিবেন?'

ভীষ্মদেব সেই হংসগণকে দেখিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। উহারা তাঁহারই মাতা গঙ্গাদেবীর প্রেরিত হংসরূপী মহর্ষিগণ।

তাই তিনি বলিলেন, 'হে হংসগণ! পিতার বরে আমি মৃত্যুকে বশ করিয়াছি। সত্য কহিতেছি, সূর্যদেব আকাশের উত্তর ভাগে গমন না করিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব না।'

ভীষ্ম রথ হইতে পড়িবামাত্র যুদ্ধ থামিয়া গেল। পাণ্ডবদের দলে মহাশঙ্খ বাজিয়া উঠিল; ভীম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দ্রোণ এ সংবাদ শুনিবামাত্র অজ্ঞান হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। তারপর যোদ্ধাগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া, হেঁটমুখে জোড়হাতে সেই মহাবীরের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন ভীষ্ম বলিলেন, 'হে মহারথগণ, তোমাদের মঙ্গল তো? তোমাদিগকে দেখিতে পাইয়া বড় সুখী হইলাম। দেখ, আমার মাথা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বালিশ দাও।' রাজামহাশয়েরা তৎক্ষণাৎ রাশি-রাশি কোমল রেশমী বালিশ আনিয়া উপস্থিত ক্যরিনে। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম হাসিয়া বলিলেন, 'এ বালিশ তো এ বিছানায় উপযুক্ত নয়। বৎস অর্জুন, উপযুক্ত বালিশ দাও।'

অর্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'দাদামহাশয়, কী করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।'

ভীষ্ম কহিলেন, 'বৎস, তুমি ধনুর্ধরগণেরমধ্যে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান, আর ক্ষত্রিয়ের ধর্মে শিক্ষিত। মাথা ঝুলিতেছে, উপযুক্ত বালিশ দাও।'

তখন অর্জুন ভীষ্মের পদধূলি লইয়া তিন বাণে তাঁহার মাথা উঁচু করিয়া দিলেন। তাহাতে ভীষ্ম পরম সন্তোষের সহিত অর্জুনকে আশীর্বাদ করিয়া সকলকে বলিলেন, 'এই দেখ, অর্জুন আমার উপযুক্ত বালিশ দিয়াছে।'

তারপর ভীষ্ম আবার বলিলেন, 'যতদিন না সূর্যদেব আকাশের উত্তর ভাগে যাইবেন,

ততদিন আমি এইভাবে থাকিব। সূর্যদেব আকাশের উত্তর ভাগে আসিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমার চারিদিকে পরিখা করিয়া (অর্থাৎ খাল কাটিয়া) দাও, আর তোমরা শত্রুতা ছাড়িয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হও।' তারপর দুর্যোধন ভালো ভালো চিকিৎসক ও ঔষধ লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভীষ্ম বলিলেন, 'উহা দিয়া আমার কী হইবে? এখন আমার চিকিৎসার সময় নহে, আমাকে পোড়াইবার সময়।'

সুতরাং চিকিৎসকেরা তাহাদের ঔষধ লইয়া ফিরিয়া গেল। তারপর রাত্রি হইলে সে স্থানে প্রহরী রাখিয়া সকলে শিবিরে গমন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে পুনরায় সকলে ভীষ্মের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ক্রমে স্ত্রী বালক বৃদ্ধ সকলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত সেখানে আসিতে লাগিল। কন্যাগণ তাঁহার উপরে ফুলের মালা, চন্দনচূর্ণ ও খই ছড়াইতে লাগিল। গায়ক নর্তক ও বাদ্যকারগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজারা বিনীতভাবে তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলেন। তখন সেখানকার শোভা হইল যেন স্বর্গের শোভা।

এমন সময় ভীষ্ম বলিলেন, 'জল দাও।'

অমনি সকলে ব্যস্ত হইয়া নানারূপ মিষ্টান্ন ও সুশীতল জল আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহা দেখিয়া ভীষ্ম কহিলেন, 'এ পৃথিবী হইতে আমি বিদায় লইয়াছি; সুতরাং এখানকার মানুষেরা যে জল খায়, আমি আর তাহা খাইব না। অর্জুন কোথায়?

অর্জুন জোড়াহাতে বলিলেন, 'কী করিতে হইবে দাদামশায়?'

ভীষ্ম বলিলেন, 'দাদা, বিছানা দিয়াছ, বালিশ দিয়াছ, এখন তাহার উপযুক্ত জল দাও।'

অর্জুন ভীষ্মের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অমনি গাণ্ডীবে পর্জন্য অস্ত্র যোজনা করিলেন। সে অস্ত্র ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বের ভূমিতে নিক্ষেপ করামাত্রই তথা হইতে পবিত্র নির্মল জলের উৎস উঠিতে লাগিল। আহা, কী সুগন্ধ! কী মধুর শীতল জল! সে জল পান করিয়া ভীষ্মের প্রাণ জুড়াইল। তিনি অর্জুনকে বার বার আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'তোমার সমান ধনুর্ধর এ জগতে আর নাই। দুর্যোধন আমাদের কথা শুনিল না; সুতরাং সে নিশ্চয়ই মারা যাইবে।'

দুর্যোধন কাছেই ছিলেন, আর ভীষ্মের কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভীষ্ম বলিলেন, 'দুর্যোধন, অর্জুন যাহা করিল, দেখিলে তো? এমন কাজ আর কেহই করিতে পারে না; এই পৃথিবীতে অর্জুন আর কৃষ্ণ ভিন্ন আগ্নেয়, বরুণ, সোম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, পারমেষ্ট, প্রাজাপাত্য, ধাত্র, ত্বাষ্ট্র, সাবিত্র ও বৈবস্বত অস্ত্রসকলের কথা কেহ জানে না। তুমি এইবেলা পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি কর, আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধের শেষ হউক! আমি সত্য কহিতেছি, আমার কথা না শুনিলে নষ্ট হইবে।'

এই কথা বলিয়া ভীষ্ম চুপ করিলে সকলে শিবিরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় কর্ণ সেখানে আসিয়া ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যে প্রতিদিন আপনার দৃষ্টিপথে পড়িয়া আপনাকে ক্লেশ দিত, আমি সেই রাধেয় (রাধা পুত্র)।'

ভীষ্ম কষ্টে চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে অপর লোক নাই, কেবল প্রহরী আছে। তখন প্রহরীদিগকে সরাইয়া দিয়া এক হাতে কর্ণকে আলিঙ্গনপূর্বক তিনি বলিলেন, 'কর্ণ, তুমি আসিয়া ভালো করিয়াছ। আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শুনিয়াছি, তুমি রাধার পুত্র নহ, তুমি কুন্তীর পুত্র। তুমি দুষ্টের দলে জুটিয়া পাণ্ডবদিগকে নিন্দা করিতে, তাই

আমি তোমাকে কঠিন কথা কহিতাম ; কিন্তু আমি কখনো তোমায় মন্দ ভাবি নাই। তোমার মতোন ধার্মিক দাতা আর বীর এই পৃথিবীতে নাই, একথা আমি জানি। এখন তুমি তোমার ভাইদিগের সহিত মিলিয়া থাক ; আমার মৃত্যুতেই এই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাউক।'

কিন্তু একথায় কর্ণের মন ফিরিল না। তিনি বলিলেন, 'পাণ্ডবদের সহিত আমার শত্রুতা কিছুতেই দূর হইবার নহে। আপনি অনুমতি করুন, আমি যুদ্ধ করিব। আর আপনার নিকট যদি কোনো অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করুন।'

ভীষ্ম বলিলেন, 'যদি যুদ্ধ করিবেই, তবে রোষহীন মনে পুণ্য কামনায় যুদ্ধ করিয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনপূর্বক স্বর্গে চলিয়া যাও।'
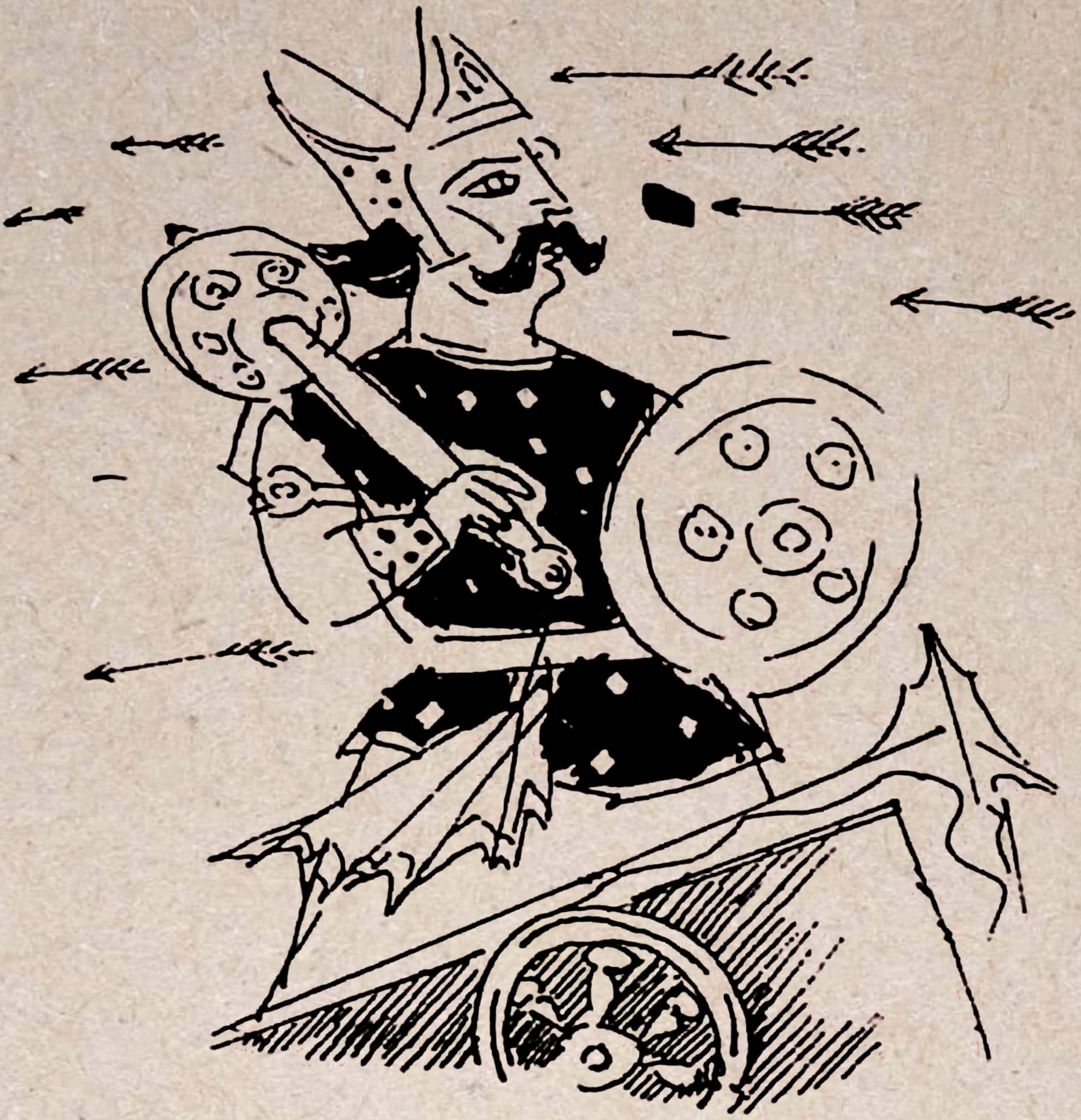
দ্রোণপর্ব

ভীষ্মের পতন হইলে কর্ণ আসিয়া কৌরবদের পক্ষে যোগ দিলেন। কর্ণকে পাইয়া তাঁহাদের উৎসাহের সীমা রহিল না। অনেকে বলিল, 'ভীষ্ম ইচ্ছা করিয়া পাণ্ডবদিগকে মারেন নাই, কিন্তু কর্ণ উহাদিগকে নিশ্চয় বধ করিবেন।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'কর্ণ, একজন সেনাপতি স্থির কর।' কর্ণ বলিলেন, 'দ্রোণ থাকিতে আর কাহাকে সেনাপতি করিবেন? দ্রোণই সর্বাপেক্ষা এ কাজের উপযুক্ত।'

একথায় দুর্যোধন দ্রোণকে বলিলেন, 'গুরুদেব, এখন আপনি সেনাপতি হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

দ্রোণ বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি সেনাপতি হইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিব। কিন্তু আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিতে পারিব না; সে আমাকে মারিবার জন্যই জন্মিয়াছে।'

দ্রোণকে সেনাপতি করিয়া কৌরবগণ বলিতে লাগিলেন যে, 'এবার পাণ্ডবদের পরাজয় নিশ্চিত।' দ্রোণ দুর্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল দেখি, আমি তোমার জন্য কী করিব?'

দুর্যোধন বলিলেন, 'আপনি যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত ধরিয়া দিন।'

দ্রোণ ইহাতে আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরই ধন্য ; তাঁহার শত্রু কোথাও নাই। তুমিও তাঁহাকে মারিতে না চাহিয়া কেবল ধরিয়া আনিতে চাহিতেছ।'

ভালো লোকে ভালোভাবেই কথা নেয়। দ্রোণ মনে করিলেন যে, দুর্যোধন বুঝি যুধিষ্ঠিরকে ভালোবাসিয়াই তাঁহাকে মারিতে চাহেন নাই। কিন্তু দুর্যোধনের মনে যে বাঁকা বুদ্ধি, তাহা তাঁহার কথাতেই ধরা পড়িল। তিনি বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরকে মারিলে কি আর অর্জুন আমাদিগকে রাখিবে? তাহার চেয়ে তাঁহার জীবন্ত ধরিয়া আনিতে পারিলে, আবার পাশা খেলিয়া বনে পাঠাইতে পারিব।'

একথায় দ্রোণ বলিলেন, 'অর্জুন থাকিতে যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আনার শক্তি দেবতারও নাই। অর্জুনকে যদি সরাইতে পার, তবে যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চয় আজ ধরিয়া আনিব।'

চরের মুখে এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন, 'তুমি আমার নিকট থাকিয়া যুদ্ধ কর। আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।'

অর্জুন বলিলেন, 'আমি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার কোনো ভয় নাই। দেবতার সাহায্য পাইলেও কৌরবেরা আপনাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।'

তারপর আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং প্রথম হইতে দ্রোণের তেজে পাণ্ডবেরা নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। সৈন্য যে কত মারিল তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। ইহাতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণকে আক্রমণ করায় যুদ্ধ ক্রমেই ঘোরতর হইয়া উঠিল।

অভিমন্যুকে আক্রমণ করিতে গিয়া হার্দিক্য বড়ই জব্দ হইলেন। প্রথমে ধনুর্বাণ লইয়া তিনি মন্দ যুদ্ধ করেন নাই ; এমনকি তিনি অভিমন্যুর ধনুক অবধি কাটিয়া ফেলেন। তখন অভিমন্যু খড়গ চর্ম হাতে তাঁহার রথে উঠিয়া এক হাতে তাঁহার কেশাকর্ষণ, এক লাথিতে সারথিকে সংহার এবং খড়গাঘাতে রথের ধ্বজাটি নাশ করিলেন। তরপর হার্দিক্যের চুল ধরিয়া, তাঁহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

হার্দিক্যের পর জয়দ্রথ আসিয়াও কম নাকাল হন নাই। তারপর শল্য আসিতেই অভিমন্যুর হাতে তাঁহার সারথিটি মারা গেল। তাহাতে শল্য ক্রোধভরে গদা হাতে অভিমন্যুকে মারিতে আসিলে, অভিমন্যুও বজ্র হেন মহা গদা উঠাইয়া বলিলেন, 'আইস !' এমন সময়ে ভীম আসিয়া তাঁহাকে থামাইয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

সে অতি আশ্চর্য যুদ্ধ হইয়াছিল। গদায় গদায় ঠোকাঠুকিতে এমনি আগুনের ফিন্‌কি ছুটিয়াছিল যে, কামারের দোকানেও তেমন হয় না। শেষে দুইজনের গদার বাড়িতে দুইজনেই ঠিকরাইয়া পড়িলেন। ভীম তখনি আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু শল্যের জ্ঞান না থাকায় তাঁহার আর উঠা হইল না।

তারপর ভীম কর্ণ দ্রোণ অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি প্রভৃতির ঘোর যুদ্ধ চলিল। এই সময়ে কৌরব সেনাগণ ক্ষত-বিক্ষত শরীরে পলায়ন করিতেছিলেন, দ্রোণ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই !' বলিয়াই তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। সে সময়ে শিখণ্ডী উত্তমৌজা নকুল সহদেব প্রভৃতি কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না।

ইহাদিগকে পরাজয় করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবামাত্র বিরাট দ্রুপদ কৈকেয়গণ সাত্যকি শিবি ব্যাঘ্রদত্ত ও সিংহসেন প্রভৃতি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পথ আটকাইলেন। কিন্তু

তাঁহাদের বাণে দ্রোণের কী হইবে? তিনি দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্রদত্ত আর সিংহসেনের মাথা কাটিয়া একেবারে যুধিষ্ঠিরের রথের কাছে গিয়া উপস্থিত।

পাণ্ডব সৈন্যরা তখন 'মহারাজকে মারিল' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, আর কৌরব সৈন্যরা 'এই ধরিয়া আনিল', বলিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিল। এমন সময় অর্জুন শত্রুসৈন্য কাটিতে কাটিতে আসিয়া সেখানে দেখা দিলেন। তারপর আর কেহ কি ধনুক ধরিতে পাইল! সকলে ভয়েই অস্থির, যুদ্ধ করিবে কে? অর্জুনের ভীষণ বাণবৃষ্টিতে চারিদিক আঁধার হইয়া গেল। তখন আর একটুও বুঝিবার সাধ্য রহিল না যে, এই পৃথিবী আর ঐ আকাশ।

আর তখন সন্ধ্যাও হইতেছিল। কাজেই দ্রোণ অমনি যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন। সেদিন আর তাঁহার যুধিষ্ঠিরকে ধরা হইল না।

দ্রোণের পক্ষে লজ্জার কথা বটে, আর অর্জুন থাকিতে এ লজ্জা দূর হওয়াও দুর্ঘট। সুতরাং যুক্তি হইল যে, পরদিন কৌশলে অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে সরাইয়া আর একবার চেষ্টা করিতে হইবে।

দ্রোণ বলিলেন, 'অর্জুনকে কেহ যুদ্ধের ছলে দূরে লইয়া যাউক। তখন সে ব্যক্তিকে পরাজয় না করিয়া অর্জুন কখনি ফিরিবে না। সেই অবসরে আমি যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া অনিব।'

একথায় সুশর্মা সত্যরথ সত্যধর্মা সত্যব্রত সত্যেষু সত্যকর্মা প্রভৃতি বীরগণ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সমেত তখনি অগ্নির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'কাল আমরা অর্জুনকে না মারিয়া যুদ্ধ হইতে ফিরিব না। যদি ফিরি, তাহা হইলে যত মহাপাপ আছে, সকলের শাস্তি যেন আমরা পাই।'

এমন প্রতিজ্ঞা যে করে, তাহাকে বলে 'সংশপ্তক'। পরদিন যুদ্ধের সময় এই সংশপ্তকগণ অর্জুনকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আইস অর্জুন, যুদ্ধ করি।'

তাহা শুনিয়া অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'দাদা, আমাকে যখন ডাকিতেছে তখন তো আমি না গিয়া পারি না।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'দ্রোণ আমাকে ধরিয়া নিতে আসিবেন, তাহার কী হইবে?'

অর্জুন বলিলেন, 'আপনার কাছে সত্যজিৎকে রাখিয়া যাইতেছি। ইনি জীবিত থাকিতে আপনার কোনো ভয় নাই। সত্যজিৎ মরিলে আপনারা কেহ রণস্থলে থাকিবেন না।'

সেইদিন সংশপ্তকেরা মিলিয়া কি অর্জুনকে কম ব্যস্ত করিয়াছিল? দলে দলে তাহারা আসিয়া প্রাণের মায়া ছাড়িয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক-এক দলকে শেষ করিয়া অর্জুন যেই যুধিষ্ঠিরের নিকট ফিরিতে যান, অমনি আর এক দল আসিয়া বলে, 'কোথায় যাও? এই যে আমরা আছি!'

আর তাহারা যুদ্ধও এমনি ভয়ানক করিয়াছিল যে, কী বলিব! ইহার মধ্যে আবার নারায়ণী সেনারা আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তখন অর্জুন রোষভরে 'ত্বাষ্ট্র' অস্ত্র ছুড়িয়া মারিলেন। সে অতি অদ্ভুত অস্ত্র। উহা ছুড়িবামাত্র শত্রুদের মাথায় গোল লাগিয়া গেল। তখন তাহারা নিজ-নিজ সঙ্গীকেই দেখিয়া বলে 'এই অর্জুন,কাট ইহাকে।' এইরূপে তিলেকের মধ্যে তাহারা নিজে নিজে কাটাকাটি করিয়া মরিল।

তথাপি সে যুদ্ধের শেষ নাই। দেখিতে দেখিতে ললিত্থ মালব মাবেল্লক প্রভৃতি যোদ্ধাগণ আসিয়া বাণে বাণে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, 'অর্জুন, তুমি বাঁচিয়া আছ?

আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না।' অমনি অর্জুন বায়ব্যাস্ত্র মারিয়া শত্রুগণের বাণ তো উড়াইয়া দিলেনই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঘূর্ণি বাতাস বহিয়া হাতি ঘোড়া সংশপ্তক অবধি সকলকে শুকনা পাতার মতো উড়াইয়া দিলেন।

এদিকে দ্রোণাচার্য তাঁহার কাজ ভুলেন নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে গিয়া ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহাকে কিছুতেই আটকাইতে পারিতেছেন না। দ্রোণের হাতে পাণ্ডব পক্ষের বৃক্ষ মরিয়াছেন, সত্যজিৎ মরিয়াছেন, দৃঢ়সন ক্ষেম বসুদা ইহারাও মরিয়াছেন। যুধিষ্ঠির দেখিলেন বড়ই বিপদ, দ্রোণ সকলকে পরাজিত করিয়া এখন তাঁহারই দিকে ঝড়ের মতোন ছুটিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তিনি অবিলম্বে ঘোড়া হাঁকাইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে দুর্যোধন অনেক হাতি লইয়া ভীমকে আক্রমণ করেন। ভীম ক্ষণকালের মধ্যেই সে সকল হাতি মারিয়া ফেলাতে অঙ্গদেশের ম্লেচ্ছ রাজা হাতি চড়িয়া দুর্যোধনের সাহায্য করিতে আসেন। ইনি মরিলে আসেন ভগদত্ত। ভগদত্ত ইন্দ্রের বন্ধু এবং ভয়ানক যোদ্ধা ছিলেন, আর তদপেক্ষা অতি ভয়ানক একটা হাতিতে চড়িয়া আসিয়াছিলেন। ভীম এত হাতি মারিয়াছেন, কিন্তু এ হাতিকে মারা দূরে থাকুক, বরং হাতিই তাঁহাকে শুঁড়ে জড়াইয়া পায়ের নিচে ফেলিবার যোগাড় করিয়াছিল। অনেক কষ্টে শুঁড় ছাড়াইয়া ভীম হাতির পায়ের তলায় গিয়া লুকাইলেন, তাই রক্ষা। আর সকলে তো মনে করিয়াছিলেন, হাতি বুঝি তাঁহাকে মারিয়াই ফেলিয়াছে। এদিকে ভীমকে বাঁচাইবার জন্য যুধিষ্ঠির, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অন্যান্য লোকের সহিত ভগদত্তের যুদ্ধ হইতে লাগিল। দশার্ণের রাজা ভগদত্তের হাতে মারা গেলেন। ভগদত্তের হাতি সাত্যকির রথখানিকে শুঁড়ে জড়াইয়া মারিলে, সাত্যকি ও তাঁহার সারথি তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিলেন। তারপর হাতিটি রাজামহাশয়দিগকে লইয়া লুফালুফি করিতে লাগিল।

তখন না জানি কিরূপ কাণ্ড হইয়াছিল, আর সকলে কিরূপ চিৎকার করিয়াছিল! সেই চিৎকার অর্জুনের কানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন, 'ঐ বুঝি ভগদত্ত তাঁহার হাতি লইয়া সকলকে শেষ করিলেন! শীঘ্র ওখানে চলুন!'

কিন্তু এদিকে আবার চৌদ্দ হাজার সংশপ্তক আসিয়া উপস্থিত। অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্রে তাঁহাদিগকে মারিয়া ফিরিতে চাহিলেন, এমন সময় আবার সুশর্মা ছয় ভাই সমেত আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। যাহা হউক, সুশর্মার ছয় ভাইকে মারিয়া এবং তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া চলিয়া আসিতে অর্জুনের অধিক সময় লাগিল না।

এদিকে ভগদত্ত তাঁহার হাতি লইয়া পাণ্ডব সৈন্য শেষ করিতে ব্যস্ত, এমন সময় অর্জুন কৌরব সেনা মারিতে মারিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপরে দুইজনে কী ভীষণ যুদ্ধই হইল! ভগদত্ত হাতির উপরে, অর্জুন রথের উপরে। অর্জুনের রথ তো আর যুদ্ধ করিতে জানে না, কিন্তু ভগদত্তের হাতিটি এক-এক বার ক্ষেপিয়া রথ গুঁড়া করিয়া দিতে আসে, কৃষ্ণ তখন অনেক কৌশলে পাশ কাটিয়া তাহাকে এড়ান।

এমন সময় অর্জুন ভগদত্তের ধনুক আর তূণ কাটিয়া তাহার গায় সত্তরটি বাণ বিঁধাইলেন। তখন ভগদত্ত রাগে অস্থির হইয়া বৈষ্ণব অঙ্কুশ নামক অস্ত্র অর্জুনের বুকের দিকে ছুড়িয়া মারিলেন। ইহা অতি ভয়ংকর অস্ত্র। বিষ্ণু ইহা নরকাসুরকে দেন, নরকাসুর ভগদত্তকে দেয়। এ

অস্ত্রের ঘা খাইলে ইন্দ্রেরও প্রাণ বাহির হইয়া যায়। একমাত্র বিষ্ণু ইহা সহ্য করিতে পারেন।

তাই সে অস্ত্রকে অর্জুনের দিকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণ (যিনি নিজেই বিষ্ণু) নিজের বুক পাতিয়া দিলেন। তাঁহার বুকে পড়িয়া তাহা একটি সুন্দর মালা হইয়া গেল।

ইহাতে অর্জুন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যুদ্ধে যোগ দিবেন না। এখন সে প্রতিজ্ঞা কী জন্য ভাঙিলেন? আমি কি অস্ত্র বারণ করিতে পারিতাম না?'

কৃষ্ণ তাঁহাকে সে অস্ত্রের কথা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ভগদত্তের হাতে আর তাহা নাই, এখন তুমি উহাকে মার।'

ইহার অল্পক্ষণ পরেই অর্জুন রাগে ভগদত্তের হাতিকে মারিয়া, অর্ধচন্দ্র বাণে ভগদত্তকে বধ করিলেন।

তারপর অচল ও বৃষ নামক শকুনির দুই ভাই অর্জুনের হাতে মারা গেলে শকুনির সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

শকুনি নানারূপ মায়া জানিতেন। প্রথমে তিনি এমন কৌশল করিলেন যে, তাহাতে নানারূপ উৎকট অস্ত্র কোথা হইতে আসিয়া কৃষ্ণ আর অর্জুনের গায় পড়িতে লাগিল, আর ভয়ংকর জন্তু এবং রাক্ষসগণ তাঁহাদিগকে মারিতে আসিল। কিন্তু অর্জুনের বাণের সম্মুখে এ সকল অস্ত্র বা জন্তু এক মুহূর্তও টিকিতে পারিল না।

তখন শকুনি হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন। অর্জুন জ্যোতিষ্ক অস্ত্রে সে অন্ধকার দূর করিলে, সেই ধূর্ত কোথা হইতে জলের বন্যা আনিয়া সকলকে ভাসাইয়া দিবার আয়োজন করিলেন। অর্জুনের আদিত্যাস্ত্রে জল সহজেই দূর হইল। তারপর আর শকুনির মায়ায় কুলাইল না; তিনি অর্জুনের বাণ খাইয়া পলায়ন করিলেন।

এইরূপে অর্জুন ক্রমে কৌরব সৈন্যদিগকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তোলায় তাহারা আর রণস্থলে টিকিয়া থাকিতে পারিল না। পাণ্ডব সৈন্যগণ ইহাতে উৎসাহ পাইয়া দ্রোণকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করিল। তখন যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বড়ই সাংঘাতিক। একদিকে দ্রোণ মহারোষে হাজার হাজার সৈন্য মারিতেছেন; অপরদিকে অশ্বত্থামা নীলকে সংহার করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আবার একদল সংশপ্তক আসিয়া অর্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক তখন পাণ্ডব সৈন্যদের একটু বিপদই হইয়াছিল। কিন্তু এমন সময় ভীম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আবার তাহাদের উৎসাহ দেখা দিল। ততক্ষণে অর্জুন সংশপ্তকদিগকে মারিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তাঁহার বাণে কৌরবদিগের কী দুর্গতিই হইল! তাহারা চ্যাঁচায় আর শুধু বলে—'কর্ণ, কর্ণ!'

সে ডাক শুনিয়া কর্ণ তখনি তিনটি ভাই সমেত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাই তিনটি তো আসিয়া অর্জুনের হাতে মারা গেল; নিজে কর্ণও বুকে হাতে সাত্যকির বাণ খাইয়া কম শিক্ষা পাইলেন না। দ্রোণ দুর্যোধন আর জয়দ্রথ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে না ছাড়াইলে বিপদ হইত।

তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ থামাইয়া সকলে শিবিরে আসিলেন।

সেদিনও যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে না পারায় দুর্যোধনের নিকট লজ্জা পাইয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে পরদিন 'চক্রব্যূহ' নামক অতি ভয়ংকর ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া তিনি পাণ্ডবপক্ষের একজন মহারথীকে বধ করিবেন।

সেদিন প্রভাত হইবামাত্রই সংশপ্তকেরা আসিয়া অর্জুনকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সে অবসরে দ্রোণ সেই সাংঘাতিক চক্রব্যূহ রচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবেরা তখন এমনই বিপদে পড়িলেন যে, কী বলিব ! অর্জুন অনুপস্থিত, এখন শুধু অভিমন্যু ছাড়া আর কেহই সেই ব্যূহে প্রবেশ করিতে জানে না। সুতরাং দ্রোণ সুবিধা পাইয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিলেন।

যুধিষ্ঠির আর উপায় না দেখিয়া অভিমন্যুকেই বলিলেন, 'বাবা, আমরা তো এ ব্যূহে প্রবেশ করিবার উপায় জানি না। এখন অর্জুন আসিয়া যাহাতে নিন্দা না করেন, তাহা কর।'

অভিমন্যু বলিলেন, 'আমি এ ব্যূহে প্রবেশ করিতে ভয় পাই। কিন্তু আপনি যখন বলিতেছেন, তখন অবশ্যই যাইব।'

তাহাতে যুধিষ্ঠির আর ভীম বলিলেন, 'তুমি কেবল পথটুকু করিয়া দাও। তারপর তোমার পিছু-পিছু আমরা ঢুকিয়া বাকি যাহা করিবার সব করিব।'

একথায় অভিমন্যু তাঁহার সারথি সুমিত্রকে চক্রব্যূহের দিকে রথ চালাইতে বলিলে সুমিত্র বিনয় করিয়া বলিল, 'কুমার, বড়ই কঠিন এবং ভয়ংকর কাজে হাত দিতেছেন। একবার ভাবিয়া দেখুন।'

অভিমন্যু বলিলেন, 'তুমি চল। নিজে ইন্দ্র দেবতাদিগকে লইয়া আসিলেও আজ আমি যুদ্ধ করিব।'

সুতরাং সারথি আর বিলম্ব না করিয়া রথ চালাইয়া দিল। আর অমনি, হরিণের ছানা পাইলে বাঘ যেমন করিয়া আসে, সেইরূপ করিয়া কৌরব যোদ্ধাগণ বালক অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বয়সে বালক হইলে কী হয় ? সেই আঠার বৎসরের ছেলে দ্রোণের সামনেই ব্যূহ ভেদ করিয়া বড় বড় কৌরবদিগকে একধার হইতে বাণের ঘায় অচল করিতে লাগিলেন। কত লোক মরিল, কত পালাইয়া গেল, তাহার কি সংখ্যা আছে ? অশ্বকেশর মরিলেন, কর্ণ অজ্ঞান হইলেন, শল্য অজ্ঞান হইলেন, শল্যের ভাই মারা গেলেন, ছোটোখাটো যোদ্ধারা তো কথাই নাই।

অভিমন্যুর বীরত্ব দেখিয়া দ্রোণ কৃপকে বলিলেন, 'ইহার মতো যোদ্ধা বোধহয় আর কোথাও নাই ! এ ইচ্ছা করিলে আমাদের সকলকে মারিয়া শেষ করিতে পারে।'

একথা কিন্তু দুর্যোধনের সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, 'অর্জুনের পুত্র বলিয়া দ্রোণ ইচ্ছা করিয়াই ইহাকে মারিতেছেন না ; তাই এই মূর্খের এত স্পর্ধা হইয়াছে ! চল, আমরা সকলে মিলিয়া ইহাকে বধ করি !'

দুঃশাসন বলিলেন, 'ইহাকে মারিলে অর্জুন কাঁদিতে কাঁদিতে আপনিই মরিয়া যাইবে। অর্জুন মরিলে পাণ্ডবেরাও মরিবে ; সুতরাং আমি এখনি ইহাকে মারিয়া আপনার সকল আপদ দূর করিয়া দিতেছি।'

দুঃশাসন এইরূপ গর্ব করিয়া অভিমন্যুকে মারিতে গেলেন, আর তাহার খানিক পরে দেখা গেল যে, তিনি চিৎ হইয়া রথে পড়িয়া খাবি খাইতেছেন আর সারথি সেই রথ হাঁকাইয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিতেছেন।

কর্ণ দু-বার আসিয়া দু-বারই নাকালের একশেষ হইলেন। তাঁহার এক ভাই মরিয়া গেল।

কিন্তু হায় ! যাঁহারা এত উৎসাহ দিয়া অভিমন্যুকে ব্যূহের ভিতরে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহই তাঁহার সঙ্গে ব্যূহের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। একা জয়দ্রথ যুদ্ধ করিয়া

তাঁহাদের সকলকে ফিরাইয়া দিতে লাগিলেন। তিন বাণে সাত্যকি, আট বাণে ভীম, ষাট বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দশ বাণে বিরাট, পাঁচ বাণে দ্রুপদ, দশ বাণে শিখণ্ডী, সত্তর বাণে যুধিষ্ঠির এইরূপে সকলকেই তাঁহার নিকট পরাজিত হইতে হইল। দ্বৈতবনে ভীমের হাতে মার খাইয়া জয়দ্রথ শিবের তপস্যা করেন। তখন শিব তাঁহাকে বর দেন, 'তুমি অর্জুন ভিন্ন আর চার পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে।' সেই বরের জোরে আজ জয়দ্রথের এত পরাক্রম।

এদিকে অভিমন্যু বৃষসেনকে পরাজয়পূর্বক বসাতীকে মারিয়াছেন। তারপর কৌরব পক্ষের অনেকে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তাঁহাদিগকে কাটিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়াছেন। শল্যের পুত্র রুক্মরথকে মারিয়া গন্ধর্ব অস্ত্রে অনেক যোদ্ধাকে অজ্ঞান করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন।

বাস্তবিক, কেহই তাঁহার নিকট হইতে অক্ষত শরীরে ফিরিতে পায় নাই। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতকর্মা ও হার্দিক্য এই ছয়জনে একসঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া ছয়জনেই পরাজিত হইলেন। তারপর ক্রাথের পুত্র আসিয়া মারা গেল। তারপর আবার দ্রোণ প্রভৃতি ছয়জনের পরাজয়। তারপর বৃক্ষারক এবং বৃহদ্বলের মৃত্যু। আর কত বলিব ! ক্রমাগত যোদ্ধারা আসে, আর অভিমন্যুর অস্ত্রে মারা যায়। কৌরবরা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, আজ ইহার হাতে রক্ষা নাই।

তখন শকুনি বলিলেন, 'চল সকলে মিলিয়া উহাকে মারি, নচেৎ ও আমাদের সকলকেই বধ করিবে।' কর্ণও তখন দ্রোণকে বলিলেন, 'শীঘ্র উহাকে মরিবার উপায় করুন নচেৎ আর রক্ষা নাই !'

এ কথায় দ্রোণ বলিলেন, 'উহার কবচ ভেদ করা অসম্ভব। কিন্তু চেষ্টা করিলে উহার ধনুক কাটিয়া, সারথি প্রভৃতি মারিয়া, উহার যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে পার। উহার হাতে ধনুক থাকিতে দেবতাগণেরও উহাকে পরাজয় করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং আগে উহার ধনুক কাট, তারপর যুদ্ধ করিও।' তখন কর্ণ হঠাৎ বাণ মারিয়া অভিমন্যুর ধনুকটি কাটিলেন, ভোজ তাঁহার ঘোড়াগুলিকে মারিলেন, কৃপ সারথিকে বধ করিলেন। এইরূপে তাঁহাকে সংকটে ফেলিয়া, নিষ্ঠুর ছয় মহারথী একসঙ্গে সেই বীর বালককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধনুক নাই, অভিমন্যু খড়্গ চর্ম লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাহাও দ্রোণ আর কর্ণের ছলনায় দেখিতে দেখিতে কাটা গেল। চক্র নিলেন, তাহাও চারিদিক হইতে সকলে বাণ মারিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিল।

তখন অভিমন্যু গদা হাতে অশ্বত্থামার দিকে ছুটিয়া চলিলে, অশ্বত্থামা তিন লাফে সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। এদিকে চারিদিক হইতে বাণ বিঁধিয়া অভিমন্যুর দেহ সজারুর দেহের মতো হইয়া গিয়াছে।

এই সময়ে অভিমন্যু গদাঘাতে সত্তরটি সঙ্গী সমেত কালিকেয় এবং অপর সতেরজন রথী ও দশটি হাতিকে মারিয়া, দুঃশাসনের পুত্রের রথ ও ঘোড়া চূর্ণ করেন। তখন দুঃশাসনের পুত্রও গদা লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। দুইজনেই দুইজনের গদার বাড়িতে ঠিকরাইয়া পড়েন। কিন্তু দুঃশাসনের পুত্র আগে উঠিয়া অভিমন্যুর মাথায় সাংঘাতিক গদার আঘাত করে। এইরূপে সকলে একসঙ্গে মিলিয়া অন্যায় যুদ্ধে সেই মহাবীর বালককে নির্দয়ভাবে হত্যা করিল।

কৌরবগণ তাঁহাদের পাপ-কার্য শেষ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। পাণ্ডবদের কথা কী

বলিব! তাঁহাদের দুঃখ লিখিয়া জানানো সম্ভব নহে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে ভয় পাইয়া সৈন্যরা পলায়ন করিতেছিলেন, যুধিষ্ঠির অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। তারপর সকলে যুধিষ্ঠিরকে ঘিরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে কথা বাহির হইল না। এদিকে অর্জুন সংশপ্তকদিগকে মারিয়া ফিরিবার সময় কৃষ্ণকে বলিলেন, 'আজ কেন আমার মন এত অস্থির হইতেছে? আমার শরীরও যেন অবশ হইয়া পড়িতেছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কোনো অমঙ্গল হয় নাই তো?'

শিবিরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা দেখিলেন, চারিদিকে অন্ধকার, লোকজনের সাড়াশব্দ নাই। অন্যদিন বাদ্য আর কোলাহলে শিবির পরিপূর্ণ থাকে, আজ তাহার কিছুই নাই। বিশেষত, অভিমন্যু প্রত্যহ অর্জুন শিবিরে আসিবামাত্র ভাইদিগকে লইয়া হাসিমুখে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন; আজ সেই অভিমন্যুই বা কোথায়?

এ সকল কথা আর বাড়াইয়া বলিয়া ফল কী? অভিমন্যুর মৃত্যুর সংবাদে অর্জুনের কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা তোমরা কল্পনা করিয়া লও। অভিমন্যুর মতো পুত্র মরিলে দুঃখ হইতে পারে, তাহা তাঁহার অবশ্যই হইল। আর সেই দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'কল্য আমি জয়দ্রথকে বধ করিব! যদি কল্য সেই পাপাত্মা জীবিত থাকিতে সূর্য অস্ত যায়, তবে আমি এইখানেই জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিব!'

সংবাদ তখনি চরেরা দুর্যোধনের শিবিরে লইয়া গেল। তাহা শুনিয়া জয়দ্রথ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সকলকে বলিলেন, 'রাজামহাশয়গণ, আপনাদের মঙ্গল হউক! আপনাদের অনুমতি পাইলেই আমি এইবেলা পলায়ন করি!'

কিন্তু দুর্যোধন তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন, 'আমরা এতগুলি লোক থাকিতে তোমার ভয় কী? আমরা তোমাকে রক্ষা করিব।'

দুর্যোধনের কথায় ভরসা না পাইয়া জয়দ্রথ দ্রোণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্রোণও তাঁহাকে খুব সাহস দিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই। আমি এমন ব্যূহ রচনা করিব যে, অর্জুন তাহা পার হইতেই পারিবে না। আর যদিই বা অর্জুন তোমাকে মারে, তাহা হইলেও তো তোমার স্বর্গলাভ হইবে। সুতরাং ভয় কী?'

এ সকল কথা আবার পাণ্ডবদিগের চরেরা তাহাদের কাছে গিয়া বলিলে কৃষ্ণ অর্জুনের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন।

পরদিন দ্রোণ যে ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন তাহা বড়ই অদ্ভুত। এই ব্যূহ চব্বিশ ক্রোশ লম্বা, আর পিছনের দিকে দশ ক্রোশ চওড়া। ইহার সম্মুখভাগ শকটের ন্যায় ও পশ্চাৎভাগ চক্র বা পদ্মের ন্যায়। ইহার ভিতর আবার লুকাইয়া 'সূচী' নামক একটি ব্যূহ হইল। কৃতবর্মা, কম্বোজ, জলসন্ধ, দুর্যোধন প্রভৃতি বীরেরা জয়দ্রথকে তাঁহাদের পশ্চাতে রাখিয়া এই 'সূচী' ব্যূহে লুকাইয়া রহিলেন। নিজে দ্রোণ বড় ব্যূহের মূলে এবং ভোজ তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেদিন অর্জুন কী ভীষণ রণই করিলেন! কৌরব সৈন্যের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহারা পালাইবে কি—যেদিকে চাহে সেই দিকেই দেখে অর্জুন। দুঃশাসন অনেক হাতি লইয়া অর্জুনকে আটকাইতে আসিলে মুহূর্তের মধ্যে সে সকল হাতি অর্জুনের বাণে খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল। তাঁহার এক-এক বাণে দুই-তিনটা করিয়া মানুষ কাটা যাইতে লাগিল।

এমন সময় দুর্যোধনের তাড়ায় দ্রোণ অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। কিছুকাল দুইজনের এমনি যুদ্ধ চলিল যে, তাহার আর তুলনা নাই। কিন্তু অর্জুনের আজ অন্য কাজ রহিয়াছে, দ্রোণের কাছে এত সময় নষ্ট করিলে তাঁহার চলিবে কেন? কাজেই তিনি হঠাৎ তাঁহার পাশ দিয়া রথ চালাইয়া দিলেন। তাহাতে দ্রোণ বলিলেন, 'সে কী অর্জুন! তুমি না শত্রুকে জয় না করিয়া ছাড় না?' অর্জুন বলিলেন, 'আপনি তো আমার শত্রু নহেন, আপনি আমার গুরু। আমি আপনার পুত্রের সমান, শিষ্য। আর, আপনাকে কে যুদ্ধে হারাইতে পারে?'

কিন্তু বুড়া কি সহজে ছাড়িবার লোক! তিনি অর্জুনের পশ্চাতে তাড়া করিলেন। তখন কাজেই অল্প-স্বল্প করিয়া তাঁহাকে বারণ করা আবশ্যক হইল। এর পর ভোজকে পার হইতে হইবে, কিন্তু কৃতবর্মা ইহার মধ্যে পথ আটকাইয়া বসিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহাকে অজ্ঞান করিতে অর্জুনের অধিক সময় লাগিল না।

কৃতবর্মা অজ্ঞান হইলে আসিলেন শ্রুতায়ুধ। ইহার বরুণদত্ত নামে একটা ভয়ংকর গদা আছে, সে গদা কেহই ফিরাইতে পারে না। কিন্তু উহার একটি দোষ এই যে, যুদ্ধে লিপ্ত নহে এমন লোককে মারিলে উহা উল্‌টিয়া তাহার প্রভুরই মাথায় পড়ে। শ্রুতায়ুধ অর্জুনকে মারিতে গিয়া সেই গদা কৃষ্ণের উপর ছুড়িয়া বসিয়াছেন। কাজেই বুঝিতেই পার—অর্জুনের আর শ্রুতায়ুধকে মারিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হইল না।

শ্রুতায়ুধের পর সুদক্ষিণ; তারপর শ্রুতায়ু ও অচ্যুত; তারপর উহাদিগের পুত্র নিতায়ু ও দীর্ঘায়ু; তারপর সহস্র সহস্র অঙ্গদেশীয় গজারোহী সৈন্য; তারপর বিকটাকার অসংখ্য যবন, পারদ ও শক; তারপর আর একজন শ্রুতায়ুধ—এরূপ করিয়া এত যোদ্ধা মরিল। দুর্যোধন তো দ্রোণের উপর চটিয়াই অস্থির! তিনি বলিলেন, 'আপনি আমাদের খান আবার আমাদেরই অনিষ্ট করেন! আপনি যে মধুমাখানো ক্ষুরের মতো, তাহা আমি জনিতাম না! যাহা হউক, শীঘ্র জয়দ্রথকে বাঁচাইবার উপায় করুন।'

দ্রোণ বলিলেন, 'আমি কী করিব? আমি বুড়া হইয়া এখন আর ছুটাছুটি করিতে পারি না। অর্জুন একটু ফাঁক পাইলেই রথ হাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কৃষ্ণ এমনি তাড়াতাড়ি রথ চালান যে, অর্জুনের বাণ তাঁহার এক ক্রোশ পিছনে পড়ে। বজ্রহাতে ইন্দ্র আসিলেও আমি তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারি, কিন্তু অর্জুনকে পরাজয় করিতে কিছুতেই পারিব না। তুমি না হয় অনেক যোদ্ধা লইয়া একবার তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া দেখ না! আমি তোমার গায় এক আশ্চর্য কবচ বাঁধিয়া দিতেছি; ইহাকে কোনো অস্ত্রই ভেদ করিতে পারিবে না।'

এই বলিয়া দ্রোণাচার্য জল ছুঁইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে দুর্যোধনের গায় সেই অদ্ভুত উজ্জ্বল কবচ বাঁধিয়া দিলেন, দুর্যোধন মহোৎসাহে অর্জুনকে মারিতে চলিলেন।

এমন সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা অনেক সৈন্য লইয়া দ্রোণকে ভয়ংকর তেজের সহিত আক্রমণ করাতে তাঁহার সৈন্যসকল তিন দলে ভাগ হইয়া গেল। দ্রোণ অনেক চেষ্টা করিয়াও আর তাহাদিগকে একত্র করিতে পারিলেন না। তখন কী ঘোর যুদ্ধই হইয়াছিল! অশ্বত্থামা, কর্ণ, সোমদত্ত প্রভৃতি কয়েকজন বড় বড় বীরের হাতে সকল সৈন্যের পশ্চাতে জয়দ্রথকে রাখিয়া আবার প্রায় সকলেই যুদ্ধে গিয়াছিল। লোক যে কত মরিয়াছিল তাহার গণনা নাই। দ্রোণাচার্যের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সময়ে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাত্যকি আসিয়া সাহায্য না করিলে বুড়ার হাতে তাঁহার বড়ই দুর্দশা হইত। সাত্যকি দেখিলেন যে, দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্নের

খড়্গ, চর্ম, ধ্বজ, ছত্র, ঘোড়া, সারথি সমুদয় শেষ করিয়া ধনুকে এক সাংঘাতিক বাণ চড়াইয়া বসিয়াছেন। সেই বাণ ছুড়িবামাত্র সাত্যকি চৌদ্দ বাণে তাহা কাটিয়া ফেলাতে, ধৃষ্টদ্যুম্ন সে-যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।

ইহার পর হইতে সাত্যকির সহিত দ্রোণের ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। কিন্তু জয় পরাজয় কাহারও হইল না। শেষে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, বিরাট প্রভৃতি আসিয়া সাত্যকির সহিত যোগ দিলেন, বহু কৌরব যোদ্ধাও আসিয়া দ্রোণের সহায় হইলেন।

এদিকে বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। অর্জুন এতক্ষণ কী করিতেছেন? এখনো জয়দ্রথকে পাইতে তাঁহার অনেক বিলম্ব আছে; কিন্তু তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। তিনি ক্রমাগত বাণাঘাতে কৌরব সৈন্য কাটিয়া পথ করিয়া দিতেছেন, আর সেই পথে কৃষ্ণ রথ চালাইতেছেন। অর্জুনের বাণ তাঁহার ধনুক হইতে ছুটিয়া শত্রুর বুকে পড়িতে পড়িতে যে সময় লাগে, তাহার মধ্যে রথ যাইতেছে এক ক্রোশ। সুতরাং ঘোড়াগুলির যে খুবই পরিশ্রম হইবে, তাহা আশ্চর্য কী? কৃষ্ণ দেখিলেন যে, এগুলিকে একটু বিশ্রাম না করাইলে চলিতেছে না।'

অর্জুনের কী আশ্চর্য ক্ষমতাই ছিল! তিনি ঘোড়ার বিশ্রামের জন্য রথ হইতে নামিয়া সেই মাঠের মধ্যেই বাণের দ্বারা একটা ঘর গাঁথিয়া ফেলিলেন। সেখানে জল ছিল না, তাই একটি সুন্দর সরোবরও করিলেন। সে সরোবরে সুমধুর সুবিমল জল তো ছিলই, তাহার উপর আবার তাহাতে হাঁসও চরিতেছিল, পদ্মফুল ফুটিয়াছিল।

অর্জুনের রথ থামিলে এবং অর্জুনকে নামিতে দেখিয়া শত্রুরা অবশ্য তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু অর্জুনের বাণের কাছে তাহারা কী আর করিবে! কৃষ্ণ সেই বাণের ঘরের ভিতর ঘোড়াগুলির সাজ খুলিয়া তাহাদিগকে দলিয়া-মলিয়া জল খাওয়াইয়া আবার তাজা করিয়া লইলেন। ইহার পর হইতে রথ আবার বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল। জয়দ্রথ যাইবেন কোথায়? ঐ তাঁহাকে দেখা যাইতেছে।

এমন সময় দুর্যোধন জয়দ্রথকে বাঁচাইবার জন্য অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। এবারে আর তাঁহার সাহসের সীমা নাই; তাঁহার গায়ে দ্রোণের বাঁধা সেই কবচ রহিয়াছে। বাস্তবিকই সে কবচের এমনি আশ্চর্য গুণ যে, অর্জুনের বাছ বাছা বাণগুলি উহা হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। ইহাতে কৃষ্ণ আর অর্জুন প্রথমে খুবই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। যাহা হউক, ব্যাপারখানা যে কী তাহা বুঝিতে অর্জুনের বিলম্ব হইল না। তখন তিনি বলিলেন, 'ঐ কবচসুদ্ধই উহাকে হারাইব!'

কিন্তু কী মুশকিল! অর্জুন মন্ত্র পড়িয়া সাংঘাতিক অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করেন, আর অশ্বত্থামা অন্যদিক হইতে বাণ মারিয়া তাহা মধ্যপথেই কাটিয়া ফেলেন। দুর্যোধনও সেই অবসরে অর্জুন এবং কৃষ্ণকে ক্ষত-বিক্ষত করেন। যাহা হউক, ইহার ঔষধ শীঘ্রই পড়িল। দুর্যোধনের সমস্ত শরীর কবচে ঢাকা, কিন্তু হাত দু-খানি খালি। সেই দু-খানি হাতেই অর্জুন বাণ মারিতে লাগিলেন। আর দুর্যোধন যাইবেন কোথায়? হাতে বাণ লাগাতে তাঁহার যুদ্ধ করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা না করিলে তখনি মহারাজের প্রাণটি যাইত।

তারপর জয়দ্রথকে ধরিবার জন্য অর্জুন অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলে কৌরবদের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। অর্জুনের গাণ্ডীবের টঙ্কার ও কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের ভীষণ শব্দে কত লোক

যে অজ্ঞান হইয়া গেল তাহার সংখ্যা নাই। তখন ভূরিশ্রবা, শাল্ব, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, শল্য ও অশ্বত্থামা এই আটজনে মিলিয়া অর্জুনকে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদের সকল বাণ কাটিয়া সমুচিত প্রতিফল দিতে অর্জুনের কোনো ক্লেশ হইল না।

এদিকে দ্রোণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বিষম যুদ্ধ চলিতেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাহারও জয় পরাজয় বুঝা গেল না। বাণ, শক্তি, গদা দুইজনে কতই ছুড়িলেন। দুইজনেরই সমান তেজ। কিন্তু ইহার পরেই দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া আর ধনুক কাটিয়া তিনটি ভয়ংকর বাণ মারিলে তাঁহার এমনি বিপদ হইল যে, তখন রথ ছাড়িয়া অস্ত্র ফেলিয়া হাত তুলিয়া দাঁড়ানো ভিন্ন আর উপায় নাই। দ্রোণ দেখিলেন, এই তাঁহার সুযোগ! অমনি তিনি সিংহের ন্যায় যুধিষ্ঠিরকে ধরিতে ছুটিলেন, 'হায় হায়! মহারাজ ধরা পড়িলেন' বলিয়া চারিদিকে চিৎকার উঠিল। ভাগ্যে সহদেবের রথ কাছে পাইয়া যুধিষ্ঠির তাহাতে উঠিতে পারিলেন, আর সহদেবের ঘোড়াগুলি দ্রোণের ঘোড়ার চেয়ে অনেক ভালো ছিল, নহিলে সেদিন সর্বনাশ হইত।

এদিকে রাক্ষস অলম্বুষ খানিক পাণ্ডবদিগকে খুবই জ্বালাতন করিয়া ভীমের তাড়ায় পলায়ন করে। তারপর সে অন্যত্র গিয়া আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে ঘটোৎকচের হাতে আছাড় খাইয়া চূর্ণ হয়। তারপর অনেকক্ষণ দ্রোণের সহিত পাণ্ডবদিগের তুমুল সংগ্রাম চলে।

এমন সময় দূর হইতে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। গাণ্ডীবের শব্দ এত দূরে পৌঁছে নাই, কাজেই তাহা কেহ শুনিতে পাইল না। এদিকে কৌরবেরাও সিংহনাদ করিতেছে। কাজেই যুধিষ্ঠির ভাবিলেন বুঝি অর্জুনের কোনো বিপদ ঘটিল। তাই তিনি সাত্যকিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি শীঘ্র অর্জুনের কাছে যাও।'

সাত্যকি বলিলেন, 'অর্জুন আমাকে আপনার পাশ ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছেন, আমি কী করিয়া যাই? আপনি অর্জুনের জন্য চিন্তা করিবেন না। আপনাকে রক্ষা করাই আমার কাজ।'

কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের জন্য বড়ই ব্যস্ত দেখিয়া শেষে সাত্যকিকে যাইতে হইল। যুধিষ্ঠির ভীমকেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতেছিলেন, কিন্তু সাত্যকি বলিলেন, 'আমার মতে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য।' কাজেই ভীম রহিয়া গেলেন।

সাত্যকি কৌরবদিগের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় দ্রোণ আসিয়া তাঁহাকে আটকাইলেন। দ্রোণ বলিলেন, 'অর্জুন আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কাপুরুষের মতো পাশ কাটিয়া পলায়ন করিল। তুমি যুদ্ধ না করিলে আজ তোমাকে বধ করিব।' বুদ্ধিমান সাত্যকি অমনি বলিলেন, 'গুরু যাহা করেন শিষ্যও তাহাই করে। আমি অর্জুনের কাছে চলিলাম।'

সেদিন সাত্যকির বিক্রম কৌরবেরা ভালো করিয়াই জানিতে পারিল। দ্রোণের নিকট হইতে ভোজের নিকট ; ভোজের সারথিকে কাটিয়া, কৃতবর্মাকে ঠেঙাইয়া, জলসন্ধ ও মহামাত্রকে মারিয়া, আবার দক্ষিণের দিকে, এইভাবে সাত্যকি চলিয়াছেন। এমন সময় আবার দ্রোণ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, বিকর্ণ, দুর্মুখ, দুঃশাসন, চিত্রসেন, দুর্যোধন প্রভৃতি আসিয়া একসঙ্গে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাজয় করে কাহার সাধ্য! দুর্যোধন পলায়ন করিলেন, কৃতবর্মা অজ্ঞান হইলেন। তারপর যুদ্ধ চলিল কেবল দ্রোণ আর সাত্যকিতে। ভয়ংকর যুদ্ধের পর দ্রোণকে হার মানিতে হইল। তারপর সুদর্শন মরিল, কম্বোজ, শক ও যবন সৈন্য পরাস্ত হইল, দুর্যোধন আবার আসিয়া

যথেষ্ট সাজা পাইলেন। বিকটাকার পাবর্তীয় সৈন্যগণ বিশাল বিশাল পাথর হাতে যুদ্ধ করিতে আসিয়া তাহারাও সাত্যকির বাণে খণ্ড-খণ্ড হইল। তখন কৌরবেরা কে কোথায় পলায়ন করিবে তাহাই ভাবিয়া অস্থির।

এই সময়ে দ্রোণ দুঃশাসনকে সম্মুখে পাইয়া বলিলেন, 'কী দুঃশাসন, এখন তোমার বীরত্ব কোথায় গেল? সকলে সাত্যকির ভয়ে পালাইতেছে, অর্জুনের হাতে পড়িলে কী করিবে? এই মুখেই কি পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিতে গিয়াছিলে?'

এই বলিয়া দ্রোণ পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলে বীরকেতু, সুধন্বা, চিত্রকেতু ও চিত্ররথ নামক পঞ্চালরাজ্যের পুত্রগণ দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মনের দুঃখে রাগের ভরে দ্রোণকে আক্রমণ করাতে কিছুকাল দুইজনে যুদ্ধ চলিল। কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের সম্মুখে টিকিতে পারিলেন না।

এদিকে সাত্যকি ক্রমে দুঃশাসন, ত্রিগর্ত প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া অর্জুনের দিকে চলিয়াছেন, আর দ্রোণ পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধার পর যোদ্ধাকে মারিয়া প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছেন। বৃহৎক্ষেত্র, ধৃষ্টকেতু, চেদিরাজের পুত্র, জরাসন্ধের পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র, ক্ষত্রবর্মা প্রভৃতি কত লোকের দ্রোণের হাতে প্রাণ গেল। সেই পঁচাশি বৎসরের বুড়া রণস্থলে এমনি ছোটাছুটি করিতে লাগিলেন, যেন তিনি ষোল বৎসরের বালক। মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সময়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা হইল, 'আমি অর্জুনের সন্ধানে সাত্যকিকে পাঠাইলাম, কিন্তু সাত্যকির সাহায্যের জন্য তো কাহাকেও পাঠাই নাই!'

অমনি তিনি ভীমকে সেই কার্যে পাঠাইয়া দিলেন। ভীম খানিক দূর অগ্রসর হইতে-না-হইতে দ্রোণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'অর্জুনকে ছাড়িয়াছি, কিন্তু তোমাকে ছাড়িব না।'

ভীম বলিলেন, 'ঠাকুর, অর্জুনকে আপনি দয়া করিয়া ছাড়িয়াছেন বলিয়া তো আমার মনে হয় না। সে হয়তো ভদ্রতা করিয়া আপনার মান রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি তো ভালোমানুষ অর্জুন নহি, আমি ভীম। যুদ্ধ করিতে আসিলে গুরু বলিয়া মানিব না।' বলিতে বলিতেই ভীম এক বিশাল গদা ঘুরাইয়া দ্রোণকে ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। বুড়া তখন 'বাপ!' বলিয়া রথ হইতে এক লাফ। ততক্ষণে ভীম তাঁহার রথ, ঘোড়া, সারথি প্রভৃতি একেবারে পুঁতিয়া ফেলিয়াছেন।

ইহাতে দুর্যোধনের ভ্রাতাগণ ভীমকে আক্রমণ করিলে, তিনি তাহাদের সাতজনকে বধ করিলেন। যাহাদিগকে তিনি সম্মুখে পাইলেন তাহাদের অল্প লোকই বাঁচিয়া রহিল। এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, দ্রোণাচার্য পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধাদিগকে নিতান্ত অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। অমনি আর কথাবার্তা নাই, ভীম চক্ষু বুজিয়া দ্রোণের সেই বাণবৃষ্টির ভিতরেই তাঁহার রথের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তারপর সেই রথখানিসুদ্ধ—হেঁইয়ো হোঃ!—মার বুড়াকে ছুঁড়িয়া! কিন্তু বুড়ার হাড় কী অসম্ভব মজবুত। রথ গুঁড়া হইল, কিন্তু মরিলেন না।

তারপর ভীম আর খানিক দূরে গিয়াই সাত্যকিকে দেখিতে পাইলেন। আরো খানিক দূর গিয়া দেখিলেন, ঐ অর্জুন যুদ্ধ করিতেছেন। ওঃ। তখন যে ভীমের সিংহনাদ! সেই সিংহনাদ শুনিয়া কৃষ্ণ আর অর্জুনও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এই সকল সিংহনাদ যুধিষ্ঠিরের কানে পৌঁছিলে তাঁহার যে খুব আনন্দ হইল তাহাতে আর সন্দেহ কী!

এ সকল সিংহনাদ কর্ণের সহ্য না হওয়ায় তিনি আসিয়া ভীমের সহিত মহা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু খানিক পরেই ভীমের বাণে তাঁহার ধনুক, ঘোড়া আর সারথি কাটা

যাওয়াতে তাঁহাকে গিয়া বৃষসেনের রথে আশ্রয় লইতে হইল। কিন্তু কর্ণ ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি আবার আসিয়া ভীমকে বলিলেন, 'কী হে পাণ্ডুপুত্র, তুমিও আবার যুদ্ধ করিতে জান নাকি? বড় যে পালাইতেছ?'

সুতরাং আবার তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবারও কর্ণ অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শেষে দেখিলেন যে, আবার তাঁহার ধনুক, ঘোড়া, সারথি সব কাটা গিয়াছে। তাহার পর ভীমের অস্ত্র বুকে বিঁধিয়া তাহার প্রাণ যায়-যায়। সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি অন্য রথে উঠিয়া পলায়ন করিলেন।

তথাপি কর্ণের লজ্জা নাই, তিনি আবার আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করিলেন। এবার ধনুক, সারথি আর ঘোড়া কাটা গিয়া তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইতেছে দেখিয়া দুর্যোধন তাড়াতাড়ি দুর্জয়কে সাহায্য করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু সে বেচারা ভালো করিয়া সাহায্য করিবার পূর্বেই মারা গেল।

যাহা হউক, এবার কর্ণকে আর পালাইতে হইল না ; তাঁহার জন্য অস্ত্রশস্ত্রসমেত এক নূতন রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, ভীম সে রথেরও ঘোড়া আর সারথি সংহার করাতে তাহাতে চড়িয়া কর্ণের যুদ্ধ করা হইল খুব কমই। এমন সময়ে দুর্মুখ কর্ণের সাহায্য করিতে আসিলেন। সাহায্য যাহা করিলেন তাহা একটু নূতন রকমের বটে, আর তিনি ইচ্ছা করিয়া যে সেরূপ করিয়াছিলেন তাহাও অবশ্য কখনো নহে ; কিন্তু তাহাতে কর্ণের প্রাণরক্ষা হইল। দুর্মুখ আসিয়াই তো অমনি ভীমের হাতে প্রাণত্যাগ পূর্বক নিজের রথখানি খালি করিয়া দিলেন। সে রথের ঘোড়াগুলি ছিল বড়ই চমৎকার। সুতরাং কিঞ্চিৎ পরেই যখন ভীমের হাতে কর্ণের দুর্দশার একশেষ হইল, তখন ঐ ঘোড়াগুলির সাহায্যে তিনি সহজেই রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন।

তারপর ভীম দুর্যোধনের আর পাঁচটি ভাইকে বধ করিলে কর্ণ আবার যুদ্ধ করিতে আসেন, আর দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাতে জব্দও হন। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহার সাতটি ভাইকে পাঠাইবামাত্র তাহারাও ভীমের হাতে মারা যায়। তারপর কর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এবারে ভীমের হাতে কর্ণের দুর্দশা দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহার আর সাতটি ভাইকে বলিলেন, 'তোমরা শীঘ্র গিয়া উহাকে বাঁচাও!' কিন্তু হায়! কে কাহাকে বাঁচায়? সাত ভাই ভালো করিয়া যুদ্ধ করিতে-না-করিতেই মরিয়া গেল। তারপর কর্ণের মাথায় কী যে গোল লাগিল, তিনি পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৌরবদিগকেই মারিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু ইহার পর হইতেই যেন কর্ণের তেজ আবার ফিরিয়া আসিল। তখন দেখা গেল যে, অনেকক্ষণ দুইজনে সমানভাবে যুদ্ধ চলার পর কর্ণ ক্রমেই ভীমকে কাবু করিয়া আনিতেছেন। ক্রমে ভীমের তূণ, ধনুর গুণ, ঘোড়ার রাশ সবই কাটা গেল। সারথি বাণ খাইয়া অন্য রথে আশ্রয় লইল। ধ্বজা, পতাকা কিছুই আর রহিল না। ভীম একটা শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলেন, তাহাও কাটা গেল। শেষে রহিল খড়গ ও চর্ম। চর্মখানি কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন। খড়গটি ভীম ছুড়িয়া মারিলেন, তাহাতে কর্ণের ধনুক কাটিয়া গেল। কর্ণ তখনি আর এক ধনুক লইয়া ভীমের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তখন ভীম কর্ণকে মারিবার জন্য লাফাইয়া তাঁহার উপরে পড়িতে গেলেন। কিন্তু কর্ণ হঠাৎ গুড়ি মারিয়া রথের তলার সঙ্গে মিশিয়া পড়ায় তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। তারপর ভীমের হাত খালি দেখিয়া কর্ণ তাঁহাকে তাড়া করাতে তিনি এমন বিপদে পড়িলেন যে, বিপদ যাহাকে

বলে! কতকগুলি মরা হাতি সেখানে পড়িয়া ছিল, ভীম আর উপায় না দেখিয়া তাহারই পিছনে গিয়া লুকাইলেন। কিন্তু হাতি খণ্ড-খণ্ড করিতে কর্ণের মতো বীরের কতক্ষণ লাগে। তাহাতে ভীম রথের চাকা, হাতির মাথা প্রভৃতি কর্ণকে ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের বাণের কাছে তাহাতেই বা কী ফল হইবে?

তখন ভীম বজ্রমুষ্টি উঠাইয়া এক কিলে কর্ণকে বধ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এই মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলেন যে, তিনি কর্ণকে মারিলে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইবে। কর্ণও ইচ্ছা করিলে তখন ভীমকে মারিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারও মনে হইল যে, কুন্তীর নিকটে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ইহাদিগকে মারিবেন না। তাই তিনি ভীমকে ধনুক দিয়া একটা খোঁচা মাত্র মারিলেন। ভীম তৎক্ষণাৎ সেই ধনুক কাড়িয়া লইয়া সাঁই শব্দে তাঁহাকে এক ঘা লাগাইতে ছাড়িলেন না।

তখন কর্ণ রাগে চক্ষু লাল করিয়া বলিলেন, 'মূর্খ, পেটুক, কাপুরুষ! তুই কেন আবার যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিস? তুই তো যুদ্ধের "য"ও জানিস না! যা! পেট ভরিয়া খা গিয়া! আমার মতো লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা তোর কাজ নহে।'

তাহাতে ভীম বলিলেন, 'ছোটলোক! এতবার আমার সঙ্গে হারিয়াছিস তবু আবার বড়াই করিস! হার-জিৎ তো ইন্দ্রেরও হয়। আয় না একবার মল্লযুদ্ধ করি, দেখি তোকে কীচক-বধ করিতে পারি কি না!'

ভীমের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে কর্ণের সাহস হইল না। কিন্তু তিনি এই ঘটনা লইয়া অর্জুনের সামনেই খুব বড়াই করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অর্জুনের কয়েকটি বাণ আসিয়া গায়ে পড়িলে তাঁহার আর বড়াই রহিল না। তখন তাঁহার হঠাৎ মনে হইল যে, বড়াই করার চেয়ে পলায়ন করাতে বেশি কাজ দেয়।

এই সময়ে সাত্যকি অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া অর্জুনের মনে সুখ হইল না। তিনি সাত্যকিকে যুধিষ্ঠিরের কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া আসাতে না জানি মহারাজের কী বিপদই হইয়াছে। বিশেষত এতক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সাত্যকির অস্ত্র প্রায় শেষ হইয়া যাওয়ায় এখন তাঁহারও খুবই বিপদ। এদিকে ভূরিশ্রবা রাশি রাশি অস্ত্রসমেত সুন্দর রথে চড়িয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার সম্বল সাত্যকির মোটেই নাই। কাজেই অর্জুনের রাগ হইবার কথা। এখন সাত্যকিকেই বা তিনি কী করিয়া ফেলিয়া যান, আর সামান্য বেলাটুকু আছে ইহার মধ্যে জয়দ্রথকে মারিতে হইবে, তাহারই বা কী করেন?

সাত্যকি একে অতিশয় ক্লান্ত, তাহাতে আবার অস্ত্রহীন, কাজেই ভূরিশ্রবা তাঁহাকে যেন নিতান্তই বাগে পাইলেন। তথাপি সাত্যকির যতক্ষণ কিছুমাত্র অস্ত্র অবশিষ্ট ছিল ততক্ষণ তিনি কম যুদ্ধ করেন নাই! ভূরিশ্রবা যেমন তাঁহার ধনুক আর ঘোড়া কাটিলেন, তিনিও তেমনি ভূরিশ্রবার ধনুক আর ঘোড়া কাটিতে ছাড়িলেন না। তারপর রথ ছাড়িয়া দুইজনে খড়গযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু ক্লান্ত শরীরে আর কত করা যায়! সাত্যকি খানিক খড়গযুদ্ধ করিয়াই কাবু হইয়া পড়িলেন।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, 'ঐ দেখ, সাত্যকিকে দুর্বল পাইয়া ভূরিশ্রবা তাহাকে বধ করিতেছে। ইহা অতি অন্যায়; সাত্যকি তোমার শিষ্য আর তোমার জন্যই আসিয়া বিপদে

পড়িল। উহাকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য।'

এদিকে ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে খড়গাঘাতে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার চুল ধরিয়া, বুকে লাথি মারিয়া, তাঁহার মাথা কাটিতে উদ্যত। সাত্যকি প্রাণপণে মাথা নাড়িয়া তাঁহার আঘাত এড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় অর্জুনের বাণ উল্কার মতো আসিয়া ভূরিশ্রবার ডান হাত কাটিয়া ফেলিল।

তখন ভূরিশ্রবা অর্জুনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'অর্জুন, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তুমি কেন আমার হাত কাটিলে?'

অর্জুন বলিলেন, 'শিষ্য আত্মীয় ও বন্ধুকে আমার সম্মুখে বধ করিতে দেখিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকিলে মহাপাপ হইত, তাই করিলাম।'

তখন ভূরিশ্রবা অনাহারে প্রাণত্যাগের জন্য নিজহাতে শরশয্যা প্রস্তুত করিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যানে বসিলে, কৌরবেরা চারিদিকে হইতে অর্জুনের নিন্দা আরম্ভ করিল। তাহাতে অর্জুন আবার ভূরিশ্রবাকে বলিলেন, 'হে ভূরিশ্রবা, আমার পক্ষের লোককে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা আমার কর্তব্যকাজ, তাহাই আমি করিয়াছি। কিন্তু বল দেখি, তোমরা যে অনেকে মিলিয়া বালক অভিমন্যুকে মারিয়াছিলে, তাহা তোমাদের কিরূপ কাজ হইয়াছিল?'

ভূরিশ্রবা নতশিরে অর্জুনের কথা মানিয়া লইলেন, আর বাঁ হাতে নিজের কাটা ডান হাতখানি অর্জুনের সামনে ধরিয়া একথাও জানাইলেন যে, ও-হাত কাটিয়া ফেলা উচিতই হইয়াছে।

এমন সময় সাত্যকি অসহ্য রাগের ভরে খড়গ লইয়া ভূরিশ্রবার দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সকলে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'আহা! আহা! কর কী?'

কিন্তু সাত্যকি কাহারও নিষেধ না শুনিয়া ভূরিশ্রবার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। আর বিলম্ব করা চলে না, জয়দ্রথ-বধের সময় যায়-যায়। তাই অর্জুন শীঘ্র সে কাজ শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। দুর্যোধন কর্ণ শল্য কৃপ অশ্বত্থামা আর দুঃশাসন ইঁহারাও তখন জয়দ্রথকে পশ্চাতে রাখিয়া মহা তেজে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অর্জুন তাঁহাদের প্রত্যেকের বাণ তিন খণ্ড করিয়া কাটিতেছেন, তাঁহারাও বার বার অর্জুনকে বাণে বাণে আচ্ছন্ন করিতেছেন। জয়দ্রথও তখন চুপ করিয়া নাই। কিন্তু অর্জুনকে বারণ করে কার সাধ্য! তিনি ক্রমে সকলকে হারাইয়া চৌষট্টি বাণে জয়দ্রথকে অস্থির করিলেন।

কিন্তু তখনও ছয় মহাবীরের মাঝখানে জয়দ্রথ লুকাইয়া রহিলেন। উহাদিগকে পরাজয় না করিয়া তাঁহাকে মারা অসম্ভব। এদিকে সূর্য অস্ত যাইতে আর অল্পই বাকি। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, 'আমি মায়াবলে সূর্যকে ঢাকিতেছি; তাহা হইলে জয়দ্রথ ভাবিবে সূর্য অস্ত গেল, এখন তোমাকে মরিতে হইবে। সুতরাং তখন আর লুকাইবার চেষ্টা করিবে না সেই অবসরে কিন্তু তাহাকে বধ করা চাই।'

এই বলিয়া কৃষ্ণ মায়াবলে সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিলে, অর্জুনের মৃত্যুকাল উপস্থিত মনে করিয়া কৌরবদের আনন্দের সীমা রহিল না। তখন জয়দ্রথ গলা উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিলেন, সূর্য যথার্থই অস্ত গিয়াছে কিনা।

অমনি কৃষ্ণ বলিলেন, 'অর্জুন, এইবেলা! ঐ দেখ জয়দ্রথ নিশ্চিন্তে গলা উঁচু করিয়া সূর্য দেখিতেছে। এইবেলা উহার মাথা কাটিয়া ফেল!'

কিন্তু জয়দ্রথের মাথা কাটা সহজ নহে। উহার জন্মকালে দেবতারা বলিয়াছিলেন যে,

যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো মহাবীর উহার মাথা কাটিবেন। তখন উহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্র বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার পুত্রের মাথা ভূমিতে ফেলিবে তাহার মাথাও তখনি শতখণ্ড হইবে।' এই বলিয়া বৃদ্ধক্ষত্র বনে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। এখনো তিনি সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছেন।

এ সকল কথা মনে করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, 'সাবধান অর্জুন, উহার মাথাটা তোমার হাতে মাটিতে পড়িলে কিন্তু সর্বনাশ! মাথাটাকে সেই সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থে, বুড়া বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে নিয়া ফেলিতে হইবে।'

তখন অর্জুন এক বাণে জয়দ্রথের মাথা কাটিয়া, তাহা মাটিতে পড়িবার পূর্বেই আর কয়েক বাণে সেটাকে উড়াইয়া সেই সমন্তপঞ্চক তীর্থে জয়দ্রথের পিতার কোলে নিয়া ফেলিলেন। সেখান হইতে উহা মাটিতে পড়িবামাত্রই বৃদ্ধক্ষত্রের মাথা ফাটিয়া শতখণ্ড হইয়া গেল।

তারপর কৃষ্ণ অন্ধকার দূর করিয়া দিল দেখা গেল যে, তখনো সূর্য একবারে ডুবিয়া যায় নাই।

জয়দ্রথের মৃত্যুতে কৃপ আর অশ্বত্থামা রাগিয়া অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অর্জুনের বাণ তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যার পরেও আর কেহ শিবিরে যায় নাই। সমস্ত রাত্রি মশাল জ্বালিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। সে রাত্রিতে দ্রোণ সাত্যকি অশ্বত্থামা ভীম ঘটোৎকচ প্রভৃতি অতি অদ্ভুত বীরত্ব দেখান, আর অর্জুনের হাতে অসংখ্য লোক মরে। সে সময়ে তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে, কর্ণের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে তাহা হয় নাই।

কর্ণ ঘোরতর যুদ্ধের পর সাত্যকির হাতে পরাজিত হইলেন। তারপর অশ্বত্থামা কৃতবর্মা প্রভৃতি অনেকেই সাত্যকিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত করিতে কাহারও শক্তি হইল না।

এদিকে দুর্যোধন যুদ্ধে কিছু করিতে না পারিয়া শেষে দ্রোণকে গালি দিতে আরম্ভ করায় দ্রোণ নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিলেন, 'দুর্যোধন, কেন আমাকে বৃথা কষ্ট দিতেছ? আমি তো সর্বদাই বলিতেছি যে, অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব। পাপ তো কম কর নাই, এখন সে পাপের ফল ভাগ কর!' এই বলিয়া তিনি বাণে বাণে পাণ্ডবদিগকে অস্থির করিয়া তুলিলেন। দুর্যোধন তখন কম তেজ দেখান নাই। হাজার হাজার লোক তাঁহার হাতে প্রাণত্যাগ করে। তারপর যুধিষ্ঠির আসিয়া তাঁহার ধনুক কাটিয়া দশ বাণে তাঁহাকে কাতর করিয়া দেন। যুধিষ্ঠির আবার বাণ মারিলে দুর্যোধন আর যুদ্ধ করিতে পারেন নাই।

দ্রোণ আর ভীমের কথা কী বলিব! দ্রোণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কেকয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ ও শিবিকে বিনাশ করিলেন। আর ভীম কিল মারিয়া কলিঙ্গরাজের পুত্র আর লাথির চোটে দুর্মদ এবং দুষ্কর্ণকে সংহার করিলেন।

ঘটোৎকচ আর অশ্বত্থামার সেই সময়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা বড়ই অদ্ভুত। রাত্রিতে রাক্ষসদের বল বাড়ে, আর রাক্ষসেরা নানারকম মায়াও জানে; তাহার উপরে আবার ঘটোৎকচ অসাধারণ বীর। সুতরাং অশ্বত্থামা যে নিতান্ত সংকটে পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কী? কিন্তু এমন সঙ্কটেও তিনি কিছুমাত্র কাতর হন নাই। ঘটোৎকচের সকল মায়া তিনি তিনবার চূর্ণ করিয়া দিলেন।

ঐ সময়ে ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জনপর্বা অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই

মারা গেলে ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার উপর ঘোরতর বাণবৃষ্টি আরম্ভ করে। সে সকল বাণ অশ্বত্থামা কাটিয়া ফেলিলে, সে এমনি এক অদ্ভুত পাহাড় আনিয়া উপস্থিত করিল যে, কী বলিব! সে পাহাড়ের ঝরনাসকল হইতে ক্রমাগত শেল শূল মুষল মুদগর প্রভৃতি অস্ত্র অশ্বত্থামার উপর পড়িতে লাগিল। পাহাড় অশ্বত্থামার বাণে চূর্ণ হইলে ঘটোৎকচ মেঘের রূপ ধরিয়া ক্রমাগত অশ্বত্থামার উপরে প্রস্তরবৃষ্টি আরম্ভ করিল। কিন্তু অশ্বত্থামার বায়ব্য অস্ত্রে সে সকল পাথরসুদ্ধ মেঘ কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার ঠিক নাই।

তখন আবার কোথা হইতে বিরাটাকার রাক্ষসগণ অশ্বত্থামাকে গিলিতে আসিল। কিন্তু অশ্বত্থামা তাহাতেও কাতর হইলেন না। রাক্ষসেরা দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল।

ইহা দেখিয়া ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে একটা বজ্র ছুড়িয়া মারে। অশ্বত্থামা সেই বজ্র লুফিয়া লইয়া উল্‌টাইয়া তাহা ঘটোৎকচকেই আবার ছুড়িয়া মারিলে তাহাতে ঘটোৎকচের ঘোড়া সারথি ধ্বজ কাটিয়া গেল। সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচের সাহায্য করিতেছিলেন, তথাপি অশ্বত্থামার বাণে সে এতই কাতর হইয়া পড়িল যে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার মৃত্যু হইল ভাবিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন।

এদিকে সোমদত্ত ও বাহ্লীকের সহিত ভীম আর সাত্যকির যুদ্ধ চলিয়াছে। সোমদত্তকে ভীম পরিঘের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলে, তাঁহার পিতা বাহ্লীক ভীমকে আক্রমণ করেন। বাহ্লীকের শক্তির ঘায় ভীম অচেতন হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মুহূর্তপরেই আবার উঠিয়া তিনি এমন এক গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে বাহ্লীকের মাথা চূর্ণ হইয়া গেল।

তারপর ভীম নাগদত্ত দৃঢ়রথ বীরবাহু প্রভৃতি দুর্যোধনের নয়টি ভাইকে মারিয়া, কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ, শকুনির ভাই শতচন্দ্র, ধৃতরাষ্ট্রের আর সাতটি শ্যালককে সংহার করিলেন।

আর এক স্থানে যুধিষ্ঠিরকে অনেক লোক মারিতে দেখিয়া দ্রোণ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির তাঁহার বায়ব্য বারুণ যাম্য আগ্নেয় ত্বাষ্ট্র সাবিত্র প্রভৃতি সকল অস্ত্র কাটিয়া শেষ করিলেন। দ্রোণের ঐন্দ্র ও প্রজাপত্য অস্ত্র যুধিষ্ঠিরের মাহেন্দ্র অস্ত্রে কাটা গেল। তখন দ্রোণ রোষভরে ব্রহ্মাস্ত্র হাতে করিলে যোদ্ধাদের আতঙ্কের সীমা রহিল না। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহাতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া নিজের ব্রহ্মাস্ত্রে দ্রোণের ব্রহ্মাস্ত্র বারণ করিলেন। কাজেই দ্রোণের আর যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করা হইল না।

এই সময় কর্ণ পাণ্ডব সৈন্যদিগকে বড়ই অস্থির করিয়া তোলেন। তাহারা তাঁহার বাণের জ্বালায় হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে থাকে। তখন অর্জুন না থাকিলে কী হইত কে জানে! অর্জুন আসিয়া কর্ণের ধনুক ঘোড়া আর সারথি কাটিয়া তাঁহাকে বাণে বাণে সজারুর প্রায় করিয়া দেন। কৃপের রথ সেখানে ছিল তাই রক্ষা, নহিলে সে যাত্রা কর্ণের প্রাণ বাঁচানোই ভার হইত!

ইহার পর ভীষণ যুদ্ধে সাত্যকির হাতে সোমদত্তের মৃত্যু হয়। যুধিষ্ঠির তখন দ্রোণের সহিত খুব যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমনকি, মুহূর্তেকের জন্য তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে বারণ করিয়া বলিলেন, 'উনি সর্বদা আপনাকে ধরিয়া লইবার চেষ্টায় আছেন, উঁহার সহিত আপনার যুদ্ধ না করাই ভালো।'

ইহার কিছু পরে কৃতবর্মার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া যুধিষ্ঠির অজ্ঞান হইয়া যান। অন্যেরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচায়।

তারপর আবার অশ্বত্থামা এবং ঘটোৎকচের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এবারেও জয় অশ্বত্থামারই হইল। দুর্যোধন এই সময় ভীমকে আক্রমণ করিয়া ক্রমাগত পাঁচবার তাঁহার ধনুক কাটিলেন। তাহাতে ভীম ধনুক ছাড়িয়া শক্তি ছুড়িয়া মারিলে, তাহাও কাটিতে ছাড়িলেন না। তখন ভীম দুর্যোধনের রথের উপরে এমনি বিশাল এক গদা ছুড়িয়া মারিলেন যে, তাহাতে রথ ঘোড়া সারথি সব চুরমার হইয়া গেল। দুর্যোধন ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে নন্দকের রথে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু ভীমের মনে হইল, বুঝি রথ আর ঘোড়ার সহিত তিনিও চূর্ণ হইয়াছেন।

এই সময় সহদেবের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হয় ; আর সহদেব দেখিতে দেখিতে তাহাতে হারিয়া যান। তখন কর্ণ ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে বধ করিতে পারিতেন, কিন্তু কুন্তীর কথা ভাবিয়া ক্ষান্ত রহিলেন।

শকুনি কিন্তু নকুলের হাতে খুবই সাজা পাইলেন। শিখণ্ডীরও কৃপের হাতে প্রায় সেইরূপ দশা হইল। তারপর দ্রোণ আর ধৃষ্টদ্যুম্নে, কর্ণ আর সাত্যকিতে, এইরূপ করিয়া কত যুদ্ধ হইল তাহার শেষ নাই। এদিকে এ সকল যুদ্ধের ভিতরেই অর্জুনের গাণ্ডীবের ভয়ংকর শব্দ ক্রমাগত দূর হইতে শোনা যাইতেছিল। তিনি যে কত লোক মারিতেছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহাকে আটকাইতে আসিয়া শকুনি আর তাঁহার পুত্র উলুক বড়ই লজ্জা পাইলেন।

ইহাতে দুর্যোধনের নিকট বকুনি খাইয়া দ্রোণ আর কর্ণ মহারোষে পাণ্ডব-সৈন্য মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বেচারারা দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। যতক্ষণ না অর্জুন আসিয়া দ্রোণ এবং কর্ণকে আক্রমণ করিলেন ততক্ষণ আর তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে সাহসই পায় নাই। খানিক পরে আবার কর্ণ এমনি ভয়ংকর হইয়া উঠিলেন যে, সৈন্যদের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের ভাবনা হইল, এখন যুদ্ধ করি, না পলায়ন করি !

অর্জুন আর সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, 'শীঘ্র কর্ণের নিকট চলুন, আজ হয় আমি উহাকে বধ করিব, না হয় ও-ই আমাকে বধ করিবে।' কিন্তু কৃষ্ণ তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'তোমাকে মারিবার জন্য কর্ণ ইন্দ্রের সেই এক-পুরুষ-ঘাতিনী শক্তি রাখিয়া দিয়াছে, অতএব এখন তোমার তাহার কাছে যাওয়া উচিত নহে। ঘটোৎকচকে পাঠাও।'

তখন অর্জুনের কথায় ঘটোৎকচ গিয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

এদিকে সেই জটাসুরের পুত্র অলম্বুষ নামক রাক্ষস আসিয়া দুর্যোধনকে বলিল, 'হেই মহারাজ্জ ! মোকে বোল্‌না, মুহি পাণ্ডববৈররকে মারকে খাই। ই লোক মোর বাপ্পাকে মারিলেক।'

দুর্যোধনের ইহাতে কোনো আপত্তি হওয়ার কথা ছিল না। সুতরাং অলম্বুষ আর ঘটোৎকচ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই রাক্ষস মিলিয়া কী অদ্ভুত যুদ্ধই করিয়াছিল ! অস্ত্র দিয়া, নখ দিয়া, দাঁত দিয়া, কিল লাথি চড় মারিয়া সাধাসিধা যুদ্ধ তো তাহারা প্রথমে করিলই, শেষে আরম্ভ হইল মায়াযুদ্ধ। একজন যেইমাত্র আগুন হইল, অমনি আর একজন হইল জল। যখন এ হইল তক্ষক, অমনি ও হইল গরুড়। এ হইল মেঘ, ও হইল ঝড়। মেঘ হইল পর্বত, ঝড় হইল বজ্র। পর্বত হইল হাতি, বজ্র হইল বাঘ। হাতি গেল সূর্য হইয়া বাঘকে পোড়াইতে, অমনি বাঘ আসিল রাহু হইয়া সূর্যকে গিলিতে।

এইরূপ অসম্ভব অদ্ভুত যুদ্ধের পর ঘটোৎকচ অলম্বুষের মাথা কাটিয়া তারপর কর্ণকে আক্রমণ করিল। দুইজনেই বীর, কাহারও তেজ কম নহে। কত বাণ ঘটোৎকচ কর্ণকে মারিল,

কত বাণ কর্ণ ঘটোৎচককে মারিলেন। দুইজনের কাঁসার কবচ ছিড়িয়া গেল। দুইজনের শরীরই রক্তে লাল হইল। শেষে কর্ণ ঘটোৎকচের ঘোড়া মারিয়া আর রথ ভাঙিয়া দিলে, সে মায়া দ্বারা এমনই বিকট চেহারা করিল যে, কী বলিব ! কর্ণ বাণ মারেন, আর সে হাঁ করিয়া গিলে। দেখিতে দেখিতে সে বুড়া আঙুলটির মতো ছোটো হইয়া যায়, আবার তখনি বিশাল পর্বতের বেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে তাহার একশতটা মাথা হইয়া গেল। তারপর সে আর সেখানে নাই, হঠাৎ পাতালে ঢুকিয়া গিয়াছে। আর মুহূর্তেকের ভিতরেই সে পাহাড় সাজিয়া শূন্যমার্গে আকাশে আসিয়া উপস্থিত। সেই পাহাড় হইতে কত শেল কত শূল কত গদা যে কর্ণের মাথায় পড়িল তাহার অন্ত নাই। তারপর আবার সে অসংখ্য বিকট রাক্ষস কোথা হইতে আনিয়া উপস্থিত করিল। এইরূপে কত মায়া যে সে দেখাইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না ; কিন্তু কর্ণ কিছুতেই কাতর হইল না।

ইহার পরে অলায়ুধ নামক একটা ভয়ংকর রাক্ষস আসিয়া ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিল। তখন ভীম ঘটোৎকচকে সাহায্য করিতে আসিলে অলায়ুধের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হইল। অলায়ুধ সেই বকের ভাই, কাজেই ভীমের উপর তাহার বড় রাগ। আর সে রাগের উপযুক্ত বলও তাহার ছিল। সুতরাং ভীমকে সে সহজে ছাড়িল না। এই সময়ে ঘটোৎকচ কর্ণকে ছাড়িয়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ না করিলে হয়ত সে ভীমকে পরাজয় করিত।

ঘটোৎকচ অনেক কষ্টে অলায়ুধকে বধ করিয়া আবার কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। খানিক যুদ্ধের পর সে কর্ণের ঘোড়া আর সারথিকে মারিয়া হঠাৎ সেখানে নাই। তারপর আবার আসিয়া সে কী ভয়ংকর মায়াযুদ্ধ সে আরম্ভ করিল, তাহা কী বলিব ! তখন অগ্নিবর্ণ মেঘসকল আকাশ হইতে ক্রমাগত বজ্র উল্কা বাণ শক্তি প্রাস মুষল পরশু খড়গ পট্টিশ তোমর পরিঘ গদ শূল শতঘ্নী পাথর প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিল। কর্ণের আর তখন এমন শক্তি হইল না যে, তাহা বারণ করেন। ইহার উপর আবার শত-শত রাক্ষস আসিয়া কৌরবদিগকে সংহার করিতে লাগিল। কর্ণ তথাপি যথাসাধ্য বাণবৃষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু হইল না। এদিকে ঘটোৎকচ শতঘ্নী মারিয়া তাঁহার ঘোড়া-কয়টিকে বধ করিয়াছে।

এমন সময় কৌরবেরা সকলে মিলিয়া কর্ণকে কহিলেন, 'আর কী দেখিতেছ? শীঘ্র ইন্দ্রের সেই এক-পুরুষ-ঘাতিনী শক্তি দিয়া এই রাক্ষসকে বধ কর!'

কর্ণ দেখিলেন যে, রাক্ষসের হাতে প্রাণ যায় ; কাজেই তখন তিনি নিরুপায় হইয়া সেই এক-পুরুষ-ঘাতিনী শক্তি হাতে লইলেন।

সে শক্তি দেখিবামাত্র ঘটোৎকচ নিজের দেহকে বিশাল পর্বতের ন্যায় বড় করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতে লাগিল। জীবজন্তুরা চিৎকার করিয়া উঠিল, ঝড় বহিল, বজ্রপাত আরম্ভ হইল ; আর সেই মহা শক্তি কর্ণের হাত হইতে ছুটিয়া গিয়া ঘটোৎকচের বুক ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বমুখে প্রস্থান করিল।

ঘটোৎকচ পড়িবার সময় এক অক্ষৌহিণী কৌরব সৈন্য তাহার সেই বিশাল শরীরের চাপে মারা গেল। তাহার মৃত্যুতে পাণ্ডবদের কিরূপ দুঃখ হইল তাহা বুঝিতেই পার। কিন্তু কৃষ্ণ ইহার মধ্যে সিংহনাদপূর্বক অর্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া সেই রথের উপরেই নাচিতে লাগিলনে।

ইহাতে অর্জুন ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন দুঃখের সময় কী জন্য আপনি এত আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন?'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'আনন্দ করিতেছি এইজন্য যে, কর্ণ সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর মারাতে তোমার বিপদ কাটিয়া গেল। ঘটোৎকচকে না মারিলে সে ঐ শক্তি দিয়া তোমাকে বধ করিত। এখন উহা তাহার হাত হইতে চলিয়া গেল, ইহার পর তুমি অনায়াসেই তাহাকে মারিতে পারিবে।'

কিন্তু ঘটোৎকচের গুণের কথা মনে করিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। জন্মাবধি সে এক মুহূর্তও নিজের সুখের দিকে না চাহিয়া পাণ্ডবদিগের কত সেবা করিয়াছে। যুধিষ্ঠির সে সকল কথা বলিতে বলিতে রাগে এবং দুঃখে অস্থির হইয়া কর্ণকে বধ করিতে চলিলেন। ভীম তো সেই অবধি কৌরবদিগকে এক ধার হইতে মারিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ পর্যন্ত ক্ষান্ত হন নাই।

এমন সময় অর্জুন সকলকে বলিলেন, 'রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর তোমরাও অন্ধকারে যুদ্ধ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছ। সুতরাং এইবেলা একটু বিশ্রাম করিয়া লও, চন্দ্র উঠিলে আবার যুদ্ধ করা যাইবে।

তাঁহার কথায় সকলে সন্তুষ্ট হইয়া, যে যেমনভাবে ছিল সেইভাবেই,—কেহ ঘোড়ায়, কেহ রথে, কেহ হাতিতে, কেহ-কেহ সেই রণস্থলের মাটির উপরেই ঘুমাইয়া পড়িল। অস্ত্রশস্ত্র যোদ্ধাদিগের হাতেই রহিল।

শেষ রাত্রিতে চাঁদ উঠিলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভোরবেলায় দ্রুপদ এবং তিনটি পৌত্রসহ বিরাট দ্রোণের হাতে মারা গেলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন শোকে অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আজ যদি আমি দ্রোণকে বধ না করি, তবে যেন আমার স্বর্গলাভ না হয়!'

এই বলিয়া তিনি ভীমের সহিত কৌরব সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তখনকার যুদ্ধ কী ঘোরতরই হইয়াছিল! দুর্যোধন ও দুঃশাসন নকুল ও সহদেবের সহিত, কর্ণ ভীমের সহিত, দ্রোণ অর্জুনের সহিত এমনই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, সকলে তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

দ্রোণ আর অর্জুনের যুদ্ধ কী আশ্চর্য! তাঁহাদের হাতেরই বা কী অদ্ভুত ক্ষমতা, রথেরই বা কী বিচিত্র গতি, আর অস্ত্রেরই বা কী চমৎকার গুণ! কত বড় বড় অস্ত্র যে দ্রোণ অর্জুনকে মারিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। অর্জুন তাহার সকলই কাটিয়া ফেলিলেন। যতই তিনি সে সব অস্ত্র কাটেন, দ্রোণ ততই আহ্লাদিত হইয়া ভাবেন,'আমি যত পরিশ্রম করিয়া উহাকে শিখাইয়াছিলাম তাহা সার্থক হইয়াছে।'

সেদিন অনেকের সহিত অনেকের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু দ্রোণ যেমন তেজের সহিত পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিয়াছিলেন পাণ্ডবেরা তেমন করিয়া কৌরব সৈন্য মারিতে পারেন নাই। দ্রোণের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

এমন সময় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, 'অর্জুন, দ্রোণের হাতে অস্ত্র থাকিতে দেবতারাও উঁহাকে মারিতে পারেন না। অতএব যাহাতে উনি অস্ত্র ছাড়েন, তাহার উপায় করিতে হইবে। কেহ গিয়া উঁহার কাছে বলুক, 'অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছেন। তাহা হইলে উনি অস্ত্র ছাড়িয়া দিবেন।'

অর্জুন এমন কাজ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কিন্তু অন্য যোদ্ধারা ইহাতে মত দিলেন, এবং অনেক কষ্টে যুধিষ্ঠিরকেও মত করানো হইল।

তখন ভীম কী করিলেন, শুন। পাণ্ডবপক্ষের ইন্দ্রবর্মার একটি হাতি ছিল, তাহার নাম 'অশ্বত্থামা'। ভীম গদাঘাতে সেই হাতিটাকে মারিয়া লজ্জিতভাবে দ্রোণের নিকট আসিয়া চিৎকারপূর্বক বলিতে লাগিলেন—'অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে! অশ্বত্থামা মরিয়া গিয়াছে!'

একথায় দ্রোণ প্রথমে কাতর হইলেন, কিন্তু তারপর মনে করিলেন যে, অশ্বত্থামা অমর,

সে কী করিয়া মরিয়া যাইবে? তারপর খানিক যুদ্ধ করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যুধিষ্ঠির, অশ্বত্থামা মরিয়াছে—একথা কি সত্য?'

দ্রোণ জানেন যে, যুধিষ্ঠির কখনি মিথ্যা কহেন না, কাজেই তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু হায়! কৃষ্ণ যে ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে কী শিখাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন না। কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'মহারাজ, আপনি এই মিথ্যাটুকু না বলিলে আমরা সকলে আজ দ্রোণের হাতে মারা যাইব। সুতরাং এইটুকু মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

ইহার উপর আবার ভীম সেই অশ্বত্থামা নামক হাতিটিকে মারিয়া 'অশ্বত্থামা মরিয়াছে' একথা বলারও সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কাজেই যুধিষ্ঠিরের আর তাহা বলিতে তত আপত্তি নাই। তবে কথা এই যে, দ্রোণ তো আর হাতির কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, তিনি তাঁহার পুত্রের কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সুতরাং, কেবল অশ্বত্থামা মরিয়াছে, একথা তাঁহাকে বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় বইকি।

যাহা হউক, যুধিষ্ঠিরের চেষ্টা যাহাতে দুই দিকই রক্ষা হয়। জয়ও লাভ করিতে হইবে, মিথ্যাও বলা হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি দ্রোণকে বলিলেন :

'অশ্বত্থামা মরিয়াছে........ হাতি'

'অশ্বত্থামা মরিয়াছে' এই কথাগুলি বলিলেন জোরে, দ্রোণ তাহাই শুনিতে পাইলেন। 'হাতি' কথাটি বলিলেন অতি মৃদুস্বরে, দ্রোণ তাহা শুনিতে পাইলেন না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রথ কখনো মাটি ছুঁইত না, সর্বদাই চারি আঙুল উপরে থাকিত। কিন্তু তিনি মিথ্যা কথা বলার পর হইতে তাহা মাটিতে নামিয়া পড়িল।

যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা শুনিয়া দ্রোণ নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, তিনি আর আগেকার মতো যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তথাপি তিনি অনেকক্ষণ যুঝিয়াছিলেন, এবং সহজে কেহ তাঁহার কিছু করিতে পারেন নাই।

এমন সময়ে ভীম আসিয়া বলিলেন, 'কীসের জন্য এত যুদ্ধ করিতেছেন? অশ্বত্থামা তো মরিয়া গিয়াছে!'

তখন দ্রোণ অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'হে মহাবীর কর্ণ, কৃপাচার্য, হে দুর্যোধন, আমি বারংবার বলিতেছি, তোমরা ভালো করিয়া যুদ্ধ কর। তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি অস্ত্র ত্যাগ করিলাম।' এই বলিয়া তিনি ভগবানের চিন্তায় মন দিলেন।

এমন সময় দেখা গেল যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন অসিহস্তে দ্রোণকে কাটিতে চলিয়াছেন। রণভূমি–সুদ্ধ লোক তাহাতে শিহরিয়া উঠিল। সকলে চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'হায় হায়! এমন কাজ করিও না! অর্জুন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে বারণ করিতে ছুটিলেন। কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হইল না। অর্জুন তাঁহাকে ধরিবার পূর্বেই তিনি তাঁহার নিষ্ঠুর কাজ শেষ করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণের মৃত্যুতে কৌরবেরা ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্যোধন পলাইলেন, কর্ণ পলাইলেন, শল্য পলাইলেন, কৃপ কাঁদিতে কাঁদিতে রণস্থল ছাড়িয়া চলিলেন। সকলেই ভাবিলেন যে, আজ বুঝি কৌরব সৈন্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

অশ্বত্থামা অন্য দিকে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি এ বিপদের কিছুই জানিতে পারেন নাই। সকলকেই পলায়ন করিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কী জন্য এমন করিয়া পলাইতেছ?'

ইহার উত্তরে যখন তাঁহাকে দ্রোণের মৃত্যুসংবাদ শুনানো হইল, তখন তিনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'আজ নিশ্চয় আমি পাণ্ডব পক্ষের সকলকে বিনাশ করিব।'

অশ্বত্থামার নিকট নারায়ণ অস্ত্র নামক একখানি অতি ভয়ানক অস্ত্র ছিল। সে অস্ত্র ছুড়িলে কাহারও সাধ্য হয় না যে, তাহাকে আটকায়। অমরই হউক আর দেবতাই হউক, সে অস্ত্র গায় পড়িলে তাহাকে মরিতেই হইবে। স্বয়ং নারায়ণ এই অস্ত্র দ্রোণকে দেন, দ্রোণের নিকট হইতে তাহা অশ্বত্থামা পান। সেই অস্ত্র তিনি এখন ধনুকে জুড়িলেন।

নারায়ণ অস্ত্র ছুড়িবামাত্র ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত এবং ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, সূর্য মলিন হইয়া গেল, চারিদিক অন্ধকারে ঘিরিয়া ফেলিল, সাগর উথলিয়া উঠিল, নদীসকলের স্রোত ফিরিয়া গেল। সেই সাংঘাতিক অস্ত্রের ভিতর হইতে আগুনের মতো অসংখ্য অস্ত্র বাহির হইয়া জ্বলিতে জ্বলিতে ঘোর গর্জনে পাণ্ডবদিগকে তাড়া করিল। তখন আর কেহই মনে করিল না যে, তাহাদের রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় আছে।

কিন্তু উপায় ছিল ; তাহা কৃষ্ণ জানিতেন। তিনি সকলকে বলিলেন, 'তোমরা শীঘ্র অস্ত্র ফেলিয়া নামিয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে এ অস্ত্র কিছুই করিতে পারিবে না।'

অমনি সকলে অস্ত্র ত্যাগ করেন, হাতি ঘোড়া রথ যিনি যাহার উপর ছিলেন তাহা হইতে নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু ভীম রোখা লোক—তিনি বলিলেন, 'অস্ত্র ছাড়িব কেন? এই গদা দিয়া আমি নারায়ণ অস্ত্রকে পিষিয়া দিব!'

বিষম বিপদ আর-কি! ভীম কিছুতেই অস্ত্র ছাড়িবেন না। নারায়ণাস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিতে গেলেন ; আর নারায়ণ অস্ত্রের ভীষণ অগ্নিও তৎক্ষণাৎ আসিয়া রথসুদ্ধ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন কৃষ্ণ আর অর্জুন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে রথ হইতে টানিয়া নামান আর তাঁহার অস্ত্র কাড়িয়া ফেলিয়া দেন, নচেৎ না জানি সেদিন কী হইত!

এইরূপে ভীম বাঁচিয়া গেলন বটে, কিন্তু জোর করিয়া নামাইবার আর অস্ত্র কাড়িয়া লইবার দরুন তাঁহার ভয়ানক রাগ হওয়াতে তিনি সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নারায়ণ অস্ত্র বৃথা হওয়ায় অশ্বত্থামা ক্রোধভরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, যুধিষ্ঠির সাত্যকি ভীম ইহাদের কেহই তাঁহার সম্মুখে টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাহার পর অর্জুন তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি মন্ত্র পড়িয়া আগ্নেয় অস্ত্র নামক এক মহা অস্ত্র তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করামাত্র অতি ভীষণ কাণ্ড আরম্ভ হইল, যেন সৃষ্টি থাকে কি যায়! এরূপ অস্ত্র আর কেহ কখনো দেখে নাই। অশ্বত্থামা মনে করিলেন যে, সেই অস্ত্রে পাণ্ডবেরা নিশ্চয় মরিবে। কিন্তু অর্জুন তাহার পরক্ষণেই ব্রহ্মাস্ত্র মারিয়া সে অস্ত্রকে দূর করিয়া দিলেন। তখন অশ্বত্থামা নিতান্ত নিরাশভাবে 'দূর হোক, সব মিথ্যা!' এই বলিতে বলিতে রণস্থল ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন।

কর্ণপর্ব

পাঁচ দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর দ্রোণ প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর কাহাকে সেনাপতি করা যায়, এ বিষয়ে পরামর্শ আরম্ভ হইল। অশ্বত্থামা বলিলেন, 'মহাবীর কর্ণ অসাধারণ যোদ্ধা, অতএব তাঁহাকে আমরা সেনাপতি করিয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করিব।'

তখন দুর্যোধন বলিলেন, 'হে কর্ণ, তোমার মতো যোদ্ধা তো আর কেহই নহে, সুতরাং তুমিই এখন আমাদের সেনাপতি হও।'

একথায় কর্ণ বলিলেন, 'মহরাজ, আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিব। এখন আমি তোমার সেনাপতি হইতেছি, সুতরাং মনে কর যেন পাণ্ডবেরা হারিয়া গিয়াছে।'

তখনি ধুমধামের সহিত কর্ণকে সেনাপতি করা হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দেখা গেল যে 'সাজ সাজ' বলিয়া সকলে যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত। কর্ণকে সেনাপতি করিয়া আবার কৌরবদিগের সাহস ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভীষ্ম আর দ্রোণ স্নেহ করিয়া পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এবারে কর্ণের হাতে আর তাঁহাদের রক্ষা নাই। সুতরাং সেদিন যুদ্ধ আরম্ভের সময় সকলেরই খুব উৎসাহ দেখা গেল।

আজ বিশাল হাতিতে চড়িয়া ভীম যুদ্ধে নামিয়াছেন। তাঁহার সহিত প্রথমে যাঁহার যুদ্ধ হইল তাঁহার নাম ক্ষেমমূর্তি ; তিনিও হাতির উপরে, এবং অসাধারণ বীরও বটে। প্রথমে যুদ্ধ অনেকটা সমানে–সমানেই চলিল ; এমন কি, ক্ষেমমূর্তিই আগে নারাচের ঘায় ভীমের হাতিকে মারিয়া ফেলিলেন। ভীম সেই হাতি পড়িবার পূর্বেই তাহা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ক্ষেমমূর্তির

হাতিকে এমন লাথি মারিলেন যে, হাতি তাহাতে চেপ্টা হইয়া মাটির ভিতর ঢুকিয়া গেল। তখন ক্ষেমমূর্তি মাটিতে নামিয়া রোষভরে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ামাত্র ভীম পদাঘাতে তাঁহার প্রাণ বাহির করিয়া দিলেন।

তারপর অশ্বত্থামার সহিত ভীমের অনেকক্ষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে শেষে দুইজনেই অজ্ঞান হইয়া যাওয়ায় সারথিরা তাঁহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করে।

এদিকে অর্জুনকে অবশিষ্ট সংশপ্তকদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে রত দেখিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং বেশ একটু জব্দও হইলেন। তখন অর্জুন আবার সংশপ্তকদিগকে আক্রমণ করা মাত্র আবার অশ্বত্থামা আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু এবারে হাতে বুকে ও মাথায় বাণের খোঁচা খাইয়া অশ্বত্থামা একটু বিশেষরূপে সাজাও পাইলেন। তাঁহার ঘোড়াগুলিরও কম দুর্দশা হইল না। ইহার উপর আবার তাহাদের রাশ কাটিয়া যাওয়াতে তাহারা অশ্বত্থামাকে লইয়া সেখান হইতে যে ছুট দিল, রণক্ষেত্রের বাহিরে না গিয়া আর থামিল না। অশ্বত্থামাও ভাবিলেন, 'ভালোই হইয়াছে!'

তারপর আর একজন অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন, তাঁহার নাম দণ্ডধার। তিনি মরিলে, আসিলেন তাঁহার ভাই দণ্ড। দণ্ড মরিলে, আবার সংশপ্তকেরা আসিল।

অপর দিকে কর্ণও পাণ্ড্যকে বধ করিয়া বিস্তর পাণ্ডব সৈন্য মারিয়াছেন। তারপর নকুলকে আক্রমণ করাতে দুইজনে যুদ্ধ চলিয়াছে। দুইজনেই দুইজনের বাণে আচ্ছন্ন, মেঘের ছায়ার ন্যায় বাণের ছায়ায় রণস্থল ঢাকিয়া গিয়াছে। এমন সময় কর্ণের বাণে নকুলের ধনুক কাটিয়া গেল ; আর তাঁহার যুঝিবার ক্ষমতা রহিল না। তখন তিনি পলায়নের আয়োজন করা–মাত্র কর্ণ আসিয়া তাঁহার গলায় ধনুকের ফাঁস লাগাইয়া দেওয়াতে বেচারার সে পথও বন্ধ হইয়া গেল। কর্ণ ইচ্ছা করিলেই তখন নকুলকে বধ করিতে পারিতেন ; কিন্তু কুন্তীর কথা মনে করিয়া কেবল এই বলিয়াই ছাড়িয়া দিলেন, 'যাও, যাও! আর বড় বড় কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিও না।'

ইহার পরে কর্ণের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া সৈন্যদের দুর্গতির একশেষ হইয়া উঠিল।

এদিকে কৃপের হাতে পড়িয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রায় শেষ দশা। অনেকে ভাবিল, তিনি বুঝি বা মারাই যান। সারথি তাঁহাকে বলিল, 'বড়ই তো বিপদ দেখিতেছি, রথ ফিরাইব নাকি?' ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন, 'আমি ঘামিয়া কাঁপিয়া আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। চল, এখন এই বামুনকে ছাড়িয়া শীঘ্র ভীম আর অর্জুনের কাছে যাই।' সারথি তাহাই করিল।

দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ অতি অদ্ভুতই হইয়াছিল। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ধনুক কাটিলেন। যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ অন্য ধনুক লইয়া দুর্যোধনের ধনুক কাটিয়া তাহার উত্তর দিলেন। যুধিষ্ঠিরের তিন বাণ দুর্যোধনের বুকে আসিয়া পড়িল, দুর্যোধন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া উল্টিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাঁচ বাণ আর একটা শক্তি মারিলেন। সেই শক্তি কাটা গেল, দুর্যোধন মারিলেন একটা ভল্ল ; তাহার উত্তরে যুধিষ্ঠিরের এক বাণ আসিয়া তাঁহার গায় বিষম বিঁধিয়া গেল। তখন দুর্যোধন বিশাল গদা হাতে যুধিষ্ঠিরকে মারিতে গিয়া তাঁহার শক্তির ভীষণ ঘায় রথের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। এমন সময় ভীম আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বারণ করিয়া বলিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি দুর্যোধনকে মারিব , সুতরাং আপনার এখন উহাকে মারা উচিত নহে।'

এ কথায় যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে ছাড়িয়া দিলেন। তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত বড়ই ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। এই সময় সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব দেখান কর্ণ আর অর্জুন। দুইজনেই অসংখ্য সৈন্য

বিনাশ করেন। বিশেষত কর্ণের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইলে, অর্জুন এমনি অসাধারণ যুদ্ধ করেন যে, কৌরবেরা তাহা দেখিয়া ভয়ে চক্ষু বুজিয়া আর্তনাদ করিতে থাকেন। তাঁহাদের ভাগ্যবলে এই সময়ে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা যুদ্ধ শেষ করিতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কর্ণ সর্বদাই বড় বড় কথা কহেন। সেদিন নাকালের একশেষ হইয়াও তিনি বলিলেন, 'অর্জুন আজ হঠাৎ অস্ত্রবৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছে। কিন্তু কাল আমি তাহাকে জব্দ করিব।'

রাত্রি প্রভাত হইলে কর্ণ দুর্যোধনকে বলিলেন, 'আজ হয় আমি অর্জুনকে মারিব, না হয় সে আমাকে মারিবে। কিন্তু আমার একজন ভালো সারথি চাই। আমার বিজয় নামক বিশ্বকর্মানির্মিত যে আশ্চর্য ধনুক আছে, তাহা অর্জুনের গাণ্ডীবের চেয়ে কম নহে। এখন কৃষ্ণের মতো একটি সারথি পাইলেই আমি পাণ্ডবদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারি।'

তারপর তিনি বলিলেন, 'শল্য যদি আমার সারথি হন, তবে নিশ্চয় অর্জুনকে বধ করিব। মহাবীর শল্য কৃষ্ণ অপেক্ষাও ভালো সারথি, আর আমি তো অর্জুনের চেয়ে বড় যোদ্ধা আছিই। সুতরাং শল্য আমার সারথি হইলে, দেবাসুরগণও আমার হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারিবেন না।'

তখন দুর্যোধন শল্যকে বলিলেন, 'মামা, আপনাকে কর্ণের সারথি হইতে হইতেছে।'

একথায় শল্য রাগে চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন, 'কী, এত বড় কথা! আমাকে বল সূতপুত্রের (সারথির ছেলের) সারথি হইতে! আমি কি তাঁহার চেয়ে কম যে, আমি তাহার সারথি হইতে যাইব? চলিলাম আমি এখান হইতে।'

ইহাতে দুর্যোধন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'রাম রাম! আপনি কেন তাহার চেয়ে কম হইতে যাইবেন! কৃষ্ণ কি অর্জুনের চেয়ে কম? আমি তো মনে করি কৃষ্ণ অর্জুনের চেয়ে বড়, আর আপনি কৃষ্ণের চেয়েও বড়।'

একথায় শল্য বলিলেন, 'তুমি যে আমাকে কৃষ্ণের চেয়ে বড় বলিলে, ইহাতে আমি বড়ই তুষ্ট হইলাম। আচ্ছা, তবে আমি কর্ণের সারথি হইব; কিন্তু আমার একটা নিয়ম থাকিবে,— আমার যাহা খুশি তাহাই আমি কর্ণকে বলিব।'

কর্ণ তাহাতেই রাজি হইয়া উঠিলেন। আর উঠিয়াই শল্যকে বলিলেন, 'রথ চালাও। আমি অর্জুনকে সংহার করিব।'

তাহাতে শল্য বলিলেন, 'সূতপুত্র, ইন্দ্রও যাঁহাকে ভয় করেন, তুমি কোন্ সাহসে তাঁহাকে অবহেলা করিতেছ? যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আর তোমার মুখে এমন কথা শোনা যাইবে না।'

কর্ণ বলিলেন, 'আজ যদি যম বরুণ কুবের এবং ইন্দ্রও বন্ধুবান্ধব লইয়া অর্জুনকে রক্ষা করিতে আসেন, তথাপি আমি তাঁহাদিগকে সুদ্ধ অর্জুনকে পরাজয় করিব।'

শল্য বলিলেন, 'তোমার ক্ষমতা খুব আছে বটে, কিন্তু কথা কও তাহার চেয়েও অনেক বেশি। তুমি কখনি অর্জুনের সমান নহ। পলায়ন না করিলে আজ তাঁহার হাতে তোমার প্রাণ যাইবে।'

কর্ণ বলিলেন, 'যখন অর্জুন আমাকে পরাজয় করিবে, তখন আসিয়া তাহার বড়াই করিও।'

তখন শল্য 'বেশ কথা, তাহাই হইবে' বলিয়া রথ চালাইয়া দিলেন।

কর্ণ পাণ্ডব সৈন্য দেখিতেই বলিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে অর্জুনকে দেখাইয়া দিবে তাহাকে গাড়ি ভরিয়া রত্ন দিব, ছয় হাতির রথ দিব, একশত গ্রাম দিব, আর কৃষ্ণ ও অর্জুনকে মারিয়া তাহাদের সকল ধন দিব।'

একথায় শল্য হাসিয়া বলিলেন, 'তোমায় হাতি-টাতি কিছুই দিতে হইবে না, অর্জুনকে অমনই দেখিতে পাইবে।'

এতক্ষণে কর্ণের রাগ হইল। তিনি বলিলেন, 'তুমি নিতান্ত মূর্খ, যুদ্ধের কিছুই জান না। তুমি চুপ কর। তোমার মতো একশত জনে আসিয়া বকিলেও আমি ভয় পাইব না।'

শল্য বলিলেন, 'তাই তো ! তোমার দেখিতেছি মাথা খারাপ হইয়াছে, চিকিৎসার দরকার।'

এইরূপে ক্রমাগত উপহাস করিয়া শল্য কর্ণের মন ভাঙিয়া দিলেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে—কর্ণের তেজ কমাইয়া দিবার জন্য পাণ্ডবদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা। যুদ্ধের সময়ও একটু সুযোগ পাইলেন, 'ঐ দেখ অর্জুন কেমন বীর,' 'তুমি উহার সঙ্গে পারিবে না', এইরূপ নানা কথা বলিয়া তিনি বেচারাকে ব্যস্ত করিয়া তোলেন।

তথাপি কর্ণ যেরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন তাহা অতি অদ্ভুত। অর্জুন যত কৌরব সৈন্য মারিলেন, কর্ণ তাহা অপেক্ষা কম পাণ্ডব সৈন্য মারিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি ভীম সহদেব শিখণ্ডী যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইঁহারা সকলেই তাঁহার নিকট হটিয়া গেলেন।

যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের বাণে কর্ণ একবার অজ্ঞান হইয়া যান, কিন্তু শীঘ্রই আবার উঠিয়া বসিয়া যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বরক্ষক দুইটিকে মারিয়া ফেলিলেন। তারপর যাট বাণে তাঁহাকে কাতর করিয়া কর্ণ সিংহনাদ করিতেছেন, এমন সময় সাত্যকি চেকিতান যুযুৎসু ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অনেক যোদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলেন। তথাপি কর্ণ কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। তাঁহার বাণে চারিদিক কাটিয়া ছারখার হইয়া যাইতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরের ধনুক আর বর্ম কাটিয়া তিনি তাঁহাকে এমনি সংকটে ফেলিলেন যে কী বলিব ! যুধিষ্ঠির এমন শক্তি ছুড়িয়া মারিলেন, কর্ণের বাণে তাহাও দুই খণ্ড হইয়া গেল। তারপর যুধিষ্ঠির চারিটা তোমর মারিয়া কাতর করিলেন বটে, কিন্তু কর্ণ তথাপি তাঁহার ধ্বজ তূণ রথাদি নাশপূর্বক তাঁহাকে বাণাঘাতে ব্যাকুল করিতে ছাড়িলেন না। তখন যুধিষ্ঠির অন্য রথে চড়িয়া পলায়নের আয়োজন করিলে কর্ণ অমনি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার কাঁধে হাত দিলেন।

এমন সময় শল্য বলিলেন, 'কর কী সূতপুত্র? উঁহাকে ধরিলেই উনি তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন।'

যাহা হউক, কুন্তীর কথা কর্ণের মনে ছিল। তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের কোনো অনিষ্ট করিলেন না, কেবল কিছু গালি দিয়াই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যুধিষ্ঠিরকে হারিতে দেখিয়া কৌরবরা তাঁহার সৈন্য মারিয়া শেষ করিতে লাগিল, আর ভীম ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণের হাতে তাহার শাস্তিও পাইল ভালোমতোই। দুর্যোধন চিৎকারপূর্বক তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, 'তোমরা পলায়ন করিও না, পলায়ন করিও না।' কিন্তু তাঁহার কথা কে শুনে !

ইহা দেখিয়া কর্ণ শল্যকে বলিলেন, 'শীঘ্র ভীমের নিকট রথ লইয়া চল।'

ভীম তখন কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সিংহনাদপূর্বক সেইদিকেই আসিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া শল্য কর্ণকে বলিলেন, 'ঐ দেখ, ভীম আসিতেছে। আজ সে তাহার বহুদিনের রাগ তোমার উপর ঝাড়িবে !'

তারপর ভীমের আর কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে ভীম কর্ণকে এমনি ভয়ংকর বাণ ছুড়িয়া মারিলেন যে, তাহা পর্বতে লাগিলে পর্বতও ফাটিয়া যাইত। সে বাণ

খাইয়া আর কর্ণকে যুদ্ধ করিতে হইল না। তিনি তখনি চিৎ হইয়া রথের ভিতরে অজ্ঞান হওয়ায় শল্য তাঁহাকে সেখান হইতে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন।

কর্ণের পরাভাব দেখিয়া দুর্যোধন তাঁহার ভাইদিগকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। তখন বেচারাদের যে দুর্দশা! যুদ্ধ ভালো করিয়া আরম্ভ হইতে–না–হইতেই তাহাদের ছয়জন মরিয়া গেল। আর সকলে তখন ভাবিল বুঝি যম আসিয়াছে। কাজেই তাহারা উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

তখন আবার কর্ণ আসিয়া ভীমকে আক্রমণ করাতে, ভীম এক বিশিকের ঘায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া দিলেন। কর্ণ তথাপি তাহাতে কাতর না হইয়া ভীমের ধনুক আর রথ চূর্ণ করিলেন। তাহাতে ভীম মহারাষে গদা লইয়া এমনি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, কৌরবদিগের সাত শত হাতি দেখিতে দেখিতে ঘণ্ট হইয়া গেল। তখন আর কৌরবদের পলায়ন ভিন্ন কথা নাই।

এদিকে কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে সামনে পাইয়া তাঁহাকে এমনই তাড়া করিয়াছেন যে, তিনি পালাইবার পথ পান না। তাহাতে ভীম ছুটিয়া আসিয়া আবার কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। ততক্ষণে কৃপ অশ্বত্থামা কৃতবর্মা প্রভৃতি বীরগণও সেখানে উপস্থিত হইলেন ; অনেকক্ষণ সাংঘাতিক যুদ্ধ চলিল।

অর্জুন তখন সংশপ্তক ও নারায়ণী সৈন্য প্রভৃতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধে ব্যস্ত। উহাদের মধ্যে সুশর্মা অর্জুনের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করেন ; এমনকি, একবার তাঁহাকে অজ্ঞান করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র মারিয়া তাঁহাদের সকলকেই জব্দ করিয়া দিলেন।

অশ্বত্থামা আর যুধিষ্ঠিরের অনেকক্ষণ খুব যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সাত্যকি মাঝে মাঝে যুধিষ্ঠিরের সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামার বাণে যুধিষ্ঠির ক্রমে এমনই আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন যে, তখন আর তাঁহার সেখান হইতে প্রস্থান করা ভিন্ন উপায় রহিল না।

অশ্বত্থামা সেদিন অর্জুনের সঙ্গেও কম যুদ্ধ করেন নাই। এমনকি তাঁহার তেজে অর্জুনকে কাতর হইতে হয়। তখন কৃষ্ণ আশ্চর্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ কেন তোমার তেজ কমিয়া গেল? গাণ্ডীব কি তোমার হাতে নাই? না কি হাতে লাগিয়াছে?'

যাহা হউক, এরূপভাবে অনেকক্ষণ যায় নাই। শেষে অশ্বত্থামাকে নিতান্তই নাকাল হইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে হয়।

ইহার পরে অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ ঘোড়া সারথি প্রভৃতি মুহূর্তের মধ্যে চূর্ণ হইয়া গেল। তারপর তাঁহাকে খালি হাতে পাইয়া অশ্বত্থামা বাণে তাঁহাকে ক্ষত–বিক্ষত করিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহাকে বধ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ছুটিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, 'ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের কী দুর্দশা!' অর্জুন অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রাণরক্ষা করিলেন।

এই সময় কর্ণ প্রভৃতি বীরেরা যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার চেষ্টায় তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কর্ণের বাণে নিতান্ত ক্লেশ পাইয়াও যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ এমনি তেজের সহিত যুদ্ধ করেন যে, তাহাতে কৌরব দলে হাহাকার উপস্থিত হয়। কিন্তু শেষকালে কর্ণের বাণ একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠাতে তিনি সারথিকে বলিলেন, 'শীঘ্র এখান হইতে রথ লইয়া চল।' তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা 'ধর–ধর' বলিয়া তাঁহার পিছুপিছু তাড়া করিল। কিন্তু পাণ্ডব সৈন্যেরা ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে এমনই শিক্ষা দিল যে, আর তাহারা বেয়াদবি করিতে সাহস পাইল না।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির বাণাঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া নকুল ও সহদেবের সঙ্গে ধীরে ধীরে

শিবিরে চলিয়াছেন, ইতিমধ্যে আবার কর্ণ আসিয়া তাঁহার গায় বাণ মারিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তিনজনে মিলিয়া কর্ণকে কিছুতেই বারণ করিতে পারিলেন না। কর্ণের বাণে যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া আর পাগড়ি, নকুলের ঘোড়া রাশ ধনুক দেখিতে দেখিতে কাটা গেল। সর্বনাশের আর অধিক বাকি নাই ; এমন সময়ে শল্য কর্ণকে বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরকে লইয়া ব্যস্ত হইয়াছ, অর্জুনের সহিত কখন যুদ্ধ করিবে? ইহাকে মারিয়া ফল কী? আগে অর্জুনকে মার। আর ঐ দেখ, দুর্যোধন ভীমের হাতে পড়িয়াছেন, ইহাদিগকে ছাড়িয়া আগে তাঁহাকে বাঁচাও।'

একথায় কর্ণ তাড়াতাড়ি দুর্যোধনকে সাহায্য করিতে গেলেন, যুধিষ্ঠিরও রক্ষা পাইলেন। আঘাতের যাতনায় তিনি এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, শিবিরে আসিয়াই তাঁহাকে শয়ন করিতে হইল।

এদিকে আবার অশ্বত্থামা আর অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবারেও অশ্বত্থামার তেজের কোনো অভাব নাই ; কিন্তু তাঁহার সারথি হত আর ঘোড়া ক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি একটু বিপদে পড়িয়াছেন। ঘোড়াগুলি অর্জুনের বাণে অস্থির হইয়া রথ-রথী সবসুদ্ধ রণস্থল হইতে ছুট দিল। তারপর পাণ্ডব যোদ্ধাগণের তাড়া খাইয়া কৌরবদিগের সৈন্যগুলিও পলায়ন করিতে পারিলে বাঁচে।

তখন দুর্যোধন কর্ণকে বিনয়পূর্বক বলিলেন, 'ঐ দেখ, তুমি থাকিতেই সৈন্যগুলি পলায়ন করিতেছে, আর তাহারা তোমাকেই ডাকিতেছে।'

একথায় কর্ণ তাঁহার বিজয় নামক বিশ্বকর্মানির্মিত সেই আশ্চর্য পুরাতন ধনুকে ভার্গব অস্ত্র জুড়িয়া নিক্ষেপ করিলে, পাণ্ডব সৈন্যদের আর দুর্দশার অবধি রহিল না। তখন তাহারা দাবানলভীত জন্তুর ন্যায় চেঁচাইতে লাগিল। সেই চিৎকার শুনিয়া অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন, 'ঐ দেখুন ভার্গবাস্ত্রে সৈন্যগণের কী দুর্দশা হইতেছে! শীঘ্র কর্ণের নিকট রথ লইয়া চলুন।'

কিন্তু কৃষ্ণ ভাবিলেন যে, কর্ণ আরো খানিক যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলে অর্জুন সহজেই তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেন। কাজেই তিনি কর্ণের দিকে না গিয়া অর্জুনকে বলিলেন, 'মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের বাণে বড়ই কাতর হইয়াছেন। আগে তাঁহাকে শান্ত করিয়া তারপর কর্ণকে মারা যাইবে।'

তখন তাঁহারা তাড়াতাড়ি শিবিরের দিকে আসিতেছেন, এমন সময় আশ্বত্থামা আসিয়া রোষে অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। যাহা হউক, অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিতে অনেক সময় লাগিল না। তারপর ভীমের হাতে কৌরবদিগকে নিবারণের ভার দিয়া তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে গেলেন।

সেখানে অনেক কথাবার্তার পর তথা হইতে চলিয়া আসিবার সময় অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আজ হয় আমি কর্ণকে মারিব, না হয় কর্ণ আমাকে মারিবে।'

এদিকে ভীম সেই অবধি আর এক মুহূর্তের জন্যও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই। আজিকার যুদ্ধে তাঁহার বড়ই আনন্দবোধ হইতেছে। তিনি সারথি বিশোককে ডাকিয়া বলিলেন, 'বিশোক, আমার বড়ই উৎসাহ হইতেছে ; এখন আর কোন রথটা স্বপক্ষের, কোনটা বিপক্ষের তাহা বুঝিতেছি না। একটু সতর্ক থাকিও, যেন শত্রুবোধে মিত্রকে মারিয়া না বসি। আজ প্রাণ ভরিয়া শত্রু মারিব! দেখ তো, অস্ত্রশস্ত্র কী পরিমাণ আছে!'

বিশোক বলিল, 'এখনো দশ হাজার শর, দশ হাজার ক্ষুর, দশ হাজার ভল্ল, দু-হাজার নারাচ, তিন হাজার প্রদর আর অসংখ্য গদা অসি মুদগর শক্তি ও তোমর রহিয়াছে। আপনি

নিশ্চিন্তে যুদ্ধ করুন, অস্ত্র ফুরাইবার কোনো ভয় নাই!'

এই সময় অর্জুন কৌরব সৈন্য ছারখার করিয়া অতি ভয়ংকর যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই যুদ্ধের ঘোরতর শব্দ ভীমের নিকট আসিয়া পৌছিলে তিনি যারপরনাই উৎসাহ পাইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে কৌরবদিগকে একেবারে পিষিয়া দিতে লাগিলেন। তখন আর কেহই তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না।

অন্যদিকে কর্ণও পাণ্ডব সৈন্যদিগকে মারিয়া আর কিছু রাখেন নাই। তাহারা তখন ভয়ে এমনি হইয়াছে যে, আর যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদের হাত উঠে না।

বাস্তবিক তখন দুই পক্ষে কত লোক যে মরিয়াছিল তাহার সংখ্যা করে কাহার সাধ্য! দুই পক্ষের প্রায় প্রত্যেক বড় বীর সে সময়ে হাজার সৈন্য বিনাস করিয়াছিলেন।

ইহার মধ্যে একবার দুঃশাসন ভীমকে আক্রমণ করেন। ইহাতে প্রথমেই ভীমের বাণে তাঁহার ধনুক আর ধ্বজা কাটা যায়, নিজের কপালেও একটি বাণ বিঁধে। তারপর এক বাণ আসিয়া তাঁহার সারথির মাথা কাটিয়া ফেলে। তখন দুঃশাসন তাড়াতাড়ি অন্য ধনুক লইয়া ভীমকে বারটি বাণ মারেন, এবং নিজ হাতে ঘোড়ার রাশ ধরিয়া এক ভীষণ বাণে তাঁহাকে অজ্ঞান করিতে ছাড়েন নাই। ইহার উপর আবার তিনি এক বাণে ভীমের ধনুক কাটিয়া তাঁহার সারথিকে নয়টি এবং তাঁহাকে বহুতর বাণ মারাতে ভীম রাগের ভরে তাঁহাকে একটা শক্তি ছুড়িয়া মারেন।

দুঃশাসন আকর্ণ (কান অবধি, অর্থাৎ যথাসাধ্য) ধনুক টানিয়া, দশ বাণে সেই জ্বলন্ত উল্কাবৎ শক্তি খণ্ড-খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি বাণে বাণে জর্জরিত করিতে থাকিলে ভীম তাহাতে বিষম ক্রোধভরে বলিলেন, 'তুমি তো আমাকে খুবই মারিলে, এখন আমার এই গদাটিকে সামলাও দেখি!' বলিতে বলিতে তিনি এক বিশাল গদা দুঃশাসনকে ছুড়িয়া মারিলেন। দুঃশাসন ভীমকে একটা শক্তি মারিলেন বটে, কিন্তু তাহা অর্ধপথে গদায় ঠেকিয়া খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল। তারপর সেই দারুণ গদা দুঃশাসনের রথ আর সারথিকে চূর্ণ করিয়া তাঁহার মাথায় পড়িলে তিনি তাহার আঘাতে দশ ধনু দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

এই অবস্থায় দুঃশাসনকে যাতনায় ছটফট করিতে দেখিয়া ভীমের সেই পুরাতন প্রতিজ্ঞার কথা মনে হইল। এই দুরাত্মাই দ্রোপদীকে সেই সভায় ধরিয়া আনিয়া অপমান করিয়াছিল। তখন ভীম বলিয়াছিলেন, 'আমি ইহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব।'

সেই প্রতিজ্ঞার কথা মনে হওয়ামাত্র ভীম কর্ণ দুর্যোধন কৃপ অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আজ আমি এই পাপাত্মা দুঃশাসনকে বধ করিব। তোমাদের সাধ্য থাকে তো ইহাকে রক্ষা কর!' তারপর তিনি ঝড়ের ন্যায় আসিয়া দুঃশানকে পদতলে পেষণ পূর্বক তাঁহার বুকে তলোয়ার বসাইয়া দিলেন। সেই তলোয়ারের ঘায় দুঃশাসনের গরম রক্ত সবেগে বাহির হওয়ামাত্র ভীম তাহা মহানন্দে পান করিয়া বলিলেন, 'আহা, কী মিষ্ট! দধি দুগ্ধ বা ঘৃত পানেও আমি এত সুখী হই নাই!'

ভীমকে দুঃশাসনের রক্ত খাইতে দেখিয়া সৈন্যরা 'বাবা রে, রাক্ষস রে। বলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলাইতে লাগিল। এদিকে ভীম তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালনপূর্বক দুঃশাসনের মাথা কাটিয়া বলিলেন, 'অতঃপর দুর্যোধন পশুকে মারিয়া পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে!'

এই সময়ে দুর্যোধনের দশ ভাই রোষভরে ভীমকে আক্রমণ করাতে ভীম দশ ভল্লে সেই দশজনকে সংহার করিলেন। এ সকল কাণ্ড দেখিয়া আর ভীমের তখনকার সিংহনাদ শুনিয়া

অন্যেরা তো পলায়ন করিতেই পারে, নিজে কর্ণও ভয়ে আড়ষ্ট, তাঁহার মুখে কথা সরে না। তখন শল্য তাঁহাকে বলিলেন, 'এখন ওরূপ হইলে চলিবে না, তোমার কাজ কর।'

কিন্তু কর্ণের পুত্র বৃষসেন এই সময়ে খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণে নকুলের ধনুক রথ খড়্গ প্রভৃতি কাটা গিয়া সম্পক্ষণের ভিতরেই নিতান্ত সঙ্কট উপস্থিত হইল। ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ প্রভৃতিও তাঁহার বাণে অক্ষত রহিলেন না। এইরূপে অর্জুনের সহিত তাঁর যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়াতে অর্জুন কর্ণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা সকলে মিলিয়া অভিমন্যুকে মারিয়াছিলে। আমি তোমাদের সম্মুখেই বৃষসেনকে মারিতেছি, ক্ষমতা থাকে তো রক্ষা কর।'

তারপর অর্জুন হাসিতে হাসিতে দশ বাণে বৃষসেনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া আর চারিটি ক্ষুরে তাঁহার ধনুক, দুটি হাত আর মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। ইহাতে কর্ণের প্রাণে কিরূপ লাগিয়াছিল, বুঝিতেই পার। ইহার পরেও কি আর তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? কাজেই তখন অর্জুনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এ সময়ে অশ্বত্থামা দুর্যোধনের দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আর কেন? আর পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, যুদ্ধের মুখে ছাই। আমাদের সকলেই মরিয়া গিয়াছেন, কয়েকজন মাত্র বাঁচিয়া আছি। এখনো যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হও, নহিলে নিশ্চয়ই মারা যাইবে।' কিন্তু দুর্যোধন সেই উপকারী বন্ধুর কথায় কান দিলেন না। তিনি বলিলেন, 'অর্জুন বড় ক্লান্ত হইয়াছে, কর্ণ এখনি তাহাকে বধ করিবেন।'

এদিকে কর্ণ আর অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। যোদ্ধারা সিংহনাদ করিয়া আর চাদর উড়াইয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন।

এমন যুদ্ধ কী সচরাচর হয়! তাই আজ দেবতারা অবধি আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তামাশা দেখিতে আসিয়াছেন।

বাণ, বাণ! কেবলই বাণের পর বাণ! অর্জুন মারেন, কর্ণ কাটেন ; কর্ণ মারেন, অর্জুন কাটেন। অর্জুনের এক বাণে পৃথিবী সূর্য অবধি জ্বলিয়া উঠিল। যোদ্ধাদের কাপড়ে আগুন। বেচারারা বুঝি পালাইবার পূর্বেই মারা যায়! উহার নাম আগ্নেয় অস্ত্র। উঃ! কী ঘোরতর হড়্ হড়্ ধক্ ধক্ শব্দ! গেল বুঝি সব!

ঐ দেখ, কর্ণ বরুণাস্ত্র ছুঁড়িয়াছেন। ঐ কালো কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গেল। কী ঘোরতর অন্ধকার! কী ভয়ানক বৃষ্টি! সৃষ্টি বুঝি লয় হয়!

অমনি দেখ, কী ভীষণ ঝড় বহিল! মেঘ বৃষ্টি উড়াইয়া নিল ; সৃষ্টি বাঁচিল। অর্জুন বায়ব্য অস্ত্র মারিয়াছেন, তাহাতেই এত ঝড়।

আর একটা অস্ত্র আরো ভীষণ। ইহা অর্জুন ইন্দ্রের নিকট পাইয়াছিলেন। অস্ত্রের অদ্ভুত গুণে গাণ্ডীব হইতে কত ক্ষুরপ্র, কত নালীক, কত অঞ্জলীক, কত নারাচ, কত অর্ধচন্দ্রই বাহির হইতেছে। এবারে বুঝি আর কর্ণের রক্ষা নাই!

কিন্তু কর্ণ মরিলেন না। তিনি ভার্গবাস্ত্রে অর্জুনের সকল অস্ত্র দূর করিলেন। আর লোকও মারিলেন কতই! কর্ণের কী অসীম তেজ! কৃষ্ণ আর অর্জুনকে তিনি কী ব্যস্তই করিলেন! তখন ভীম ক্রোধভরে বলিলেন, 'ও কী অর্জুন? মন দিয়া যুদ্ধ কর!'

কৃষ্ণ বলিলেন, 'অর্জুন, তোমার উৎসাহ দেখিতেছি না কেন?'

তাহাতে অর্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারিলে কর্ণ তাহা কাটিতে ছাড়িলেন না। কিন্তু ইহার পর অর্জুন যে

আর একটা ব্রহ্মাস্ত্র মারিলেন, সে বড়ই ভয়ানক। কত যোদ্ধাই তাহাতে মরিল। কিন্তু তথাপি বাণক্ষেপে ত্রুটি নাই; বৃষ্টিধারার মতো তাঁহার বাণ পড়িতেছে।

তখন অর্জুনের আঠারটি বাণ ছুটিয়া চলিল। তাহার তিনটি বিঁধিল কর্ণের গায় ; একটিতে কাটিল তাঁহার ধ্বজ, আর চারিটা খাইলেন শল্য। বাকি দশটিতে রাজপুত্র সভাপতির মাথাটি কাটা গেল। বাণের আর অন্তই নাই ; হাতি রথী পদাতি সবই বুঝি কাটিয়া শেষ হয়! এবারে কর্ণ কাবু হইবেন। কিন্তু হায়! অর্জুনের ধনুকের গুণ যে ছিঁড়িয়া গেল! এখন উপায়? কর্ণ সুযোগ পাইয়া কত বাণই মারিতেছেন। কৃষ্ণকে ষাট, অর্জুনকে আট, ভীমকেও অনেক, সৈন্যগুলিকে তো অসংখ্য। সর্বনাশ হইল বুঝি। দেখ, কৌরবদের কত আনন্দ!

যাহা হউক, ঐ অর্জুনের ধনুকে আবার গুণ চড়িল। কর্ণের বাণের আর সে তেজ নাই, এখন অর্জুনের বাণেই আকাশ অন্ধকার। কর্ণের গায় উনিশ বাণ পড়িল, শল্যের গায় দশটি বিঁধিল। কর্ণ রক্তে লাল হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি তিনি অর্জুনকে তিন বাণ, আর কৃষ্ণকে পাঁচ বাণ মারিতে ছাড়েন নাই। ঐ পাঁচটি বাণ পাঁচটি মহা সর্প। কৃষ্ণকে বিঁধিয়া উহারা আবার কর্ণের নিকট ফিরিয়া যাইতে যাইতে, মধ্যপথে অর্জুনের ভল্লে খণ্ড-খণ্ড হইল। অর্জুনের আর দশ বাণে কর্ণের কী দশা হইয়াছে, দেখ। অর্জুনের কী অতুল বিক্রম, কী ভীষণ বাণবৃষ্টি। আকাশ আঁধার হইল ; কর্ণের রথ কাটিয়া গেল। তাঁহার সঙ্গে একটি রক্ষকও বাঁচিয়া নাই। অপর কৌরবেরা অর্জুনের ভয়ে তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে। কৌরবদের মধ্যে কেবল কর্ণ ভয় পান নাই ; তিনি অর্জুনের সামনেই বাণবৃষ্টি করিতেছেন। এমন সময় কোথা হইতে ঐ সাপটা আসিয়া কর্ণের তূণের ভিতর ঢুকিল? এই সেই অশ্বসেন, খাণ্ডবদাহের সময় যে অনেক কষ্টে পাতালে ঢুকিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। সেই রাগে সে আজ কর্ণের বাণের ভিতরে ঢুকিয়া অর্জুনকে বধ করিতে আসিয়াছে। কর্ণ ইহার কিছুই জানেন না। অশ্বসেন যে বানের ভিতরে ঢুকিয়াছে, তাহারও চেহারা সাপের মতো। কর্ণ অর্জুনকে মারিবার জন্য এই বাণ বহুকাল যাবৎ পরম যত্নে চন্দনচূর্ণের ভিতর রাখিয়াছিলেন।

এখন অর্জুনকে কিছুতেই আঁটিতে না পারিয়া কর্ণ সেই দারুণ বাণ ধনুকে জুড়িয়া বসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে উল্কাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, আকাশে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। এ বাণ লাগিলে আর অর্জুনের রক্ষা নাই, ইহাকে আটকাইবার ক্ষমতাও কিছুরই নাই। তাই বাণ ছুঁড়িবার সময় কর্ণ বলিলেন, 'অর্জুন, এইবারে তুমি গেলে!'

উঃ! কী ভয়ানক বাণ! সর্বনাশ হয় বুঝি! এমন সময় কৃষ্ণ হঠাৎ পায় চাপিয়া অর্জুনের রথখানিকে মাটির ভিতর বসাইয়া দিলেন ; ঘোড়াগুলি হাঁটু গাড়িয়া বসিল। আর কর্নের বাণ অর্জুনের গায়ে পড়িতে পারিল না ; তাঁহার সেই ইন্দ্রদত্ত আশ্চর্য মুকুটখানি গুঁড়া করিয়া দিল। অর্জুন বাঁচিয়া গিয়া সাদা পাগড়ি বাঁধিয়া লইলেন।

সাপের বাছা ঠকিয়া গিয়া বড়ই চটিল। সে কর্ণকে গিয়া বলিল, 'কর্ণ, তুমি আমাকে না দেখিয়াই বাণ মারিয়াছিলে, তাই অর্জুনের মাথা কাটিতে পারি নাই। এবারে আমাকে দেখিয়া বাণ মার, নিশ্চয় উহাকে বধ করিব।'

কিন্তু কর্ণ বড় অহংকারী লোক, তিনি অন্যের সাহায্য লইতে প্রস্তুত নহেন। কাজেই দুষ্ট সাপ নিরাশ মনে ফিরিয়া চলিল। কিন্তু কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়া সে কোথায় যাইবে? তিনি অমনি

অর্জুনকে তাহার কথা বলিয়া দিলেন, আর দেখিতে দেখিতে দুষ্ট সাপ খণ্ড-খণ্ড হইয়া গেল।

ততক্ষণে কৃষ্ণও রথখানিকে তুলিয়া লইয়াছেন, আর কী ভয়ানক যুদ্ধই চলিয়াছে! কৃষ্ণকে বারটি, আর অর্জুনকে নব্বইটি, বাণ মারিয়া কর্ণের আনন্দের সীমা নাই। অর্জুন তাহা সহিবেন কেন? তিনি কর্ণকে তেমনি শিক্ষা দিলেন। ঐ কর্ণের মুকুট আর কুণ্ডল উড়িয়া গেল। ঐ তাঁহার বর্ম ছিন্নভিন্ন হইল। আহা, এখন না জানি ঐ দারুণ বাণগুলি তাঁহার গায় কিরূপ বিঁধিতেছে! রক্তে শরীর ভাসিয়া গেল! ঐ তাঁহার বুকে ভীষণ বাণ ফুটিল, আর তাঁহার জ্ঞান নাই। তখন আর অর্জুনের উদার হৃদয় তাঁহাকে বাণ মারিতে চাহিল না; সেজন্য কৃষ্ণ তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন।

কর্ণের জ্ঞান হইলে আবার যুদ্ধ চলিল। কিন্তু এবারে বুঝি আর তাঁহার রক্ষা নাই। ঐ তাঁহার রথের চাকা বসিয়া গেল। আহা! এই বিপদের সময় আবার বেচারা তাঁহার সেই পরশুরামের দেওয়া বড় বড় অস্ত্রের কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন।

নিজেরই পাপের ফল! পরশুরামকে ফাঁকি দিয়া তিনি তাঁহার নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিখিতে গেলেন; বলিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ।' পরশুরাম যথার্থই ব্রাহ্মণ বোধে তাঁহাকে অশেষ অস্ত্রশস্ত্র দিয়া বিধিমতে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন। তারপর একদিন দেখেন কি যে, এ ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয়। কাজেই তখন তিনি শাপ দিলেন, 'মৃত্যুকালে তুই সকল ভুলিয়া যাইবি।'

তারপর আর একবার দৈবাৎ এক ব্রাহ্মণের বাছুর মারিয়া ফেলাতে সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে শাপ দেন, 'যুদ্ধের কালে যখন তোর বড়ই আতঙ্ক হইবে, ঠিক সেই সময় তোর রথের চাকা বসিয়া যাইবে।'

সেই সকল পুরাতন পাপের শাস্তি আজ আসিয়া একসঙ্গে উপস্থিত হইল। আহা! ঐ দেখ, তিনি হাত ছুঁড়িয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু বীরের তেজ নাকি বিপদেও লোপ পায় না, তাই এখনো তিনি অর্জুনের সহিত ঘোর যুদ্ধে মত্ত। ইহার মধ্যেও কৃষ্ণের হাতে তিন আর অর্জুনকে সাত বাণ মারিতে ছাড়েন নাই। তাহাতে অর্জুনের বাণ খাইয়া এবার মন্ত্র পড়িয়া ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। অর্জুন ইন্দ্রাস্ত্র মারিয়া তাহাও আটকাইয়াছেন। তারপর আবার অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি অশেষ বাণে জর্জরিত হইয়াও, না জানি কিরূপে কর্ণ তাঁহার ধনুকের গুণ কাটিলেন। অর্জুন তৎক্ষণাৎ নূতন গুণ পরাইয়াও তাঁহাকে আঁটিতে না পারায় কৃষ্ণ তাঁহাকে আরো বড় বড় অস্ত্র মারিতে বলিতেছেন।

হঠাৎ কর্ণের রথের চাকা আরো অনেক বসিয়া গেল। বেচারা তাহা উঠাইবার জন্য প্রাণপণে কী টানাটানিই করিতেছেন! পৃথিবী তাহাতে চার আঙুল উঁচু হইয়া গেল, কিন্তু চাকা যে কিছুতেই উঠিতেছে না! এইবার কর্ণের চোখে জল আসিল। তিনি অর্জুনকে বলিলেন, 'অর্জুন, তুমি বড়ই ধার্মিক আর মহাশয় লোক। একটু অপেক্ষা কর, আমার রথের চাকাটা তুলিয়া লই।'

তাহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, 'সূতপুত্র, বড় ভাগ্য যে, এখন তোমার ধর্মের কথা মনে হইয়াছে! কিন্তু যখন ভীমকে বিষ খাওয়াইবার পরামর্শ দিয়াছিলে, দ্রৌপদীকে সভায় আনিয়া অপমান করিয়াছিলে, ছলপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে পাশায় হারাইয়াছিলে, জতুগৃহে পাণ্ডবদিগকে পোড়াইতে গিয়াছিলে, আর সকলে মিলিয়া বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এখন ধর্ম ধর্ম করিয়া তালু ফাটাইলেও আর তোমার রক্ষা নাই?'

এ কথায় কর্ণ আর কী উত্তর দিবেন! তাই লজ্জায় কর্ণের মাথা হেঁট হইল। বিষম রাগে ব্রাহ্ম

আগ্নেয় বায়ব্যাদি অস্ত্র বর্ষণপূর্বক তিনি আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অচিরে ভীষণ একটা অস্ত্রে অর্জুনকে অজ্ঞান করিয়া ব্যস্তভাবে রথ হইতে নামিলেন—যদি এই অবসরে তাহার চাকা আবার উঠানো যায়। কিন্তু হায় ! চাকা কিছুতেই উঠিল না।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, 'এইবেলা কর্ণকে মার ! উহাকে রথে উঠিতে দিও না।' সে কথায় অর্জুন অঞ্জলীক নামক ভীষণ অস্ত্র গাণ্ডীবে জুড়িবামাত্র ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল ; আর দেখিতে দেখিতে সেই মহাস্ত্র ঘোর গর্জনে প্রচণ্ড তেজে ছুটিয়া গিয়া কর্ণের মাথা কাটিয়া ফেলিল। তখন সকলে অবাক হইয়া দেখিলেন, কর্ণের দেহ হইতে অপরূপ দীপ্তি নির্গত হইয়া সূর্যের সহিত মিলিয়া যাইতেছে।

আর আজ পাণ্ডবদের আনন্দের সীমা নাই। ভীম সিংহনাদপূর্বক নৃত্য করিতেছেন ; আর সকলে শঙ্খ বাজাইয়া জয় ঘোষণায় মত্ত। বেচারা কৌরবগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়নের পথও পাইতেছে না। এমন সময় সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল ; দুর্যোধন 'হা কর্ণ ! হা কর্ণ !' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিবিরে চলিলেন।

আজ সঞ্জয়ের মুখে এই সংবাদ শুনিবামাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ভীষ্ম দ্রোণের মৃত্যু-সংবাদেও তিনি এত ক্লেশ পান নাই।

শল্যপর্ব

কর্ণের মৃত্যুতেও দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন না। তাঁহার পক্ষের বীরগণেরও বিলক্ষণ রণোৎসাহ দেখা গেল। সুতরাং সকলে শল্যকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সে রাত্রে আর তাঁহারা শিবিরে থাকেন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রায় দুই যোজন দূরে সরস্বতী নদীতীরে হিমালয়প্রস্থ নামক স্থানে তাঁহারা রাত্রি কাটাইয়াছিলেন।

পরদিন নূতন সেনাপতি শল্য অসাধারণ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। আজ এই নিয়ম হইল যে, তাঁহাদের কেহই একাকী পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিতে যাইবেন না, সকলে মিলিয়া সাবধানে পরস্পরের সাহায্য করা যাইবে।

মোটামুটি এইভাবে চলিল। কিছুকাল যুদ্ধের পরেই কর্ণের পুত্র চিত্রসেন সত্যসেন এবং সুষেণ নকুলের হাতে, এবং শল্যের পুত্র সহদেবের হাতে মারা গেল।

তারপর ভীমের সহিত শল্যের ঘোর গদাযুদ্ধ হয়। যুদ্ধ করিতে করিতে শেষে দুইজনেই দুইজনের গদাঘাতে অজ্ঞান হওয়ায় কৃপাচার্য শল্যকে লইয়া প্রস্থান করিলেন, আর ভীম গদা হাতে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সহিত শল্যের বার বার যুদ্ধ হয়। তখন পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা অনেকে মিলিয়াও শল্যের কিছু করিতে পারেন নাই। অর্জুন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি অন্য স্থানে অশ্বত্থামা প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু ইহার কিছুকাল পরে অর্জুনের সম্মুখেই সৈন্যরা ভীমের কথা অমান্য করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

এই সময়ে শল্যের বাণে নিজে নিতান্ত অস্থির হইয়া এবং সৈন্যদিগকে রক্তাক্ত শরীরে পলায়ন করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'হয় শল্যকে বধ করিব, না হয় নিজে প্রাণ দিব।' তারপর ভীমকে সম্মুখে, অর্জুনকে পশ্চাতে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে দুই পার্শ্বে লইয়া তিনি শল্যের সহিত এমন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতে কৌরবদের আর আতংকের সীমা রহিল না।

ইহাদের মধ্যে একবার শল্যের বাণে কঠিন বেদনা পাইয়াও যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া দিলেন, কিন্তু শল্যের জ্ঞান হইতে অধিক সময় লাগিল না। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহার কবচ ভেদ করিলেন, তিনি উল্টিয়া যুধিষ্ঠির এবং ভীম দুইজনের কবচ ছুঁড়িয়া দিলেন।

এমন সময় শল্যের বাণে যুধিষ্ঠিরের ধনুক এবং কৃপের বাণে তাঁহার সারথির মাথা কাটা গেল। ঘোড়া চারিটির শল্যের বাণে মরিতে আর বেশি বিলম্ব হইল না।

ইহাতে ভীম বিষম রাগে শল্যের ধনুক সারথি ঘোড়া সকল চূর্ণ করিয়া দিলেন। শল্যের বর্মও মুহূর্তের পরেই কাটা যাওয়ায়, তিনি অসি চর্ম হাতে রথ হইতে নামিয়া ক্রোধভরে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে গেলেন। এমন সময় ভীমের নয়টি বাণ বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া শল্যের খড়্গের মুষ্টি কাটিয়া ফেলিল। তথাপি তিনি যুধিষ্ঠিরের দিকে সিংহের ন্যায় ছুটিয়া চলিলে, যুধিষ্ঠির মণিমণ্ডিত অতি ভীষণ করালবদন স্বর্ণময় জ্বলন্ত শক্তি গ্রহণ করিলেন।

তারপর তিনি তাঁহার বিশাল দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া রোষভরে সেই শক্তি ছুঁড়িয়া মারিলে, শল্য তাহা লুফিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সাংঘাতিক অস্ত্র দেখিতে দেখিতে তাঁহার বক্ষ ভেদপূর্বক প্রবলবেগে ভূতলে প্রবেশ করিল।

শল্যের মৃত্যুতে তাঁহার সহোদর সক্রোধে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করায় তাঁহার মস্তক হারাইতে অধিক বিলম্ব হইল না। শল্যের সঙ্গের মদ্রদেশীয় লোকেরাও অনেক যুদ্ধের পর পাণ্ডবদের হাতে মারা গেল। ইহার পর আর কৌরব সৈন্যরা কিসের ভরসায় যুদ্ধ করিবে? তখন তাহারা সকলেই বুঝিল যে, পলায়ন ভিন্ন গতি নাই।

এই সময় দুর্যোধন অনেক কষ্টে তাঁহার সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তখন ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব এক ভয়ংকর হাতিতে চড়িয়া অতি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন। সৈন্যেরা তো সে হাতির ভয়ে চেঁচাইয়া পলাইলই, ভীম সাত্যকি এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের মতো বীরেরাও তাহার তাড়ায় কম ব্যস্ত হইলেন না। সে হতভাগা হাতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে এমনি তাড়া করিল যে, তিনি রথ ছাড়িয়াই দে চম্পট। বেচারা সারথি আর পলাইতে পারিল না। হাতি তাহাকে সুদ্ধ রথ খানিকে আছড়াইয়া গুঁড়া করিল।

যাহা হউক, শেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের গদাতেই হাতি মারা পড়ে। তারপরেই তীক্ষ্ণ ভল্লে সাত্যকি

শাল্বের মাথা কাটেন।

তারপর দুই দলে ভয়ানক যুদ্ধ চলিল। দুর্যোধন এ সময়ে খুবই বীরত্ব দেখাইলেন। শকুনিও কম যুদ্ধ করিলেন না। দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং সহদেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই দশ হাজারের মধ্যে চারি হাজার অশ্বারোহী দেখিতে দেখিতেই মারা যাওয়াতে তাঁহার মনে হইল যে, এখন সবেগে প্রস্থান করাই বুদ্ধিমানের কাজ। যাহা হউক, শকুনি অবিলম্বেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। তারপর পলকের মধ্যে তাঁহার অশ্বরোহীর সংখ্যা সাত শততে নামিয়ে আসায় তিনি অমনি দুর্যোধনকে গিয়া বলিলেন, 'আমি অশ্বারোহীগণকে পরাজয় করিয়াছি। এখন তুমি গিয়া রথীদিগকে পরাজয় কর।'

দুর্যোধনের নিরানব্বই ভাইয়ের মধ্যে কেবল দুর্মর্ষণ শ্রুতান্ত জৈত্র ভূরিবল রবি জয়ৎসেন সুজাত দুর্বিসহ অরিহা দুর্বিমোচন দুষ্প্রধর্ষ আর শ্রুর্তবা এই বার জন বাঁচিয়া ছিলেন। এই দিনের যুদ্ধে ভীমের হাতে তাঁহাদের মৃত্যু হইল। ইহার কিছুকাল পরে সুশর্মা অর্জুনের বাণে আর শকুনির পুত্র উলুক সহদেবের হাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। পুত্রের মৃত্যু সহ্য করিতে না পারিয়া শকুনি তখনি সহদেবকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ভালোভাবে যুদ্ধ আরম্ভ না করিতেই সহদেবের বাণে তাঁহার ধনুক কাটা যায়। তখন অসি গদা শক্তি প্রভৃতি যে অস্ত্রই তিনি হাতে করেন সহদেব তাহাই কাটিয়া ফেলেন। কাজেই শকুনি আর এক মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা করিলেন না।

কিন্তু পলাইয়া তিনি যাইবেন কোথায়? সহদেব তাঁহার পিছু পিছু তাড়া করিয়া বাণে বাণে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। তখন শকুনি একটা প্রাস লইয়া সহদেবকে আক্রমণ করিতে গেলে, সহদেব তাঁহার দু-খানি হাতসুদ্ধ সেই প্রাস কাটিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহার মাথায় এক ভয়ানক ভল্ল ছুঁড়িয়া মারিলেন। সে ভল্ল তাঁহার মাথা কটিয়া প্রাণ বাহির করিয়া দিল।

ইহার পর আর যুদ্ধের বড় বেশি বাকি রহিল না। দেখিতে দেখিতে কৌরবদিগের মধ্যে কেবল দুর্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা অবশিষ্ট রহিলেন। তাঁহাদের এগার অক্ষৌহিণী সৈন্যের সমস্ত মরিয়া শেষ হইল। তখন রাজা দুর্যোধন চারিদিক শূন্য দেখিয়া প্রাণের ভয়ে পলায়নপূর্বক রণভূমির নিকটেই দ্বৈপায়ন নামক একটা হ্রদের জলে লুকাইতে চাহিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, বিদুর পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে এইরূপ হইবে।

ইতিমধ্যে বেচারা সঞ্জয় সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে পড়িয়া প্রায় মারাই গিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে কাটিতে যাইবেন, ইত্যবসরে ব্যাসদেব আসিয়া বলিলেন, 'ইহাকে ছাড়িয়া দাও।'

এইরূপে মুক্তি পাইয়া সঞ্জয় তথা হইতে নগরের দিকে চলিয়াছেন, এমন সময় রণস্থলের এক ক্রোশ দূরে দুর্যোধনের সহিত তাঁহারা দেখা হইল। দুই চক্ষু জলে পূর্ণ থাকায় দুর্যোধন প্রথমে সঞ্জয়কে দেখিতে পান নাই। তারপর তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চিনিয়া বলিলেন, 'সঞ্জয়, বাবাকে বলিও, আমি হ্রদের নিকট লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছি।' এই বলিয়া তিনি গদা হাতে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়া রহিলেন।

সঞ্জয় সেখান হইতে চলিয়া যাইবার কিঞ্চিৎ পরে অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা তাঁহার নিকট দুর্যোধনের সংবাদ পাইয়া সেই হ্রদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ, জল হইতে উঠিয়া আইস, আমরা তিনজন তোমাকে লইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। আজ উহারা নিশ্চয় পরাজিত হইবে।'

তাহা শুনিয়া দুর্যোধন বলিলেন, 'বড় ভাগ্য যে আপনাদিগকে জীবিত দেখিলাম। কিন্তু আমি অতিশয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি, আর পাণ্ডবদিগের অনেক সৈন্য এখনো বাঁচিয়া আছে। সুতরাং আজ আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না। আজিকার রাত্রি বিশ্রাম করি, কাল আপনাদিগকে লইয়া যুদ্ধ করিব।'

এই সময় কয়েকজন ব্যাধ সেই হ্রদের ধারে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু তাহারা তাঁহাদের কথাবার্তা সকলই শুনিতে পাইল। সুতরাং দুর্যোধন যে সেই হ্রদের জলে লুকাইয়া রহিয়াছেন, একথা আর তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। একটু আগেই তাহারা পাণ্ডবদিগকে তাঁহার অন্বেষণ করিতে দেখিয়াছিল, আর তাঁহারা তাঁহাদিগকে দুর্যোধনের কথা জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন। এমন সংবাদ তাঁহাদিগকে দিতে পারিলে নিশ্চয়ই বিশেষ পুরস্কার মিলিবে, এই মনে করিয়া তাহারা অবিলম্বে ভীমের কাছে গিয়া সকল কথা বলিয়া দিল।

পাণ্ডবদিগের তখনো দুই হাজার রথী, সাত শত গদারোহী, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী আর দশ হাজার পদাতি অবশিষ্ট ছিল। দুর্যোধন পলায়ন করা অবধি তাঁহারা খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পান নাই। এমন সময় সেই ব্যাধেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে সেই সংবাদ দিল। ব্যাধদিগকে রাশি-রাশি ধন দিয়া তখনি সকলে দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে আসিলেন। কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা দূর হইতে তাঁহাদের কোলাহল শুনিতে পাইয়াই হ্রদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তারপর পাণ্ডবেরা সেখানে আসিয়া চিন্তা করিলেন যে, কী উপায়ে দুর্যোধনকে জলের ভিতর হইতে বাহির করা যায়।

দুর্যোধন বড়ই অহংকারী লোক ছিলেন, কটু কথা কিছুতেই সহিতে পারিতেন না। গালি দিলে তিনি বাহির হইয়া আসিবেন, এই ভাবিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কর্কশভাবে বলিলেন, 'দুর্যোধন, তুমি যে সকলকে যমের হাতে দিয়া নিজে প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে, এ কাজটা ভালো হয় নাই। আইস, যুদ্ধ করিব।' একথার উত্তরে দুর্যোধন জলের ভিতর হইতে বলিলেন, 'আমি, পলায়ন করি নাই, বিশ্রাম করিতেছি। তোমরা এখন গিয়া বিশ্রাম কর, তারপর যুদ্ধ হইবে।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমাদের বিশ্রাম হইয়াছে ; সুতরাং এখন আসিয়া হয় আমাদিগকে হারাইয়া রাজ্য ভোগ কর, না হয় আমাদের হাতে মরিয়া স্বর্গে যাও।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'আমি এখনো তোমাদিগকে পরাজয় করিতে পারি। কিন্তু আমার সব মরিয়া গেল, আর কাহার জন্য রাজ্য লইতে চাহিব? সুতরাং তোমরাই এখন রাজ্য ভোগ কর, আমি মৃগচর্ম পরিয়া বনে যাইতেছি।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'তোমার ও-কান্নায় আর আমার মন ভুলিবার নয়। এখন তুমি আমাকে রাজ্য দিবার কে? তোমাকে বধ করিয়া আমার রাজ্য কাড়িয়া লইব। আইস যুদ্ধ করি।'

এরূপ কঠিন কথা দুর্যোধন আর তাঁহার জীবনে কখনো শোনেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, 'আমার বর্ম নাই, অস্ত্র নাই, রথ নাই; তোমাদের সকলই আছে। তোমরা সকলে আমায় ঘিরিয়া মারিলে আমি কী করিয়া যুদ্ধ করিব? এক-এক জন করিয়া আইস, দেখা যাইবে।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'তোমার যেমন খুশি অস্ত্র দেখিয়া লও। বর্ম পর, চুল বাঁধ, আর যাহা খুশি কর। তারপর আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধ কর। সেই একজনকে

পরাজয় করিতে পারিলেই সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে।'

তখন দুর্যোধন বর্ম আর পাগড়ি পরিয়া, গদা হাতে লইয়া বলিলেন, 'আমি এই গদা লইয়া যুদ্ধ করিব। তুমি বা ভীম বা অর্জুন বা নকুল বা সহদেব যাহার খুশি আসিয়া আমার সহিত গদাযুদ্ধ কর। ন্যায়মতে গদাযুদ্ধ করিয়া তোমাদের কেহ আমার সঙ্গে পারিবে না। সত্য কি মিথ্যা এখনি দেখিতে পাইবে।'

এই সময়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'আপনি কোন্ সাহসে দুর্যোধনকে আপনাদের যাহার সহিত ইচ্ছা যুদ্ধ করিতে বলিলেন? দুরাত্মা যদি আপনাদের অর্জুনকে, নকুলকে বা সহদেবকে আক্রমণ করিয়া বসিত, তাহা হইলে আপনাদের কিরূপ দশা হইত? ভীমও গদাযুদ্ধে দুর্যোধনকে আঁটিতে পারে কি না সন্দেহ। ভীমের বল আর তেজ বেশি, কিন্তু দুর্যোধনের শিক্ষা অধিক, আর শিক্ষাতেই হারজিৎ। এখন বুঝিলাম যে, পাণ্ডবদের কপালে রাজ্যলাভ নাই, বিধাতা উহাদিগকে বনে বাস করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।'

এমন সময় ভীম গদা হাতে লইয়া দুর্যোধনকে বলিলেন, 'ওরে নরাধম, সকল দুরাত্মা মরিয়া এখন তুমি কেবল অবশিষ্ট রহিয়াছ। আজ এই গদার প্রহারে তোমাকে বধ করিয়া আমাদের সকল দুঃখের শোধ লইব।'

দুর্যোধন বলিলেন, 'আর বড়াই করিও না। এখনি তোমার যুদ্ধের সাধ মিটাইয়া দিব। ন্যায়মতে গদাযুদ্ধে ইন্দ্রও আমাকে পরাজয় করিতে পারেন না। আইস দেখি, তোমার কত বিদ্যা!'

দুইজনের প্রাণ ভরিয়া গালাগালি চলিতেছে, এমন সময় বলরাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীম ও দুর্যোধন দুইজনেই বলরামের ছাত্র, তিনি ইহাদের গদার শিক্ষাগুরু। সুতরাং যুদ্ধের সময় তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া দুইজনেরই খুব উৎসাহ হইল।

কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান, সেখানে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। এইজন্য বলরাম বলিলেন যে, যুদ্ধ দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে না হইয়া কুরুক্ষেত্রে হওয়াই ভালো। তখন সকলে সেখান হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া যুদ্ধের জন্য একটি স্থান দেখিয়া লইলেন।

তখন দুইজনে দুই মত্ত হাতির ন্যায় গর্জন করিতে করিতে কী ঘোর যুদ্ধই আরম্ভ করিলেন! সকলে স্তব্ধভাবে চারিদিকে বসিয়া সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। সেকালের লোকেরা আগে খুব একচোট বাক্‌যুদ্ধ অর্থাৎ গালাগালি না করিয়া যুদ্ধ করিত না। সুতরাং প্রথমে তাহাই কিছুকাল চলিল। তাহার পর ভীষণ ঠকাঠক শব্দে রণস্থল কাঁপাইয়া উভয়ে উভয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের গদা হইতে ক্রমাগত আগুন বাহির হইতেছিল।

সে যুদ্ধের কী অদ্ভুত কৌশল! মণ্ডলগতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, পরিমোক্ষ, প্রহার, বঞ্চন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, অক্ষেপ, বিগ্রহ, পরিবর্তন, সাবর্তন, অবপ্লুত উপপ্লুত, উপন্যত প্রভৃতি অশেষ প্রকার কৌশল দেখাইয়া তাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এ সকল কৌশলে দুর্যোধনেরই অধিক ক্ষমতা দেখা গেল। তিনি একবার ভীমের বুকে এমনি গদা প্রহার করিলেন যে, কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার নড়িবার শক্তি রহিল না। যাহা হউক, ইহার পরেই ভীমও এক গদাঘাতে দুর্যোধনকে অজ্ঞান করিলেন।

খানিক পরে দুর্যোধন উঠিয়াই ভীমের কপালে এমন গদার আঘাত করিলেন যে, সে-স্থান হইতে দর-দর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। কিন্তু ভীমের দেহে এমন অসাধারণ শক্তি ছিল যে, সেই সাংঘাতিক আঘাতেও তাঁহার কিছু হইল না। তাহার পরেই দেখা গেল যে, দুর্যোধন ভীমের

গদার চোটে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া যাইতেছেন। তখনি আবার দুর্যোধনের আঘাতে ভীমের সেই দশা হইল। তারপর দুর্যোধন ঘোরনাদে পুনরায় গদাঘাত করিয়া ভীমের কবচ ছিঁড়িয়া দিলেন। সে আঘাতের বেগ ভীম সহজে সামলাইতে পারিলেন না।

এতক্ষণে কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, ন্যায় যুদ্ধে ভীমের দুর্যোধনকে পরাজয় করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি অন্যায় যুদ্ধে তাঁহাকে বধ করিতে পরামর্শ দিলেন। তখন অর্জুন ইঙ্গিত করা মাত্র ভীম বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্যোধনের উরু ভাঙিয়া তাঁহাকে সংহার করিতে হইবে। গদা যুদ্ধে নাভির নীচে আঘাত নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন দুর্যোধনকে বধ করা যাইতেছে না। সুতরাং ভীম এইটুকু অন্যায় করিয়াই নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

আবার যুদ্ধ চলিল। তারপর উভয়েই ক্লান্ত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলেন। তারপর আবার যুদ্ধ চলিল। সেই সময় ভীম ইচ্ছা করিয়াই দুর্যোধনকে আঘাতের সুযোগ দিলেন। তাহাতে দুর্যোধন প্রবলবেগে ভীমকে আক্রমণ করিতে আসিবামাত্র ভীম তাঁহাকে গদা ছুঁড়িয়া মারিলেন। দুর্যোধন বিদ্যুৎবেগে সেই গদা এড়াইয়া ভীমকে সাংঘাতিক আঘাত করিলেন। কিন্তু ভীম সেই ভয়ানক আঘাতও আশ্চর্যরূপে সহিয়া রহিলেন। তাঁহার শান্ত-ভাব দেখিয়া দুর্যোধনের মনে হইল, বুঝি তাঁহার অভিসন্ধি আছে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে আর আঘাত না করিয়াই ত্বরায় ফিরিয়া আসিলেন।

তারপর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া ভীম অসীম রোষে দুর্যোধনকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। দুর্যোধন তাঁহাকে এড়াইবার জন্য লাফ দিয়া শূন্যে উঠিবামাত্র ভীম দারুণ গদাঘাতে তাঁহার দুই উরু ভাঙিয়া দিলেন। তখন ভগ্নপদে নিতান্ত অসহায়ভাবে দুর্যোধনকে ধরাশায়ী হইতে হইল। অমনি ভীম তাঁহার মাথায় পদাঘাত পূর্বক বলিলেন, 'রে দুরাত্মা, সভার মধ্যে গরু-গরু বলিয়া বিদ্রুপ করিয়াছিলি, আর দ্রৌপদীকে অপমান করিয়াছিলি, তাহার এই সাজা।' এইরূপ গালি দিতে দিতে তিনি দুর্যোধনের মাথায় আবার পদাঘাত করিলেন।

ভীমের এই ব্যবহারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, 'ভীম, সৎ উপায়েই হউক আর অসৎ উপায়েই হউক, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রাখিয়াছ। এখন ক্ষান্ত হও, ইহার মাথায় পদাঘাত করিয়া আর পাপ কেন বাড়াও? ইহার অবস্থা দেখিলে এখন বড়ই দুঃখ হয়। এ আমাদের ভাই; তুমি ধার্মিক হইয়া কেন উহাকে পদাঘাত করিতেছ?'

তারপর তিনি দুর্যোধনকে বলিলেন, 'ভাই, তুমি দুঃখ প্রকাশ করিও না। তোমাদের দোষেই যুদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি দেহত্যাগ পূর্বক এখনি স্বর্গে যাইবে, আর আমরা এখানে সুহৃদগণের শোকে চিরকাল দারুণ দুঃখ ভোগ করিব।'

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

ভীমের কাজটি অতি অন্যায় হইয়াছিল। উপস্থিত যোদ্ধারাও ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। বলরাম তো লাঙল উঠাইয়া তখনি ভীমকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কৃষ্ণের অনেক চেষ্টায় তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাগ দূর হইল না। তিনি কৃষ্ণকে বলিলেন, 'তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, ভীম যে নিতান্ত অন্যায় করিয়াছে, এ বিশ্বাস আমার মন হইতে দূর করিতে পারিবে না।'

এই বলিয়া বলরাম সেখান হইতে চলিয়া গেলে যোদ্ধারা সকলে মিলিয়া দুর্যোধনের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'হে ভীম, আজ তুমি দুষ্ট দুর্যোধনকে মারিয়া

বড়ই ভালো কাজ করিলে। আমাদের ইহাতে যারপরনাই আনন্দ হইয়াছে।'

তখন কৃষ্ণ সেই যোদ্ধাদিগকে বলিলেন, 'যে শত্রু মরিতে বসিয়াছে তাহাকে বকিলে কী হইবে? এই দুষ্ট এখন শত্রুতা বন্ধুতা কিছুরই উপযুক্ত নহে। আমাদের ভাগ্যের জোরে এতদিনে পাপী মারা গেল। এখন চল আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি।'

একথায় দুর্যোধন দুই হাতে মাটিতে ভর দিয়া, মাথা তুলিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, 'হে কংসের দাসের পুত্র, তোমার দুষ্ট বুদ্ধিতেই আমাদের বীরেরা মারা গেলেন। তোমার মতো পাপী, নির্দয় এবং নির্লজ্জ আর কে আছে?'

তাহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, 'তুমি অনেক পাপ করিয়াছ, এখন তাহারই ফল ভোগ কর।'

তাহাতে দুর্যোধন বলিলেন, 'রাজার যে সুখ, তাহা আমি ভালোমতেই ভোগ করিয়াছি। এখন আমি সবান্ধবে স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকে দুঃখে আধমরা হইয়া পৃথিবীতে পড়িয়া থাক।'

একথা বলিবামাত্র স্বর্গ হইতে দুর্যোধনের উপর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইলে পাণ্ডবেরা লজ্জিতভাবে শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে তাঁহাদের সকলের শিবিরের ভিতরে থাকা হইল না। কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জুন, নকুল, সহদেব আর সাত্যকি তাঁহার সহিত শিবির ছাড়িয়া নদীর ধারে আসিয়া নিদ্রার আয়োজন করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই কৃপ, অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা দুর্যোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্যোধনের তখনকার অবস্থা দেখিয়া সেই তিন বীরের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা তাঁহার কাছে বসিয়া অনেক কাঁদিলে দুর্যোধন তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'আপনারা আমার জন্য দুঃখ করিবেন না, আমি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিব। আপনারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার ভাগ্যে জয়লাভ ছিল না, কী করিব?'

এই কথা বলিয়া দুর্যোধন চুপ করিলে অশ্বত্থামা দুঃখে ও রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, 'আমাদের অনুমতি দাও ; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আজ যেমন করিয়াই হউক, শত্রুদিগকে মারিয়া শেষ করিব!'

একথায় দুর্যোধন তখনি অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করিয়া দিলে, তাঁহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়াই তিন বীর সিংহনাদ করিতে করিতে সে-স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।
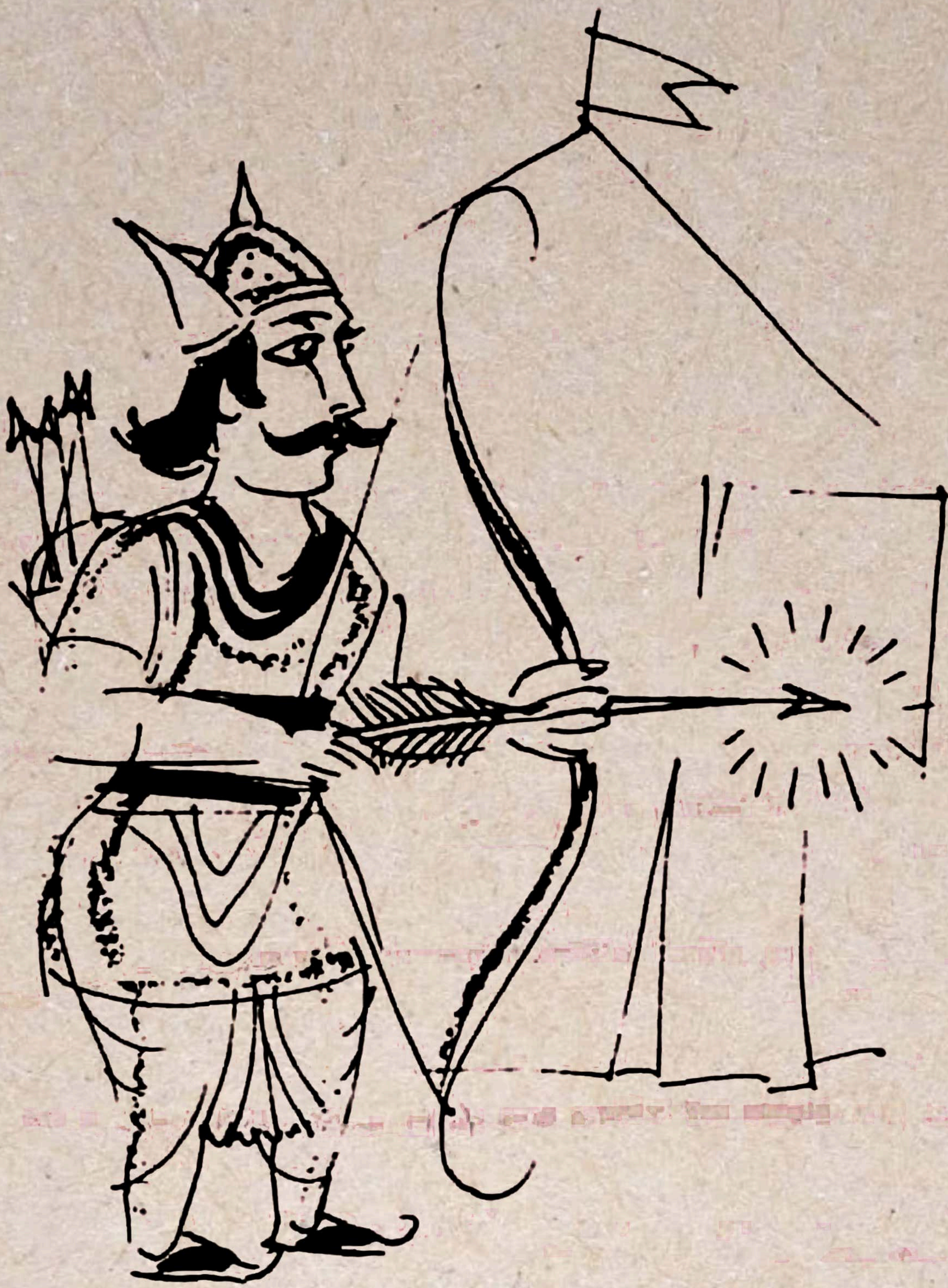
সৌপ্তিক পর্ব

দুর্যোধনের এখন নিতান্তই দুরবস্থা। নিজে তো মরিতেই চলিয়াছেন, তাঁহার পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যেও তিনজন মাত্র জীবিত।

এই তিনটি লোক কী করিতে পারে? তাঁহারা দুর্যোধনের দুর্দশা আর পাণ্ডবদের পরাক্রমের কথা চিন্তা করিতে করিতে রথে চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু শত্রুসংহারের কোনো উপায় দেখিতেছেন না। তাঁহারা চুপি-চুপি শিবিরের কাছে গেলেন, কিন্তু সেখানে পাণ্ডবদের সিংহনাদ শুনিয়া তাঁহাদের ভয় হইল। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা একটা বনের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর নিজেরাও অতিশয় ক্লান্ত, ঘোড়াগুলিও আর চলিতে পারে না। এখন একটু বিশ্রাম না করিলেই নয়। তাই সেই বনের ভিতর একটা প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতে পাইয়া তাঁহারা রথ হইতে নমিলেন। নিকটেই জলাশয় ছিল। ঘোড়াগুলিকে খুলিয়া দিয়া তাঁহারা

সেই জলাশয়ে মুখ-হাত ধুইয়া, সন্ধ্যাপূজা সারিয়া বটগাছের নিচে বিশ্রাম করিতে আসিলেন। অল্পক্ষণের ভিতর কৃপ আর কৃতবর্মার ঘুম আসিল। কিন্তু দুঃখে আর চিন্তায় অশ্বত্থামার ঘুম হইল না। তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। রাত্রি হইয়াছে, গাছের ডালে কাকেরা তাহাদের বাসায় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। এমন সময় কোথা হইতে প্রকাণ্ড একটা পেচক আসিয়া ঘুমের ভিতর অসহায় অবস্থায় সেই কাকগুলিকে বধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পেচক কাকগুলিকে মারিয়া শেষ করিল, একটিও অবশিষ্ট রহিল না।

এই ঘটনা দেখিয়া অশ্বত্থামার মনে হইল, 'তাই তো! আমিও তো এই উপায়ে শত্রুদিগকে বধ করিতে পারি!' ইহার পর আর অশ্বত্থামা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তখনি কৃপকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মামা, এইরূপ করিয়া আমরাও আমাদের শত্রুদিগকে বধ করিব!'

কৃপাচার্য প্রথমে কিছুতেই এমন কাজে মত দেন নাই, কিন্তু ভাগিনেয়ের পীড়াপীড়িতে শেষটা তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। তিনজনে মিলিয়া সেই নিষ্ঠুর পাপকার্য সাধনের জন্য পাণ্ডব-শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন।

পাণ্ডব-শিবিরের কাছে আসিয়া অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, একজন অতিশয় উজ্জ্বল পুরুষ শিবিরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। এই উজ্জ্বল পুরুষ স্বয়ং মহাদেব। কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইবার জন্য বাণ মারিতে লাগিলেন।

অস্ত্রে মহাদেবের কী হইবে? অশ্বত্থামা বাণ, শক্তি, অসি, গদা, যাহা কিছু মারিলেন, সমস্তই সেই উজ্জ্বল পুরুষ গিলিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা সকল ক্ষমতা শেষ করিয়া, তারপর আর কী করিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না। এমন সময় তাঁহার মনে হইল, 'শিবের পূজা করি, তাহা হইলে আমার কাজ হইবে।' এই মনে করিয়া তিনি শিবের স্তব করিতে করিতে নিজের শরীর উপহার দিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য আগুন জ্বালিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিলেন। তখন শিব তুষ্ট না হইয়া আর যান কোথায়? তিনি কেবল যে দরজা ছাড়িয়া দিলেন তাহা নহে, তাঁহাকে একখানি ধারালো খড়্গও দিলেন এবং নিজে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বল বাড়াইতেও ত্রুটি করিলেন না।

তারপর যাহা ঘটিল, বলিতে বড়ই ক্লেশ বোধ হয়। অশ্বত্থামা সেই খড়্গ হাতে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কৃপ আর কৃতবর্মাকে দরজায় রাখিয়া গেলেন, যেন কেহ পলাইয়া যাইতে না পারে।

শিবিরে প্রবেশ করিয়াই অশ্বত্থামা সকলের আগে ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে তাঁহার পিতাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে বধ করিয়াছিল, তাহার উপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। সেই রাগেই তিনি সকলের আগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মারিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

সুন্দর কোমল শয্যার উপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময় অশ্বত্থামার পদাঘাতে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া বসিবামাত্র অশ্বত্থামা তাঁহাকে চুল ধরিয়া মাটিতে আছড়াইতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়া বুকে লাথি মারিতে আরম্ভ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন অনেক কষ্টে বলিলেন, 'আমাকে অস্ত্রাঘাতে শীঘ্র সংহার কর!' কিন্তু অশ্বত্থামা তাহা না শুনিয়া পদাঘাতেই তাঁহার প্রাণ শেষ করিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের চিৎকারে সকলে জাগিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই ভীষণ রাত্রে, ঘুমের ঘোরে বিষম ত্রাসে কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে, কী হইয়াছে।

এদিকে অশ্বত্থামা অস্ত্র হাতে সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় সকলকে সংহার করিতেছেন। যোদ্ধারা যুদ্ধ করিবেন কী? একে রাত্রিকাল, তায় নিদ্রাকালে হঠাৎ আক্রমণ। হতভাগ্যেরা ভালোমতো প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে আক্রমণপূর্বক বধ করিতে লাগিলেন।

সে নিষ্ঠুর নীচ ভীষণ কার্য আর বর্ণনা করিয়া কী হইবে? শিবিরে যত লোক ছিল, স্ত্রীলোক ভিন্ন তাহাদের একজনও রক্ষা পাইল না। পাণ্ডবদিগের পুত্র কয়টিকে অবধি অশ্বত্থামা নির্দয়ভাবে বিনাশ করিলেন। তিনি চুপি-চুপি চোরের ন্যায় প্রবেশ করিবার সময় শিবির যেমন নিস্তব্ধ ছিল দেখিতে দেখিতে আবার তাহা সেইরূপ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, রাত্রিও শেষ হইয়াছে।

তারপর বাহিরে আসিয়া অশ্বত্থামা কৃপ ও কৃতবর্মাকে নিজ কীর্তি জানাইলেন, আর জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া একটি প্রাণীকেও পলায়ন করিতে দেন নাই। তখন তিনজনে মনের আনন্দে করতালি দিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন। এমন কাজের সংবাদটা দুর্যোধনকে তখনই জানানো হয় নাই; সুতরাং তাঁহারা তাঁহার নিকট যাইতে আর তিলমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

হায় মহারাজ দুর্যোধন! এখন তিনি কী করিতেছেন? এখনো তিনি মৃত্যুর অপেক্ষায় রণস্থলে শয়ান। প্রাণ বাহির হইতে বিলম্ব নাই, জ্ঞান লোপ হইয়া আসিতেছেন, মুখ দিয়া ক্রমাগত রক্ত বাহির হইতেছে। বৃক প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুগণ আসিয়া তাঁহার মাংসের লোভে তাঁহাকে ঘিরিয়াছে। তিনি দারুণ যাতনায় ছটফট করিতে করিতে অতি কষ্টে তাহাদিগকে বারণ করিতেছেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সেই তিন বীর আর চোখের জল থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। একাদশ অক্ষৌহিণীর যিনি অধিপতি ছিলেন, তাঁহার কিনা এই দশা। আর সেই বীরের মাংস খাইবার জন্য জন্তুরা তাঁহাকে ঘিরিয়াছে! যাহা হউক, এসব কথা ভাবিয়া আর কী হইবে? এখন যে সংবাদ লইয়া তিনজনে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে শুনানো হউক। এই ভাবিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকে বলিলেন, 'হে কুরুরাজ, যদি জীবিত থাকেন তবে এই আনন্দের সংবাদ শ্রবণ করুণ। এখন পাণ্ডবপক্ষে পাঁচ পাণ্ডব, কৃষ্ণ আর সাত্যকি, এই সাতজন মাত্র জীবিত। আজ রাত্রে আমি তাঁহাদের শিবিরে প্রবেশ করিয়া আর সকলকে বধ করিয়াছি।'

একথায় দুর্যোধন চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, 'হে বীর ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাহা করিতে পারেন নাই, আজ তুমি তাহা করিলে। তোমাদের কথা শুনিয়া নিজেকে ইন্দ্রের মতো সুখী মনে করিতেছি। এখন তোমাদের মঙ্গল হউক; আবার স্বর্গে দেখা হইবে।' এই বলিয়া দুর্যোধন সেই তিনজনকে আলিঙ্গন করিলে তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেল।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে সঞ্জয় কাঁদিতে কাঁদিতে এই সংবাদ লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। সেদিন আর তিনি অন্য দিনের মতো স্থিরভাবে তাঁহার কথা বলিতে পারিলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের পুরীতে প্রবেশমাত্রই তিনি দুই হাত তুলিয়া 'হা মহারাজ' 'হা মহারাজ' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার মুখে সেই দারুণ সংবাদ শুনিয়া সকলের, বিশেষত ধৃতরাষ্ট্রের আর গান্ধারীর যে অবস্থা হইল তাহা বর্ণনাতীত। সে সংবাদে কেহ অজ্ঞান, কেহ বা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। অনেকে পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তারপর এমন কান্না আরম্ভ হইল যে, তাহা শুনিলে বুঝি পাথরও গলিয়া যায়।

এদিকে রাত্রির সেই ভীষণ ব্যাপারের সংবাদ পাইয়া পাণ্ডবগণের কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা

আর বলিয়া কী হইবে? নকুল তখনি দ্রৌপদীকে আনিতে পাঞ্চাল দেশে চলিয়া গেলেন। দ্রৌপদী আসিলে পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে কাটিল যে, সে দুঃখের আর তুলনা নাই। দ্রৌপদী কাঁদিতে কাঁদিতে রাগে অস্থির হইয়া বলিলেন, 'আজ যদি সেই পামরকে সংহার করা না হয়, তবে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব!'

যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে শান্ত না হইয়া বলিলেন, 'শুনিয়াছি অশ্বত্থামার জন্মাবধি তাহার মাথায় একটা মণি আছে। দুরাত্মার প্রাণবধপূর্বক সেই মণি আনিয়া দিতে পারিলে আমি তাহা তোমাকে পরাইয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইতে পারি।' তিনি ভীমকেও বলিলেন, 'অশ্বত্থামাকে মরিয়া সেই মণি আনিয়া দিতে হইবে।'

একথা বলামাত্রই ভীম নকুলকে সারথি করিয়া অশ্বত্থামার খোঁজে বাহির হইলেন। অশ্বত্থামার রথের চাকার দাগ স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল, সুতরাং তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা তেমন কঠিন কাজ বলিয়া বোধ হইল না।

কিন্তু ভীমকে অশ্বত্থামার খোঁজে যাইতে দেখিয়া কৃষ্ণের বড়ই চিন্তা হইল। তিনি জানিতেন যে, অশ্বত্থামাকে দ্রোণ ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র দিয়াছিলেন। উহা এমনই ভয়ংকর যে, তাহার বদলে অশ্বত্থামা কৃষ্ণের চক্র চাহিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই। অশ্বত্থামা ভীমের উপর সেই অস্ত্র মারিয়া বসিলে তাঁহার রক্ষা থাকিবে না। সুতরাং কৃষ্ণ তখনি যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে লইয়া রথারোহণে ভীমের অনুগামী হইলেন। ভীমকে পাইতেও বিলম্ব হইল না। কিন্তু তিনি কি নিষেধ শুনিবার লোক! তিনি তাঁহাদের কথা না শুনিয়াই ছুটিয়া চলিলেন। তারপর গঙ্গার ধারে আসিয়া অশ্বত্থামাকে ব্যাসদেবের নিকট দেখিবামাত্র তিনি 'দাঁড়া বামুন, দাঁড়া!' বলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গেলেন।

অশ্বত্থামা দেখিলেন, বড়ই বিপদ! একা ভীম হইতেই রক্ষা নাই, তাহাতে আবার ভীমের পশ্চাতে কৃষ্ণ, অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরকেও দেখা যাইতেছে। কাজেই তিনি প্রাণভয়ে 'পাণ্ডব বংশ নষ্ট হউক!' বলিয়া সেই ব্রহ্মশির অস্ত্র ছুঁড়িয়া বসিলেন। তখন সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, 'শীঘ্র তোমার দ্রোণ-দত্ত সেই মহা-অস্ত্র ছাড়!' অর্জুন তৎক্ষণাৎ 'এই অস্ত্রে অশ্বত্থামার অস্ত্র বারণ হউক' বলিয়া তাঁহার অস্ত্র ছাড়িলেন। অমনি সেই দুই অস্ত্রের তেজে এমন ভয়ংকর গর্জন, উল্কাবৃষ্টি ও বজ্রপাত আরম্ভ হইল যে, সকলে ভাবিল বুঝি সৃষ্টি নষ্ট হয়।

তখন নারদ আর ব্যাসদেব সৃষ্টিরক্ষার জন্য সেই দুই অস্ত্রের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, অর্জুন এবং অশ্বত্থামাকে শীঘ্র তাঁহাদের অস্ত্র থামাইতে বলিলেন। 'অর্জুন বলিলেন, অশ্বত্থামার অস্ত্র বারণের জন্য আমি অস্ত্র ছুঁড়িয়াছিলাম। আমার অস্ত্র থামাইলেই উহার অস্ত্র আমাদিগকে ভস্ম করিবে। অতএব, যাহাতে সকলে রক্ষা পাই আপনারা তাহা করুন।'

একথা বলিয়াই অর্জুন তাঁহার অস্ত্র থামাইয়া দিলেন। অতিশয় মন্দ-ভাব লইয়া উহা থামাইতে গেলে উহাতে তৎক্ষণাৎ নিজের মাথা কাটা যায়। অর্জুন অসাধারণ সাধুপুরুষ ছিলেন, তাই ইচ্ছামাত্র তাঁহার অস্ত্র থামাইয়া দিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা তাঁহার অস্ত্র থামাইতে না পারিয়া মুনিদিগকে বলিলেন, 'আমি ভীমের ভয়ে অস্ত্র ছাড়িয়াছিলাম, এখন তো আর তাহা থামাইতেই পারিতেছি না! বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি, এ অস্ত্র নিশ্চয় পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে।'

কিন্তু মুনিরা এরূপ অন্যায় কথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন, 'অর্জুন যখন

তাঁহার অস্ত্র ফিরাইয়া লইয়াছিলেন, অশ্বত্থামারও পাণ্ডবদিগের রক্ষা করা নিতান্ত উচিত।'

বাস্তবিকই, কেবল পাণ্ডবদেরই ক্ষতি হইবে আর অশ্বত্থামার কিছুই হইবে না, এমন হইলে অর্জুন তাঁহার অস্ত্র থামাইতে রাজি হইবেন কেন? অথচ এদিকে অশ্বত্থামারও নিজের অস্ত্র থামাইবার শক্তি না থাকায়, পাণ্ডবদের কিছু ক্ষতি না হইয়া যাইতেছে না। এ অবস্থায় অশ্বত্থামারও কিছু ক্ষতি হওয়া উচিত। সুতরাং শেষে এইরূপ স্থির হইল যে, অশ্বত্থামার অস্ত্রে অভিমন্যুর শিশু–পুত্রটি মারা যাইবে, আর অশ্বত্থামা মাথার মণি আনিয়া দ্রৌপদীকে দিলে, সেই যুধিষ্ঠিরের মাথায় পরাইয়া এত দুঃখের ভিতরেও তিনি কিঞ্চিৎ সুখ পাইবেন।

আর অভিমন্যুর সেই পুত্রটির কী হইল? শিশুটি তখনো জন্মে নাই, সেই অবস্থাতেই সে মারা গেল। তাহার জন্মের পর মরা ছেলে দেখিয়া সকলে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, কৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। ছেলেটির নাম পরীক্ষিৎ। যুধিষ্ঠিরের পরে এই পরীক্ষিৎ হস্তিনায় ষাট বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

স্ত্রীপর্ব

আঠার দিন পরে কুরুক্ষেত্রের সেই ভীষণ যুদ্ধের শেষ হইল। আঠার অক্ষৌহিণী লোক এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে। এখন সেই সকল যোদ্ধাদের ঘরে ঘরে শোকের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেবল শোক করিলে তো আর চলিবে না, মৃত লোকদের শ্রাদ্ধাদির আয়োজন করা চাই।

একশত পুত্রের শোক কি সহজ কথা! সামলাইয়া উঠিতে ধৃতরাষ্ট্রের বড়ই কষ্ট হইল। ব্যাস, বিদুর প্রভৃতি অনেক বুঝাইয়াও তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, অনেক কষ্টে শেষে তিনি কতক স্থির হইলেন, আর পাণ্ডবদের উপরও তাঁহার রাগ অনেকটা কমিল। ব্যাস তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'তোমার পুত্রেরা নিতান্তই দুরাচার ছিল। তাহাদের দোষেই এই সর্বনাশ হইয়াছে। পাণ্ডবদের ইহাতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই।'

তারপর শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে সঞ্জয় আর বিদুর আবার ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, এখন শ্রাদ্ধাদির সময় উপস্থিত। শোকের মোহে সে সকল কার্যের অবহেলা করিবেন না।'

তখন ধৃতরাষ্ট্র পরিবারের স্ত্রী পুরুষ সকলকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে

যাত্রা করিলেন। কুলবধূগণ বিধবার বেশে পথে বাহির হইলে পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাঁহাদের দুঃখে কাঁদিয়া আকুল হইল।

এদিকে পাণ্ডবেরাও কৃষ্ণ, সাত্যকি আর দ্রৌপদী প্রভৃতিকে লইয়া কুরুক্ষেত্রের দিকে আসিতেছিলেন। কিছু দূর আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের দেখা হইবামাত্র কৌরব নারীগণের দুঃখ যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল ; কেননা, পাণ্ডবেরাই এই দুঃখের কারণ।

পাণ্ডবেরা একে-একে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়া নিজ-নিজ নাম বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিরক্তভাবে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও তাঁহার সহিত দু-একটি কথা কহিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভীম কোথায়?' তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝা গিয়াছিল যে, ভীমকে পাইলে তিনি তাঁহাকে বধ না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহার এরূপ অভিসন্ধির কথা কৃষ্ণ পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আর সেজন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেও ভুলেন নাই। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র ভীমের কথা জিজ্ঞাসা করামাত্র তিনি একটা লোহার ভীম আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সেই লোহার মূর্তিটাকে আলিঙ্গন করিবার ছলে ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে এমনি চাপিলেন যে, তাহা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। ধৃতরাষ্ট্রের দেহে লক্ষ হাতির জোর ছিল, সুতরাং তিনি যে লোহার ভীম চূর্ণ করিবেন তাহা আশ্চর্য নহে। আসল ভীমকে পাইলে না জানি তিনি তাঁহার কী দশা করিতেন! যাহা হউক, লোহার ভীমকে চূর্ণ করা লক্ষ হাতির জোরের পক্ষেও সহজ কথা নয়। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র সে কাজ শেষ করিয়াই রক্ত-বমি করিতে করিতে পড়িয়া গেলেন। এদিকে ভীমের যথেষ্ট সাজা হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার রাগ চলিয়া গেল। তখন আবার তিনি, 'হা ভীম', 'হা ভীম' করিয়া কাঁদিতে ত্রুটি করিলেন না। তাহাতে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ, দুঃখ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। ওটা লোহার ভীম, যথার্থ ভীম নহে। ভীমকে বধ করিতে যাওয়া আপনার উচিৎ হয় নাই। দেখুন, এ যুদ্ধে বারণ করিতে অশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তথাপি আপনার পুত্রেরা তাহাতে ক্ষান্ত হয় নাই। তাহার ফলেই এখন তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। সুতরাং ভীমকে তাহার জন্য দোষী করেন কেন?'

কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'কৃষ্ণ, তোমার কথাই সত্য। শোকে বুদ্ধিনাশ হওয়াতেই আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম।' এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবকে আলিঙ্গনপূর্বক আশীর্বাদ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষা গান্ধারীর কথা ভাবিয়াই পাণ্ডবদিগের মনে অধিক ভয় হইয়াছিল। গান্ধারী সামান্য স্ত্রীলোক ছিলেন না। জীবনে তিনি কখনো একটি অধর্মের কাজ করেন নাই, অথবা একটি অধর্মের কথা মুখে আনেন নাই। অন্ধ স্বামীর দুঃখে তিনি এতই দুঃখিনী ছিলেন যে, বিবাহের পরেই তিনি নিজের চোখ দুইটা মোটা কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলেন। সে বাঁধন তাঁহার চিরদিন একভাবে ছিল ; যুদ্ধের পূর্বে যখন দুর্যোধনেরা জয়লাভের জন্য তাঁহার আশীর্বাদ চাহিতে আসিলেন, তখন গান্ধারী তাঁহাদের মা হইয়াও একথা মুখে আনিতে পারিলেন না যে, 'তোমাদের জয় হউক!' তিনি বলিলেন, 'ধর্মের জয় হউক!'

সে দেবতার ন্যায় তেজস্বিনী ধার্মিক রমণীর ক্রোধের কথা ভাবিয়াই পাণ্ডবেরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। আর ক্রোধও তাঁহার খুবই হইয়াছিল। সেই ক্রোধে পাছে তিনি পাণ্ডবদিগকে শাপ দেন, এই ভয়ে ব্যাসদেব পূর্বেই তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, 'মা, তুমিও বলিয়াছিলে, ধর্মের জয় হউক। সেই ধর্মের জয়ই হইয়াছে। তোমার যে অসাধারণ ক্ষমাগুণ তাহাই ধর্ম ; আর এখন

যে ক্রোধ করিতেছ তাহা অধর্ম। মা, ধর্মের উপর যেন অধর্মের জয় না হয়!'

ইহার উত্তরে গান্ধারী বলিলেন, 'ভগবান, পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার ক্রোধ নাই, তাহাদের বিনাশ আমি চাহি না। কিন্তু ভীম যে অন্যায়পূর্বক দুর্যোধনকে মারিয়াছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।'

তাই ভীম গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভয়ে ভয়ে বিনয়ের সহিত বলিলেন, 'মা, আমার অপরাধ হইয়াছে; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ভাবিয়া দেখুন, আপনার পুত্রেরা আমাদিগের বড়ই অনিষ্ট করিয়াছিল।'

গান্ধারী বলিলেন, 'বাছা, আমাদের একশত পুত্রের মধ্যে যাহার কিছু কম অপরাধ এমন একটিকেও যদি জীবিত রাখিতে তাহা হইলেও যে এই দুই অন্ধের নড়িস্বরূপ হইতে পারিত। এখন আমাদের পুত্র নাই, কাজেই তুমি আমার পুত্রের মতো হইলে।'

তারপর যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট আসিয়া জোড়হাতে বলিলেন, 'দেবী, আমিই আপনার দুঃখের মূল। আমি অতি নরাধম; আমাকে শাপ দিন।' গান্ধারী একথায় কোনো উত্তর না দিয়া কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সেই সময় যুধিষ্ঠির গান্ধারীর পায়ে ধরিতে গেলে গান্ধারী তাঁহার চোখের বাঁধনের ফাঁক দিয়া যুধিষ্ঠিরের আঙুলের নখ দেখিতে পান। তদবধি যুধিষ্ঠিরের নখ মরিয়া গেল। তাহা দেখিয়া অর্জুন, সহদেব এবং নকুল ভয়ে আর তাঁহার নিকট আসিলেন না। তখন গান্ধারী তাঁহাদিগকে ডাকিয়া স্নেহের সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

তারপর পাণ্ডবেরা কুন্তীর নিকটে গেলেন। এত কষ্টের পর তাঁহাদিগকে পাইয়া আর তাঁহাদিগকে অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত এবং দ্রৌপদীকে পুত্রশোকে আকুল দেখিয়া না জানি কুন্তীর কতই কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে কষ্টের দিকে মন না দিয়া তিনি দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

তারপর সকলে মিলিয়া সেখান হইতে রণস্থলে গেলেন। তখন নিজ-নিজ আত্মীয়গণের মৃত শরীর দেখিয়া তাঁহাদের যে দারুণ দুঃখ হইল, তাহার কথা অধিক বলিয়া আর কী হইবে? সেই মৃতদেহগুলির সৎকারই হইল তখনকার প্রথম কাজ। বহুমূল্য কাষ্ঠ, ঘৃত, চন্দনাদিতে অসংখ্য চিতা প্রস্তুত করিয়া যত্নপূর্বক সে কাজ শেষ করা হইলে সকলে স্নান ও জলাঞ্জলি (অর্থাৎ যাহারা মরিয়াছে তাহাদের উদ্দেশে অঞ্জলি ভরিয়া জল) দিবার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন।

এই সময় কুন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগকে বলিলেন, 'বৎসগণ, কর্ণের জন্যও জলাঞ্জলি দাও, সে তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভাই ছিল।'

হায়! চিরকাল কর্ণের সহিত সাংঘাতিক শত্রুতা করিয়া তাঁহাকে আহ্লাদ পূর্বক নিধনের পর ইহা কী নিদারুণ সংবাদ! সে সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরপুরুষেরাও স্থির থাকিতে পারিলেন না।

তখন যুধিষ্ঠির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কুন্তীকে বলিলেন, 'মা, তুমি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা গোপন করিয়া কী অন্যায় কাজই করিয়াছ। আমরা তাঁহাকে বধ করিয়াছি, একথা ভাবিয়া এখন বুক ফাটিয়া যাইতেছে। হায়! একথা আগে বলিলে কি আর এ নিষ্ঠুর যুদ্ধ হইত?'

শান্তিপর্ব

যদবধি যুধিষ্ঠির একথা জানিতে পারিলেন যে, কর্ণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভাই, সেই অবধি তাঁহার শোকে এবং না জানিয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য দুঃখ আর অনুতাপে তিনি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। যে রাজ্যের জন্য এমন ঘটনা ঘটে, তাহার প্রতি তাঁহার এমন ঘৃণা জন্মিয়া গেল যে, আর কিছুতেই রাজ্য ভোগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। ভাইদিগকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, 'আমার রাজ্য করিতে ইচ্ছা নাই; রাজ্য ছাড়িয়া বনে গিয়া আমি তপস্যা করিব।'

একথায় সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। যে রাজ্যের জন্য এত ক্লেশ, এত রক্তপাত, সে রাজ্য হাতে পাইয়া কোন রাজা তাহা পালন এবং রক্ষায় অবহেলা করিতে পারে? বনে যাওয়াই যদি কর্তব্য হয় তবে এত কাণ্ডের কী প্রয়োজন ছিল? না হয় এই রাজ্য দ্বারা দান-যজ্ঞাদি ধর্ম-কাজই হউক না, ইহা ছাড়িয়া দিলে কি প্রশংসার কাজ হইবে?

এইরূপে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী সকলে মিলিয়া যুধিষ্ঠিরকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হইল না। তিনি সবিনয়ে ব্যাসকে বলিলেন, 'ভগবন্, ধর্মের কথা আমাকে আরো ভালো করিয়া বলুন। কীরূপে একজন লোক রাজ্যও করিতে পারে, আর ধর্মও করিতে পারে, একথা না বুঝিতে পারিয়া আমার মনে বড়ই চিন্তা হইতেছে।' তখন ব্যাস

তাঁহাকে বলিলেন, 'যদি ভালো করিয়া ধর্মের কথা শুনিতে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মের নিকটে যাও, তিনি তোমার সংশয় দূর করিবেন। তিনি দেহত্যাগ না করিতে করিতে শীঘ্র তাঁহার নিকট যাও।'

কৃষ্ণও বলিলেন, 'মহাশয়, অতিশয় শোক করা আপনার মতো লোকের উচিত নহে। মহর্ষি ব্যাস যাহা বলিলেন, তাহাই করুন।'

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে সকলে নগরের বাহিরেই বাস করিতেছিলেন ; এ পর্যন্ত তাঁহাদের হস্তিনায় প্রবেশ হয় নাই। ব্যাস এবং কৃষ্ণের উপদেশে এবং ভীষ্মের কথা শুনিবার আশায় মনে কতটা শান্তিলাভ করাতে, এখন যুধিষ্ঠির হস্তিনায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন শুভ্র সুন্দর সুসজ্জিত ষোড়শ-বৃষযুক্ত শ্বেত রথে যুধিষ্ঠিরকে তুলিয়া অর্জুন তাহার উপরে নির্মল শ্বেত ছত্র ধারণ করিলেন ; নকুল,সহদেব শুভ্র চামর লইয়া ব্যাজন করিতে লাগিলেন ; ভীম বল্গা হস্তে সেই রথের সারথি হইলেন। কৃষ্ণ সেই রথে চড়িয়া সঙ্গে চলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, , গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলে কেহ শিবিকায়, কেহ রথে তাঁহাদের অনুগামী হইলেন।

নগরবাসিগণের তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা যত্নে রাজপথ গৃহতোরণাদি সাজাইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। জনতার জয়গীতে দুন্দুভি-রব, শঙ্খনাদ ও দ্বিজগণের আশীর্বাদ মিলিয়া সে সময়ে এমনি একটি সুখের ব্যাপার হইয়াছিল যে, তাহার আর তুলনা নাই।

ইহার মধ্যে চার্বাক নামক একটা দুষ্ট রাক্ষস ভিক্ষুকের বেশে আসিয়া বড়ই রসভঙ্গ করিয়া দিল। হতভাগা দুর্যোধনের বন্ধু, পাণ্ডবদিগের অনিষ্টের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণেরা যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করিতেছেন তাহাতে দুষ্ট আসিয়া বলিল কি যে, 'মহারাজ, ব্রাহ্মণগণ জ্ঞাতিবধের জন্য আপনাকে দুষ্ট রাজা বলিয়া গালি দিতেছেন। আপনার জীবনের কোনো প্রয়োজন নাই, আপনার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।'

একথা শুনিয়া ক্রোধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণগণের কথা সরিল না। ইহার মধ্যে যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'হে দ্বিজগণ, আপনারা দয়া করিয়া আমাকে গালি দিবেন না, আমি অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিব।'

তখন ব্রাহ্মণেরা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ, আমরা আপনাকে গালি দিই নাই। আপনার মঙ্গল হউক ! এই দুরাত্মা দুর্যোধনের বন্ধু, চার্বাক নামক রাক্ষস। দুর্যোধনের বন্ধু বলিয়াই দুষ্ট আপনাকে গালি দিয়াছে, আমরা কিছু বলি নাই। আপনি কোনো ভয় করিবেন না।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বিষম রোষনয়নে চার্বাকের দিকে চাহিবামাত্র দুরাত্মার প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

তারপর বিধিমতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হইয়া গেলে তিনি উপযুক্ত লোকদিগের হাতে রাজ্যের কাজ বাঁটিয়া দিলেন। ভীম হইলেন যুবরাজ, বিদুর হইলেন মন্ত্রী, সঞ্জয় আয়-ব্যয় পরীক্ষক, নকুল সৈন্য-পরিদর্শক, অর্জুন শত্রু ও দুষ্টের শাসক, সহদেব দেব-রক্ষক, ধৌম্য দেবসেবা-সম্পাদক। সকলের প্রতি আদেশ রহিল, যে ধৃতরাষ্ট্র যখন যেরূপ আজ্ঞা দেন, তাঁহারই মতে চলিতে হইবে।

এইরূপে রাজকার্যের সুন্দর ব্যাবস্থা করিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্মের নিকটে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সেই শরশয্যার দিন হইতে ভীষ্ম সেইভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিয়া সূর্যের উত্তরায়নের (অর্থাৎ আকাশের উত্তর ভাগে যাওয়ার) অপেক্ষা করিতেছেন। উত্তরায়ন আরম্ভ হইলেই সে

মহাপুরুষের দেহত্যাগের সময় হইবে। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, কৃপ, সঞ্জয় প্রভৃতি রথে চড়িয়া যাত্রা করিলেন।

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই মহাবীরের মৃত্যু-শয্যার চারিদিকে মুনিঋষিগণ ঘিরিয়া বসায় সে স্থানের এক অপূর্ব শোভা হইয়াছে। দূর হইতে তাহা দেখিয়াই সকলে রথ হইতে নামিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

তখন কৃষ্ণ ভীষ্মের নিকট বিনয়ের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, 'হে কুরুপিতামহ, আপনার তুল্য মহৎ লোক এই পৃথিবীতে কেহই নাই। ধর্মের সকল তত্ত্বই আপনার জ্ঞাত। রাজা যুধিষ্ঠির শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন। এ সময়ে আপনি দয়া করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলে তাঁহার শান্তিলাভ হইতে পারে।'

যুধিষ্ঠির লজ্জায় ভীষ্মের নিকটে গিয়া কথা বলিতে সাহস পান নাই। কিন্তু ভীষ্মের মনে যুধিষ্ঠিরের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ ছিল না। যুধিষ্ঠিরের লজ্জার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'যুধিষ্ঠির তো যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্মই পালন করিয়াছেন ; সুতরাং ইহাতে তাঁহার লজ্জিত হইবার কারণ নাই।'

তখন যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছে আসিয়া ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলে ভীষ্ম তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্বক বলিলেন, 'তোমার কোনো ভয় নাই : মন খুলিয়া আমাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা কর।'

এই সময় কৃষ্ণ ভীষ্মের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা-দুর্বলতা দূর করিয়া দিলেন।

তারপর বহুদিন পর্যন্ত প্রত্যহ যুধিষ্ঠির সেই মহাপুরুষের নিকট আসিয়া যে সকল অমূল্য উপদেশ পাইয়াছিলেন, তোমরা বড় হইয়া তাহা পড়িবে। এমন উপদেশ যে-সে দিতে পারে না। তাই যুধিষ্ঠির উপদেশ লইতে আসিলে নারদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'এই মহাত্মা ধর্মের সকল সংবাদ জানেন, ইনি বাঁচিয়া থাকিতে তাহা শুনিয়া লও।'
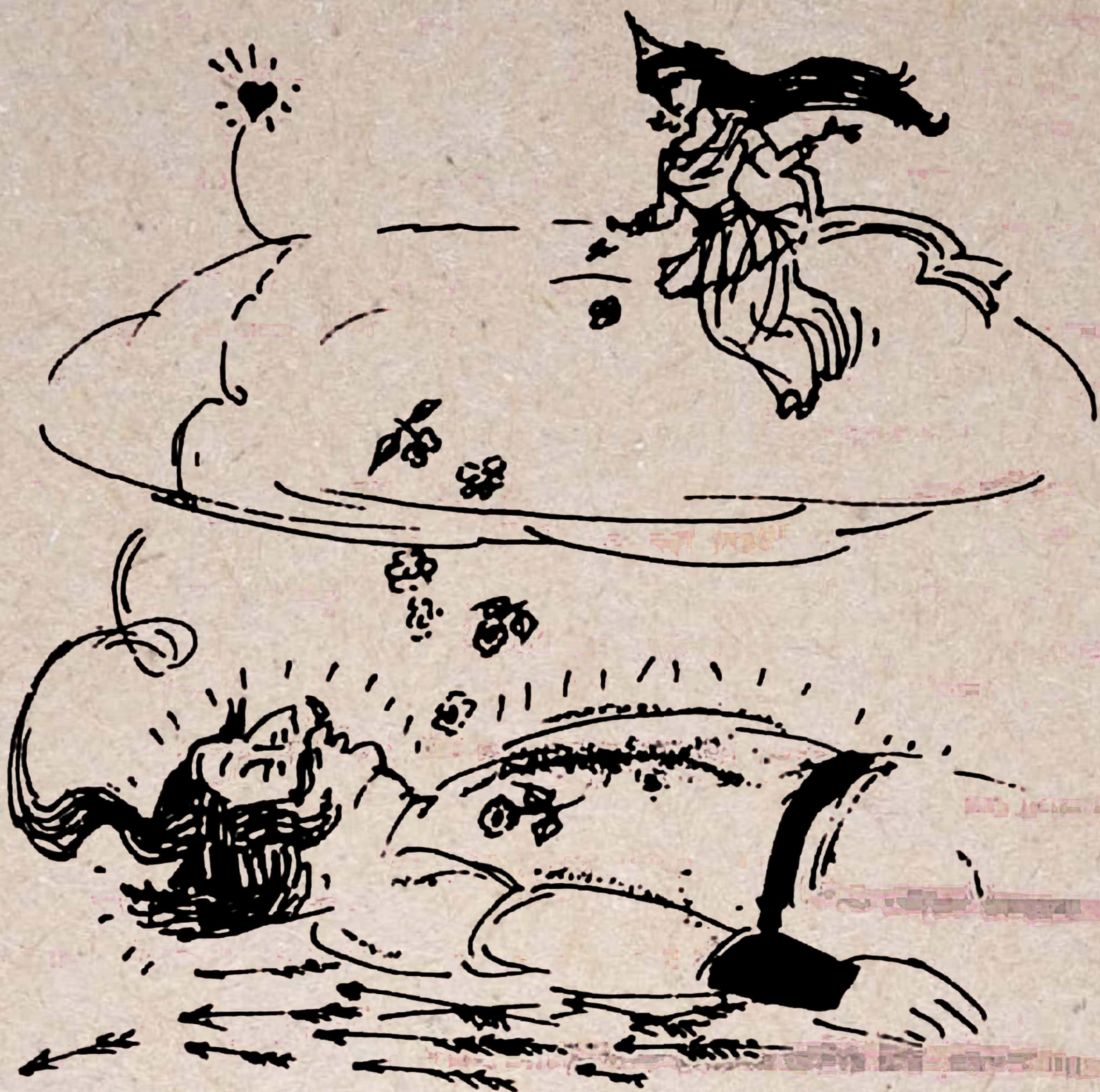
অনুশাসনপর্ব

অশেষ উপদেশ দ্বারা যুধিষ্ঠিরের মনের সকল সংশয় দূর করিয়া ভীষ্মদেব চুপ করিলে চারিদিকের লোকেরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছবির ন্যায় চুপ এবং নিঃশব্দ হইয়া রহিল। তারপর যুধিষ্ঠির তাঁহার পায়ের ধূলা ও আশীর্বাদ লইয়া হস্তিনায় ফিরিলেন। বিদায়কালে ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন, 'সূর্যদেবের উত্তরায়ন আরম্ভ হইলে আমার নিকট আসিও।'

তারপর কিছুদিন গেলে যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ আসিয়াছে। উহাই সূর্যের উত্তরায়নের সময় ; এই সময়েই ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ করিবার কথা। সুতরাং তিনি অবিলম্বে পুরোহিত, পুরজন প্রভৃতি সকলকে সঙ্গে লইয়া, রত্ন গন্ধদ্রব্য পট্টবস্ত্র চন্দনাদি সহ কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, বিদুর, সাত্যকি প্রভৃতিও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

ভীষ্মদেবের শরশয্যার চারিধারে ব্যাস নারদ প্রভৃতি মুনিরা ও নানা দেশের রাজগণ বসিয়া আছেন, এমন সময় যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম

বলিলেন, 'তোমরা আসাতে আমি বড় সুখী হইলাম। এই শরশয্যায় আমার আটান্ন দিন কাটিয়াছে ; এখন মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ উপস্থিত।'

তাপর তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 'ধর্মের কথা তোমার অজানা নাই ; সুতরাং আর শোক করিও না। এখন তুমি পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন কর।'

কৃষ্ণকে তিনি বলিলেন, 'আমার দেহত্যাগের সময় উপস্থিত ; অতঃপর আমার যেন স্বর্গলাভ হয়।'

সকলের প্রতি তাঁহার শেষ কথা হইল, 'তোমরা অনুমতি কর, আমি দেহত্যাগ করি। তোমাদের বুদ্ধি যেন কদাপি সত্যকে পরিত্যাগ না করে ; সত্যের তুল্য আর বল নাই।'

তারপর সেই মহাপুরুষ মৌনাবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগে উদ্যত হইলে, শরসকল একে-একে তাঁহার শরীর হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার দেহে একটি শরের দাগও রহিল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার উজ্জ্বল আত্মা তাঁহার মস্তক হইতে উঠিয়া স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি এবং দুন্দুভিবাদ্য আরম্ভ করিলেন।

এমন মহাত্মার জন্য কী শোক করিতে হয়! বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব প্রভৃতি তাঁহাকে মহামূল্য পট্টবস্ত্র ও উষ্ণীষ পরাইয়া তাঁহার উপরে উৎকৃষ্ট ছত্র ধারণপূর্বক চামর দোলাইতে লাগিলেন। নারীগণ তালবৃন্ত হস্তে চারিদিকে দাঁড়াইয়া ব্যজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অশ্বমেধিকপর্ব

রাজ্যলাভের পর যুধিষ্ঠিরের প্রথম কীর্তি হইল অশ্বমেধ যজ্ঞ। যুধিষ্ঠিরের শোক কিছুতেই একেবার দূর না হওয়ায় সকলে তাঁহাকে এই মহাযজ্ঞে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কিন্তু উহা অতি বৃহৎ এবং কঠিন ব্যাপার। অল্প ধন লইয়া কিছুতেই তাহাতে হাত দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং যুধিষ্ঠির এ যজ্ঞ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াও ইহা আরম্ভ করিতে ভয় পাইলেন। ধন-রত্ন যাহা কিছু ছিল যুদ্ধে প্রায় তাহার সমস্তই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখন অশ্বমেধ যজ্ঞের উপযুক্ত ধন কোথায় পাওয়া যাইবে? যুধিষ্ঠিরের এইরূপ চিন্তা দেখিয়া ব্যাস তাঁহাকে বলিলেন, 'বৎস, তুমি চিন্তা করিও না, ধন সহজেই পাওয়া যাইবে। পূর্বে মহারাজ মরুত্ত হিমালয় পর্বতে যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে এত অধিক সুবর্ণ দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহিতে না পারিয়া সেইখানেই ফেলিয়া আসেন। সেই সুবর্ণ এখনো তথায় রহিয়াছে। তাহা আনিলে অনায়াসে তোমার যজ্ঞ হইতে পারে।'

একথায় যুধিষ্ঠির হর্ষভরে অমাত্যগণের সহিত সেই ধন আনয়নের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল,সহদেব প্রভৃতি সকলেই বলিলেন, 'ব্যাসদেবের পরামর্শ অতি উত্তম।' সুতরাং অবিলম্বে মরুত্তের যজ্ঞের সোনা আনিবার জন্য হিমালয় যাত্রার আয়োজন হইল। সেখানে গিয়া উহা খুঁজিয়া বাহির করিতেও বিশেষ ক্লেশ হইল না।

সেকালের লোক এত ধন কোথায় পাইত? আর, না জানি তাহারা কীরূপ মহাশয় লোক ছিল যে, এত ধন দান করিত! মরুত্ত রাজার যজ্ঞের সেই সোনা আনিতে ষাট লক্ষ উট, এক কোটি ত্রিশ লক্ষ ঘোড়া, দুই লক্ষ হাতি, এক লক্ষ রথ, এক লক্ষ গাড়ি লাগিয়াছিল। আর মানুষ আর গাধা যে কত লাগিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। এতগুলিতেও কি সে ধন সহজে আনিতে পারিয়াছিল? তাহারা সেই সোনার ভারে বাঁকা হইয়া, দিনে দুই ক্রোশের অধিক পথ চলিতে পারে নাই।

এত ধন যে যজ্ঞে ব্যয় হইয়াছিল তাহা যে কত বড় যজ্ঞ, বুঝিয়া লও। একটি প্রশস্ত ভূমি খাঁটিয়ে সোনায় মুড়িয়া তাহার উপর যজ্ঞের গৃহাদি প্রস্তুত হইল। জমিটি যেমন, ঘর-বাড়িও অবশ্য তাহার উপযুক্তই হইয়াছিল। এদিকে অর্জুন, ইহার অনেক পূর্বেই গাণ্ডীব হাতে একটি সুন্দর ঘোড়ার পশ্চাতে পৃথিবীর সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক বৎসর দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া ঘোড়া ফিরিয়া আসিবে। ইহার মধ্যে কাহাকেও সে ঘোড়া আটকাইতে দেওয়া হইবে না। আর অর্জুন যাহার রক্ষক, তাহাকে কেহ আটকাইয়া রাখিবার আশঙ্কাও নাই।

অর্জুনের যাত্রাকালে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, 'যাহারা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের পুত্রপৌত্রদিগকে বধ করিও না।' অর্জুন যথাসাধ্য এই আজ্ঞা পালনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেজন্য তাঁহাকে বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইল। কুরুক্ষেত্রে কত রাজাই পাণ্ডবদিগের হাতে মারা গিয়াছে। তাহাদের দেশে গেলেই তাহাদের পুত্র, পৌত্র আর দেশের লোকেরা ক্ষেপিয়া অর্জুনকে মারিতে আইসে। তিনি তাহাদিগকে অধিক বাণ মারেন না, পাছে বেচারারা মারা যায়, কিন্তু তাহারা তাহাতে মনে করে বুঝি তিনি ভালোরূপ যুদ্ধই করিতে পারেন না; কাজেই তাহারা মহোৎসাহে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করে। সুতরাং তখন তিনি তাহাদের দু-চার জনকে মারিতে বাধ্য হন। তারপর তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া তাঁহার নিকট হাত জোড় করিতে থাকে।

ত্রিগর্ত দেশে সুশর্মার পুত্র ধৃতবর্মার সহিত এইরূপ হইল। প্রাগ্-জ্যোতিষে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের সহিত এইরূপ হইল। সিন্ধুদেশে জয়দ্রথের আত্মীয়গণও এইরূপ আরম্ভ করিল। শেষে তাহাদের অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় তিনি তাহাদের মাথা কাটিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের আর দুর্দশার সীমা রহিল না।

এমন সময় জয়দ্রথের স্ত্রী দুঃশলা তাঁহার শিশু পৌত্রটিকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অর্জুনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুঃশলা ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা, সুতরাং অর্জুনের ভগিনী। তাঁহাকে দেখিবামাত্র অর্জুন গাণ্ডীব রাখিয়া দিয়া বলিলেন, 'ভগিনী, তোমার কী কাজ করিব, বল।'

ইহার উত্তরে দুঃশলা যাহা বলিলেন তাহাতে অর্জুনের মনে বড়ই ক্লেশ হইল। জয়দ্রথের সহিত দুঃশলার বিবাহ হইয়াছিল। জয়দ্রথের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুরথ পিতার শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। ইহার উপরে যখন তিনি শুনিলেন যে, অর্জুন যজ্ঞের ঘোড়া-সমেত আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার মৃত্যু হইল। এখন দুঃখিনী বিধবা দুঃশলা পতিপুত্রের শোকে অস্থির হইয়া পৌত্রটিকে অর্জুনের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন, যদি

তাহাকে দেখিয়া অর্জুনের দয়া হয়।

ছেলেটি যখন মাথা হেঁট করিয়া কাতরভাবে অর্জুনকে প্রণাম করিল তখন আর তিনি চক্ষের জল রাখিতে না পারিয়া বলিলেন, 'ক্ষত্রিয়ের ধর্মকে ধিক, এই ধর্ম পালন করিতে গিয়াই বন্ধু-বান্ধবদিগকে বধ করিয়াছি!' এই বলিয়া তিনি দুঃশলাকে সাদর মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া তথা হইতে বিদায় হইলেন।

মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বিবাহ করিয়াছিলেন। এখন সেই চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন মণিপুরের রাজা। ঘোড়া মণিপুরে উপস্থিত হইলে বভ্রুবাহন তাঁহার পিতার আগমন-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রই পাত্রমিত্রসমেত অতি বিনীতভাবে অর্জুনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু অর্জুন ইহাতে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না; তিনি বভ্রুবাহনকে বলিলেন, 'আমি আসিলাম যুদ্ধ করিতে, আর তুমি করজোড়ে আসিয়া আমার কাছে উপস্থিত হইলে! ইহা কখনই ক্ষত্রিয়ের কাজ নহে। ইহা কাপুরুষের কাজ। তোমাকে ধিক! তোমার জীবনে প্রয়োজন কী?'

একথায় বভ্রুবাহন নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে সেই যে উলুপী নাম্নী নাগকন্যার সহিত অর্জুনের বিবাহ হইয়াছিল, তিনি আসিয়া বভ্রুবাহনকে বলিলেন, 'বাছা, আমি তোমার বিমাতা উলুপী। তোমরা পিতা যখন যুদ্ধের বেশে আসিয়াছেন, ইঁহার সহিত যুদ্ধ করাই তোমার উচিত। তাহাতে উনি সন্তুষ্ট হইবেন।'

তখন বভ্রুবাহন বিপুল যুদ্ধের আয়োজন করিয়া সৈন্যদিগকে আদেশ দিবামাত্রই তাহারা ঘোড়া আটকাইয়া ফেলিল। তাহাতে অর্জুন অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্ষণেকের ভিতরেই বভ্রুবাহনের বাণে তাঁহাকে অজ্ঞান হইতে হইল।

জ্ঞান হইলে অর্জুন বভ্রুবাহনকে বলিলেন, 'বাঃ! এই তো চাই! আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আচ্ছা এখন আমি মারি, স্থির হইয়া সামলাও তো!' তারপর অর্জুন অসংখ্য নারাচ ছুঁড়িয়া মারিলে বভ্রুবাহন তাহার সমস্তই কাটিলেন। কিন্তু তাহার পরের ভয়ানক বাণগুলি ফিরাইতে না পারায়, তাঁহার রথের ধ্বজ আর ঘোড়া কাটা গেল। তখন তিনি রথ হইতে নামিয়া এমনই ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যে, তাহা দেখিয়া অর্জুনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এমন সময় বভ্রুবাহন কী যে একটা বাণ মারিলেন, তাহা নিমেষমধ্যে অর্জুনকে একেবারে মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিল। বভ্রুবাহনও তাহা দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

এই বিষম বিপদের সময় চিত্রাঙ্গদা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানে আসিয়া উলুপীকে দেখিয়াই বলিলেন, 'উলুপী, তোমার দোষেই এই বিপদ উপস্থিত হইল!' বভ্রুবাহনও সেই সময় জ্ঞানলাভ করিয়াই উলুপীকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন, 'পিতাকে মারিয়াছি, সুতরাং আমিও এখনি প্রাণত্যাগ করিব। তাহা হইলে হয়ত তুমি সন্তুষ্ট হইবে।'

উলুপী যথাসাধ্য ইহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া তখনি নাগলোক হইতে সঞ্জীবনী মণি আনাইলেন। সে মণির কী আশ্চর্য গুণ! উহা অর্জুনের বুকে স্থাপন করিবামাত্রই তিনি চক্ষু মার্জনা পূর্বক উঠিয়া বসিলেন, যেন তাঁহার ঘুম ভাঙিল।

তারপর অবশ্য খুব সুখের অবস্থাই হইল। আর তখন একথাও জানা গেল যে, উলুপী আতি মহৎ অভিপ্রায়েই এই ব্যাপার ঘটাইয়াছিলেন। শিখণ্ডীর সহায়তায় ভীষ্মকে বধ করাই অর্জুনের যথেষ্ট অপরাধ হইয়াছিল। সেই অপরাধে বসুগণ এবং গঙ্গাদেবী তাঁহাকে শাপ দিতে উদ্যত হন। উলুপী সে সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং তাহার পিতা সেই দেবতাদিগকে অর্জুনের

প্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য বিস্তর মিনতি করায় তাঁহারা বলেন যে, বভ্রুবাহন অর্জুনকে বধ করিলে তবে তাঁহার শাপ কাটিবে। এইজন্যই উলুপী বভ্রুবাহনকে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দেন। তিনি জানিতেন যে, অর্জুনকে বাঁচাইবার ঔষধ তাঁহার ঘরে আছে। এ সকল কথা জানিতে পারিয়া সকলেই যে উলুপীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কী!

তারপর বভ্রুবাহন, চিত্রাঙ্গদা আর উলুপীকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণপূর্বক অর্জুন তথা হইতে পুনরায় যাত্রা করিলেন।

মগধে জরাসন্ধের নাতি মেঘসন্ধি ও অন্যান্য অনেকে মূর্খের ন্যায় মনে করিয়াছিলেন যে, অর্জুন অপেক্ষা তিনি নিজে অধিক যোদ্ধা। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কথা মনে করিয়া যতই তাঁহাকে বাঁচাইয়া বাণ মারিতে যান, ততই তাঁহার আরো সাহস বাড়িয়া যায়। শেষে অবোধের যে দশা সচরাচর হয় তাঁহারও তাহাই হইল। তাঁহার আর অস্ত্র নাই। তখন অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি ছেলেমানুষ হইয়া বেশ যুদ্ধ করিয়াছ, এখন ঘরে যাও। আমি তোমাকে বধ করিব না।' তাহাতে মেঘসন্ধি করজোড়ে কহিলেন, 'মহাশয়, আমি পরাজিত হইয়াছি। এখন অনুমতি করুন কী করিব।' অর্জুন বলিলেন, 'চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ দেখিতে যাইবে।' এই বলিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

গান্ধার দেশে শকুনির পুত্রও প্রথমে ভারি তেজ দেখাইয়াছিলেন। অর্জুন কৃপাপূর্বক তাঁহার মাথা না কাটিয়া পাগড়িটি উড়াইয়া দিলে তাঁহার চৈতন্য হইল। এইরূপে এক বৎসর কাল ঘোড়াটিকে দেশে দেশে ভ্রমণ করাইয়া তাহাকে হস্তিনায় ফিরাইয়া আনিলে, ঘোড়ার মাংস দিয়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। সেরূপ যজ্ঞ আর তাহার পরে কখনো হয় নাই। এমন কোনো আত্মীয়স্বজন, এমন কোনো রাজা-রাজড়া, এমন কোনো মুনি-ঋষি বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না যিনি সেই যজ্ঞে না আসিয়াছিলেন।

আর, ভোজনের বিষয় কী বলিব! অন্নের পর্বত, ঘৃত-দধির নদী, আর মিঠাই-মণ্ড কী পরিমাণে তাহা বলিতে পারি না। হাজার হাজার লোক মণিকুণ্ডল আর সুবর্ণমাল্যে সুসজ্জিত হইয়া সেই সকল সুমধুর খাদ্য পরিবেশন করিয়াছিল। এক-এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন আরম্ভ হইলে এক-একবার দুন্দুভি বাজিল। এইরূপে যজ্ঞের কয়েক দিনের মধ্যে কত শতবার যে দুন্দুভি বাজিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই।

এইরূপে সমারোহে সেই মহাযজ্ঞ শেষ হইল। এই যজ্ঞে একটি অদ্ভুত ঘটনা হয়। যজ্ঞশেষে সকলেই যুধিষ্ঠিরের অতিশয় সুখ্যাতি করিতেছেন, এমন সময় একটি আশ্চর্য নকুল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহার চক্ষু দুইটি নীল, মাথা আর শরীরের এক পাশ সোনার। নেউল আসিয়া ঠিক মানুষের মতো বলিতে লাগিল, 'হে রাজামহাশয়গণ, উঞ্ছবৃত্তি নামক ব্রাহ্মণ যে ছাতু দান করিয়াছিলেন, সে কাজ আপনাদের যজ্ঞের চেয়ে অনেক বড়।'

একথায় সকলে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি এমন কী দেখিয়াছ শুনিয়াছ যে, এই যজ্ঞকে তাহা অপেক্ষা কম মনে করিলে?'

তাহাতে নেউল বলিল, 'আপনারা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। উঞ্ছবৃত্তি নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার স্ত্রী, এক পুত্র ও পুত্রবধূ ছিল। ক্ষেত্রে শস্য কাটিয়া নিলে যাহা পড়িয়া থাকে, উঞ্ছবৃত্তি এবং তাহার পরিবার সেই শস্যমাত্র আহার করিতেন। এইরূপে তাঁহাদের দিন যাইত।

'তারপর দেশে দুর্ভিক্ষ আসিল, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইল, ব্রাহ্মণের কষ্টও বৃদ্ধি পাইল। তখন

কোনোদিন অতি কষ্টে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ আহার জুটিত, কোনোদিন একেবারেই জুটিত না।

এই সময়ে একবার সারাদিন ঘুরিয়া শেষ বেলায় ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ যব পাইলেন। তাহাতে তাঁহার পরিবারের লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া সেই যবের ছাতু প্রস্তুত করিলেন। তারপর সকলে স্নান-আহ্নিক অন্তে সেই ছাতু আহারের আয়োজন করিলেন।

এমন সময় সেখানে এক অতিথি ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ সেই অতিথিকে আদরের সহিত তাঁহার নিজের ভাগের ছাতু আহার করিতে দিলেন; কিন্তু অতিথি তাহাতে তৃপ্তি হইল না।

'তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন ;কিন্তু তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁহার নিজের ভাগ অতিথিকে দিলেন ; কিন্তু তথাপি তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

তখন ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ তাঁহার নিজের ভাগ আনিয়া অতিথিকে দিলেন। ইহাতে সেই অতিথি পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে ধার্মিক, ঐ দেখ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, দেবতারা তোমাদের স্তব করিতেছেন। এখন তুমি পরম সুখে সপরিবারে স্বর্গে চলিয়া যাও।"

সেই অতিথি ছিলেন স্বয়ং ধর্ম। তাঁহার কথায় ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূসহ তখনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তারপর আমি গর্ত হইতে উঠিয়া সেই অতিথির পাতের উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। তাহাতেই এই দেখুন, আমার অর্ধেক শরীর স্বর্ণময় হইয়া গিয়াছে।

সেই অবধি আমি আমার অবশিষ্ট শরীরটুকু স্বর্ণময় করিবার আশায় যজ্ঞস্থান দেখিলেই তাহাতে গড়াগড়ি দিয়া থাকি। আজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের কথা শুনিয়া অনেক আশায় এখানে আসিয়া গড়াগড়ি দিলাম। কিন্তু আমার শরীরের অপর অর্ধাংশ সোনার হইল না। তাই বলিতেছি যে, সেই ব্রাহ্মণ যে অতিথিকে ছাতু খাওয়াইলেন, তাহা ইহার চেয়ে বড় কাজ।'

এই বলিয়া নেউল তথা হতে প্রস্থান করিল।

আশ্রমবাসিকপর্ব

রাজা হইয়া যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর সহিত এমন মিষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে তাহাতে তাঁহারা তাঁদের সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। দুর্যোধনের কথা মনে করিয়া এখন যুধিষ্ঠিরের উপর তাঁহাদের রাগ হওয়া দূরে থাকুক, বরং যুধিষ্ঠিরের গুণের কথা ভাবিয়া দুর্যোধনকেই অতিশয় দুষ্ট লোক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির ইঁহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন,অর্জুন, নকুল, সহদেব, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতিও সেইরূপই ব্যবহার করিতেন। বাস্তবিক, ইঁহাদের নিকট ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী যেমন ভক্তি ও ভালোবাসা পাইতে লাগিলেন, নিজপুত্রগণের নিকটও তাহা পান নাই।

পনর বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে পূর্বে যে যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তাহার দুঃখের কথা ভাবিয়া ক্রমে আর সকলেই তাহা ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু ভীম তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। এজন্য অন্য সকলের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে সম্মান এবং ভালোবাসা দানে তিনি অক্ষম হইলেন।

ভীমের এই ভাব ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষে এমন হইল যে, তিনি গোপনে ধৃতরাষ্ট্রের অসম্মান করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রের কীরূপ কষ্টের কারণ হইল, তাহা বুঝিতেই পার।

এই সময়ে ভীম একদিন যুধিষ্ঠির, অর্জুন প্রভৃতির অসাক্ষাতে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীকে শুনাইয়া নিজ বন্ধুদিগের নিকট বলিতেছিলেন, 'আমি আমার এই চন্দন-মাখা দু-খানি হাত দিয়াই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি।'

একথা শুনিয়া গান্ধারী চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তখনি নিজের বন্ধুদিগকে ডাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন 'হে বন্ধুগণ, আমিই যে এই কুরুবংশের নাশের মূল, তাহা তোমরা জান। সকলে যখন আমাকে হিতবাক্য বলিয়াছিল, তখন আমি তাহা শুনি নাই। এতদিনে সেই পাপের দণ্ড গ্রহণ করিতেছি। এখন আমি আর গান্ধারী প্রতিদিন মৃগচর্ম পরিধান, মাদুরে শয়ন এবং দিনান্তে যৎকিঞ্চিৎ ভোজনপূর্বক ভগবানের নাম লইয়া দিন কাটাই। একথা জানিলে যুধিষ্ঠিরের অতিশয় ক্লেশ হইবে বলিয়া কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করি নাই।'

তারপর তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'বাবা যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হউক! তোমার যত্নে এতদিন পরম সুখে কাল কাটাইলাম ; এখন আমাদিগের পরকালের পথ দেখিবার সময় উপস্থিত। সুতরাং অনুমতি দাও, আমি আর গান্ধারী বনে গিয়া তপস্যা করি।'

একথায় যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'জ্যেঠামহাশয়, আমার তুল্য নরাধম আর কেহ নাই! আপনি অনাহারে ভূমিশয্যায় এত কষ্টে কাল কাটাইয়াছেন, আর আমি আপনার সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। আপনি যদি কষ্ট পান, তবে আমার সুখের কী প্রয়োজন? দুর্যোধন আপনার যেরূপ পুত্র ছিল, আমাদিগকেও সেইরূপ মনে করিবেন। আপনি বনে গেলে এই রাজ্য লইয়া আমি কিছুমাত্র সুখ পাইব না। আপনি আমাদিগের দিকে চাহিয়া মনকে শান্ত করুন, আমরা আপনার সেবা করিয়া কৃতার্থ হই।'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'বাবা, বৃদ্ধকালে বনে গিয়া তপস্যা করাই আমাদের কুলের ধর্ম। সুতরাং আমার তাহা করিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। তুমি ইহাতে আমাকে নিষেধ করিও না।'

অনাহারে ধৃতরাষ্ট্রের শরীর এতই দুর্বল হইয়াছিল যে, তিনি এইটুকু বলিতে বলিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠিরের অতিশয় দুঃখ হইল বটে, কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা ও বিস্তর মিনতি করিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের মত ফিরাইতে পারিলেন না। ইহার উপরে আবার ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্রের কথায় সম্মত হইতে বলিলেন, কাজেই শেষে তাঁহাকে তাহাই করিতে হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্র বিনয় বচনে প্রজাদিগের নিকট বিদায় লইয়া মৃত পুত্র এবং আত্মীয়গণের কল্যাণার্থে অনেক ধনদানপূর্বক বনগমনে উদ্যত হইলেন।

কার্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন বল্কল এবং মৃগচর্ম পরিধানপূর্বক ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী বিদুর এবং সঞ্জয়কে লইয়া গৃহের বাহির হইলে, স্ত্রী পুরুষ সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। কুন্তী এবং গান্ধারীর কাঁধে ভর দিয়া ধৃতরাষ্ট্র আগে আগে যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা প্রভৃতি সকলেই চলিলেন। সকলেরই চোখে জল, কাহারও মনস্থির রাখিবার শক্তি নাই। নগরের বাহিরে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকলকে বলিলেন, 'এখন তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।' একথায় আর অন্য সকলেই নিরস্ত হইল, কিন্তু বিদুর, সঞ্জয় এবং কুন্তী আর ফিরিলেন না।

কুন্তীকেও বনে যাইতে দেখিয়া পাণ্ডবদিগের যে কী দুঃখ হইল তাহা আমার কী সাধ্য যে লিখিয়া জানাই! তাঁহারা অতি কাতরস্বরে সাশ্রুনয়নে কত মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। তখন অগ্যতা তাহার নিকট বিদায় লইয়া সকলকে হস্তিনায় আসিতে হইল।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর আর সঞ্জয় অনেক পথ চলিয়া গঙ্গাতীরে, এবং তথা হইতে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনেক তপস্বীর আশ্রম ছিল। সেই সকল আশ্রমের নিকট থাকিয়া তাহারা বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণপূর্বক কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। এইরূপে কিছুদিন গেল।

পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে বিদায় দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা চলিয়া গেলে পর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। এমনকি, ইঁহাদের শোকে যুধিষ্ঠিরের রাজকার্য করাই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুতরাং একদিন তিনি সকলকে লইয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে দেখিবার জন্য বনে যাত্রা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের কাছে আসিয়া তাঁহারা তপস্বিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাদের জ্যেঠামহাশয় কোথায়?'

তপস্বীরা বলিলেন, 'তিনি যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছেন। আপনারা এই পথে যান।'

সেই পথে খানিক দূরে গিয়াই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তি আর সঞ্জয় স্নানান্তে কলসী হাতে আশ্রমে ফিরিতেছেন। সহদেব কুন্তীকে দেখিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। অন্য সকলেরও চক্ষে জল আসিল। তখন তাঁহারা দ্রুতপদে গিয়া ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীকে প্রণামপূর্বক তাঁহাদের হাত হইতে কলসী গ্রহণ করিলেন।

তাহার পর তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। সেই সময়ের জন্য তাঁহাদের মনের সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল। তখন ধৃতরাষ্ট্রের বোধ হইতে লাগিল, তিনি হস্তিনাতেই রহিয়াছেন। আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় মাত্র আছেন, কিন্তু বিদুর কোথায়? বিদুরকে দেখিতে না পাইয়া যুধিষ্ঠির ব্যাকুলচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জ্যোঠামহাশায়, বিদুর কাকা কোথায়?'

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, 'তিনি আহার ত্যাগপূর্বক ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তপস্বীরা বনে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে পান।'

এমন সময় সেই আশ্রমের নিকটেই বিদুরকে দেখিতে পাওয়া গেল। তাঁহার মস্তক জটাকুল, শরীর কর্দমাক্ত—অস্থিচর্মসার এবং পরিচ্ছদবিহীন একটিবার তিনি আশ্রমের দিকে তাকাইয়াই আবার প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠিরও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাতে বনের দিকে ছুটিতে ছুটিতে বলিতে লাগিলেন, 'কাকা, আমি যে আপনার যুধিষ্ঠির; আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি!'

তখন সে বিজন বনে বিদুর একটি গাছ ধরিয়া দাঁড়াইলেন, যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আবার বলিলেন, 'আমি আপনার যুধিষ্ঠির; আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি!'

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সেই মহাপুরুষের আত্মা তাঁহার দেহ ছাড়িয়া যুধিষ্ঠিরের দেহে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাঁহার দেহটি তেমনিভাবে গাছ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বোধ হইল যে, তাঁহার বল দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। অমনি দৈববাণী হইল, 'মহারাজ, তুমি ইহার দেহ দাহ করিও না। ইহার জন্য শোক করিও না; কেননা, ইনি

স্বর্গে আসিয়া অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিবেন।'

তখন যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরিয়া এই আশ্চর্য ঘটনার কথা সকলকে বলিলেন। বিদুর যে কে, তার পরদিন ব্যাসদেব সেখানে আসিলে তাঁহার নিকট জানা গেল। মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্মকে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়; তিনিই ছিলেন বিদুর।

সেই সময়ে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী প্রভৃতির মনে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত অতি আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যত বীর মারা গিয়াছিলেন, সকলে ব্যাসের ডাকে পরলোক হইতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে তখন সেই আশ্রমে কী আনন্দের ব্যাপার যে হইয়াছিল, তাহা কী বলিব! ব্যাসের বরে সে সময়ের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের চক্ষুও ভালো হইয়া গেল। সুতরাং তিনিও পুত্রগণকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন। একমাস কাল ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে থাকিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। তারপর দুই বৎসর চলিয়া গেল, একদিন দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারদ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রম দেখিয়া আসিয়াছেন, একথা জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, 'ভগবান, যদি জ্যেঠামশায়, জ্যেঠিমা, মা এবং সঞ্জয়ের কোনো সংবাদ পাইয়া থাকেন, তবে দয়া করিয়া বলুন।'

নারদ বলিলেন, 'তোমরা তপোবন হইতে চলিয়া আসিলে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী আর সঞ্জয় অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। সে সময়ে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী জল ভিন্ন আর কিছুই খাইতেন না, কুন্তী মাসে একবার আহার করিতেন, সঞ্জয় পাঁচ দিনে একবার আহার করিতেন।

একদিন ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী কুন্তীর সঙ্গে বনের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিবার সময়ে ভীষণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। অনাহারে নিতান্ত দুর্বল থাকায় সে আগুন হইতে কোনোমতেই তাঁহাদের পলায়নের শক্তি হইল না। তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিলেন, 'সঞ্জয়, তুমি শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা কর। আমরা এই অগ্নিতেই দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইব।'

এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী এবং কুন্তী পূর্বমুখে বসিয়া ভগবানের ধ্যান আরম্ভ করিলে, দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের দেহ ভস্ম হইয়া গেল।

সঞ্জয় অনেক কষ্টে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়া তাপসগণের নিকট এই সংবাদ প্রদানকালে আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। তপস্বীদিগকে এই সংবাদ দিয়া সঞ্জয় হিমাচলে চলিয়া গিয়াছেন। তারপর আমি তোমাদিগকে এই সংবাদ দিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আসিবার সময় আমি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী আর কুন্তীর শরীর দেখিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করায় তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইবে। অতএব তাঁহাদের জন্য তোমাদের শোক করা উচিত নহে।'

হায়, কী কষ্টের কথা! যুধিষ্ঠির এই দারুণ সংবাদে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হস্তিনায় হাহাকার উঠিল। পাণ্ডবদিগের মনে হইল, গুরুজনেরা যখন এইরূপে পুড়িয়া মরিলেন, তখন আমাদের রাজ্য ধর্ম বীরত্ব সকলই বৃথা।

নারদ উপদেশ দ্বারা তাঁহাদিগকে শান্ত করিলে, সকলে গঙ্গাতীরে গিয়া ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী আর কুন্তীর তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি শেষ করিলেন।

বনবাসে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর তিন বৎসর কাটিয়াছিল।

মৌসলপর্ব

তারপর আঠার বৎসর চলিয়া গেল। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের ছত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইলে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন যে, শীঘ্রই কোনো বিপদ হইবে।

যে বিপদ হইল তাহা পাণ্ডবদের নহে, যাদবদের (অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বংশে জন্মিয়াছিলেন তাঁহাদের)। এইরূপ একটা বিপদ যে হইবে, তাহা কৃষ্ণ আগেই জানিতেন; কিন্তু এমনি হওয়া আবশ্যক বুঝিয়া তিনি তাহাতে ব্যস্ত হন নাই।

বিপদের কারণ অতি সামান্য। যদুকুলের কয়েকটি বালক একটা লৌহমুসলের কথা লইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদকে উপহাস করে। ইহাতে তাঁহারা বিষম ক্রোধভরে এই দারুণ শাপ দেন, এই মুসলের দ্বারাই কৃষ্ণ আর বলরাম ভিন্ন তোমাদের বংশের সকলে বিনষ্ট হইবে।'

কৃষ্ণ জানিতেন যে, এইরূপ হইবে এবং হওয়া আবশ্যক, সুতরাং তিনি আর এই বিপদ নিবারণের কোনো চেষ্টা করিলেন না। মুসলটিকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল। যাদবদিগের মধ্যে অনেকে মদ খাইত। পাছে এই সকল লোক মাতাল হইয়া কোনো একটা কিছু

বিপদ ঘটায়, এজন্য তখন হইতেই মদ্যপান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আশা ছিল ইহাতে লোকের চরিত্র ভালো হইবে, কিন্তু ফল হইল ঠিক তাহার বিপরীত।

এই সময়ে একদিন যাদবেরা সকলে প্রভাসতীর্থে যায়। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, সেখানে গিয়া খুব আমোদ-প্রমোদ করিবে, সুতরাং তাহার আয়োজন সঙ্গে লইতে ভুলিল না। দুঃখের বিষয় এই যে, এত নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা সেই আয়োজনের সঙ্গে মদও লইল। সেই মদে যে কী সর্বনাশ হইল তাহার কথা শুন।

প্রভাসতীর্থে গিয়া বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি সকলে কৃষ্ণের সম্মুখে সুরাপান করিতে লাগিলেন। ইহার পর তাঁহারা মাতাল হইয়া ঝগড়া আরম্ভ করিবেন, তাহা বিচিত্র কী! তখন সাত্যকি কৃতবর্মাকে বলিলেন, 'তুই বড় নির্দয় লোক! ঘুমের ভিতরে লোককে মারিতে গিয়াছিলি।'

ইহাতে কৃতবর্মা চটিয়া বলিলেন, 'তুই তো ভূরিশ্রবার মাথা কাটিয়াছিলি! তোর মতো নির্দয় কে আছে?'

এইরূপে কথায় কথায় বিবাদ আরম্ভ হইয়া শেষে তাহা বড়ই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। সাত্যকি কৃতবর্মার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন, তাহাতে কৃতবর্মার পক্ষের লোকেরা তাঁহাদের নিজ নিজ থালা হাতেই সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন আসিয়া সাত্যকিকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

তারপর ক্রমে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কৃতবর্মার লোকেরা কৃষ্ণের সম্মুখেই সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নকে বধ করিল। তাহাতে কৃষ্ণ নিকটস্থ শরবন হইতে একমুষ্টি শর তুলিয়া লইবামাত্র তাহা একটা মুদ্‌গর হইয়া গেল। সেই মুদ্‌গর দিয়া তিনি কৃতবর্মার পক্ষের লোকদিগকে বিনাশ করিলেন।

মুনির শাপের কী বিষম তেজ! সে সময়ে কেহ একটিমাত্র শর তুলিয়া লইলেও তাহা বজ্রের মতোন হইয়া যাইতে লাগিল। সেই শরের ঘায় কৃষ্ণের সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্র, ভাই, নাতি প্রভৃতির মৃত্যু হইলে তিনি ক্রোধভরে সেখানকার সকলকে মারিয়া শেষ করিলেন।

তারপর কৃষ্ণ, বভ্রু এবং দারুক বলরামকে খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে, তিনি এক বৃক্ষের তলায় বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। তখন কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট সংবাদ দিবার জন্য দারুককে হস্তিনায় পাঠাইয়া বভ্রুকে বলিলেন, 'বভ্রু, তুমি শীঘ্র গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা কর!'

কিন্তু বভ্রু অধিক দূরে না যাইতেই এক ব্যাধের মুদ্‌গর আসিয়া তাঁহার উপর পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হইল। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ বলরামকে সেইখানেই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজেই স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে গেলেন।

নিজের পিতা বসুদেবের হাতে সেই কার্যের ভার দিয়া কৃষ্ণ আবার বলরামের নিকট আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া সহস্রফণাযুক্ত ভয়ংকর এক সাপ নির্গত হইতেছে। উহার শরীর শ্বেতবর্ণ এবং মুখসকল লাল। বাহির হইয়াই সেই সাপ সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিলে, সমুদ্র, বরুণ এবং প্রধান প্রধান নাগগণ তাহার পূজা করিতে করিতে তাহাকে লইয়া গেলেন। বলরামের অসাড় নির্জীব দেহ সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, বলরাম ঐ সর্পরূপেই নিজের দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তিনি বনমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে শয়ন করিয়াছেন, এমন সময়

জরা নামে এক ব্যাধ মৃগ মনে করিয়া তাঁহার প্রতি এক বাণ মারিল। সেই বাণ তাঁহার পদতলে বিঁধিয়া গেল। ব্যাধ জানে হরিণই পড়িয়াছে। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া বুঝিতে পারিল সে কী সর্বনাশ করিয়াছে! অমনি সে কৃষ্ণের পায় লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু কৃষ্ণ তাহার উপরে কিছুমাত্র রাগ না করিয়া তাহাকে সান্ত্বনাদানপূর্বক স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

এদিকে দারুকের নিকট সংবাদ পাইয়া অর্জুন দ্বারকায় আসিয়া দেখিলেন যে, দ্বারকাপুরী শ্মশান হইয়া গিয়াছে। বসুদেব তখনো জীবিত ছিলেন কিন্তু পরদিন তিনিও মারা গেলেন।

তখন আর দুঃখ করিবার সময় ছিল না। বসুদেবের এবং প্রভাসতীর্থে নিহত যাদবগণের সৎকারের জন্য লোক উপস্থিত না থাকায় অর্জুনকেই সর্বাগ্রে সে সকল কাজের চেষ্টা করিতে হইল। তারপর কৃষ্ণের পৌত্র বজ্র এবং দ্বারকার স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিলেন। সেই সময়ে অতি আশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটে। অর্জুন সকলকে লইয়া দ্বারকা নগরের যে স্থানটি ছাড়িয়া গেলেন, তখনি সমুদ্র আসিয়া তাহা গ্রাস করিতে লাগিল। তারপর কী নিদারুণ ব্যাপার হইল শুন। অর্জুন দ্বারকার স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে একদল দস্যু আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তিনি দস্যুনাশার্থ গাণ্ডীব তুলিতে গিয়া দেখেন, দেহে বল কিছুমাত্র নাই, গুণটুকু পরানোই প্রায় অসাধ্য হইয়াছে। বহু কষ্টে যদি গুণ পরানো হইল, উৎকৃষ্ট অস্ত্রগুলির কথা কিছুতেই মনে পড়িল না। হা বিধাতঃ! এমন যে অক্ষয় তূণ, এই বিপদের সময় তাহাও শূন্য হইয়া গেল, কাজেই দস্যুরা স্ত্রীলোকদিগের অনেককে ধরিয়া লইয়া গেল, অর্জুন তাহাদিগকে কিছুতেই বারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভগ্নহৃদয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া তথায় বজ্রকে রাজা করিলেন।

এই সকল ঘটনার কথা ভাবিয়া অর্জুনের মন বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া ব্যাসদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাস তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে অর্জুন? আজ কেন তোমাকে এত চিন্তিত এবং বিষণ্ন দেখিতেছি?' এ-কথার উত্তরে অর্জুন তাঁহাকে কৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্যান্য যাদবগণের মৃত্যুর সংবাদ দিয়া বলিলেন, 'কৃষ্ণের শোকে আমার জীবন ধারণ করাই ভার বোধ হইতেছে, আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। তারপর দ্বারকার নারীগণকে আনয়নকালে একদল দস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করে। ঐ সময়ে আমার গাণ্ডীবে গুণ চড়ানো অতীব ক্লেশকর হইল অক্ষয় তূণ শূন্য হইয়া গেল, দিব্য অস্ত্র সকল কিছুতেই স্মরণে আসিল না। এই সকল ঘটনার কথা ভাবিয়া আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। ভগবন, এখন আমার কী কর্তব্য তাহা বলুন।'

অর্জুনের কথা শুনিয়া ব্যাস বলিলেন, 'এই পৃথিবীতে তোমার কার্য শেষ হইয়াছে। আমার মতে, এখন তোমাদের এ স্থান পরিত্যাগ করাই উচিত। তোমার কাজ শেষ হওয়াতেই দিব্য অস্ত্রসকল তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাই তুমি তাহাদিগকে স্মরণ করিতে পার নাই। এখন তোমাদের স্বর্গারোহণকাল উপস্থিত ; সুতরাং তাহারই চেষ্টা কর।'

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

যদুবংশ বিনাশ ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা শুনিয়া আর যুধিষ্ঠির পৃথিবীতে থাকিতে চাহিলেন না। সুতরাং তিনি মহাপ্রস্থানই (অর্থাৎ প্রাণত্যাগের উদ্দেশ্যে হিমালয়ে প্রস্থান) কর্তব্য বুঝিয়া অর্জুনকে বলিলেন, 'ভাই, আমি ভাবিয়াছি শীঘ্রই দেহত্যাগ করিব । এখন তোমরা কী করিবে স্থির কর।'

অর্জুন বলিলেন, 'আমিও তাহাই স্থির করিয়াছি।'

একথা শুনিয়া ভীম, নকুল সহদেব এবং দ্রৌপদী বলিলেন, 'আমরাও তাহাই করিব।'

এইরূপে সকলের পরামর্শ স্থির হইলে, পরীক্ষিৎকে হস্তিনার রাজা করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এবং দ্রৌপদী মহাপ্রস্থানে উদ্যত হইলেন। প্রজাগণ কাতরস্বরে তাঁহাদিগকে বারণ করিল ; কিন্তু তাঁহারা আর মর্ত্যবাসে সম্মত হইলেন না।

এইরূপে সময়ে করণীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ হইলে পাণ্ডবগণ এবং দ্রৌপদী মহামূল্য বস্ত্রাভরণ

পরিত্যাগপূর্বক বল্কল পরিয়া হস্তিনা নগরকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চিরকালের জন্য তথা হইতে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে একটি কুকুর তাঁহাদের অনুগামী হইল। এ সময়ে পশ্চাৎ হইতে ডাকিতে নাই। নগরবাসীরা নীরবে নতশিরে বহু দূর অবধি তাঁহাদের সঙ্গে চলিল, কেহ তাঁহাদিগকে ফিরিতে বলিল না।

ক্রমে সকলেই ঘরে ফিরিল, কিন্তু সেই কুকুরটি ফিরিল না।

পাণ্ডবেরা তথা হইতে ক্রমাগত পূর্বদিকে চলিতে চলিতে অসংখ্য গিরি নদী পার হইয়া শেষে লোহিত সাগরের* তীরে উপস্থিত হইলেন। এ পর্যন্ত গাণ্ডীব এবং অক্ষয় তূণ অর্জুনের সঙ্গেই ছিল। সেই সময়ে এক পর্বতাকার পুরুষ পাণ্ডবদিগের পথ রোধ করিয়া বলিলেন, 'হে পাণ্ডবগণ, আমি অগ্নি। কৃষ্ণ তাঁহার চক্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে অর্জুনও গাণ্ডীব পরিত্যাগ করুন। উহাতে আর কোনো প্রয়োজন নাই; উহা বরুণকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।'

একথায় অর্জুন গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণ জলে নিক্ষেপ করায় অগ্নি চলিয়া গেলে, পাণ্ডবগণ উত্তরমুখে চলিয়া শেষে লবণ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সমুদ্রের তীর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম ও তারপর ক্রমাগত পশ্চিম দিকে বহুদূর চলিয়া সমুদ্রতীর প্রাপ্ত হইলে আবার জলের উপরে দ্বারকার মঠাদির চূড়াসকল দেখা গেল।

তারপর তাঁহারা ক্রমাগত উত্তর দিকে চলিয়া, অবশেষে হিমালয়ে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সহসা দ্রৌপদীর অঙ্গ অবশ হইয়া গেল। তিনি আর চলিতে না পারিয়া সেই স্থানেই পড়িয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, দ্রৌপদী তো কখনো কোনো অপরাধ করেন নাই; তবে কেন ইহার পতন হইল?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, দ্রৌপদী আমাদের অপেক্ষা অর্জুনকে অধিক ভালোবাসিতেন, সেই পাপেই তাঁহার পতন হইয়াছে।'

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রস্থানের যাত্রীকে ফিরিয়া তাকাইতে নাই, সুতরাং তিনি দ্রৌপদীর পানে চাহিয়া দেখিলেন না।

কিছুকাল পরে সহদেবও অবশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, সহদেব অতি সুশীল ছিল এবং সর্বদাই আমাদের সেবা করিত; সে কী অপরাধে পতিত হইল?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'সর্বাপেক্ষা বিদ্বান বলিয়া সহদেবের অহংকার ছিল, তাহাতেই উহার পতন হইয়াছে।'

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির একমনে ভগবানকে ভাবিয়া চলিতে লাগিলেন, সহদেবের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না।

তারপর দ্রৌপদী ও সহদেবের শোকে অবশ হইয়া নকুল পড়িয়া গেলে ভীম পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, নকুল পরম ধার্মিক ছিল; সে কী জন্য পতিত হইল?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'নকুল ভাবিত, তাহার মতো সুন্দর লোক পৃথিবীতে নাই। তাহাতেই তাহার পতন হইয়াছে। চল উহাদের দিকে আর ফিরিয়া তাকাইবার প্রয়োজন নাই।'

---

* ইহা এখনকার লোহিত সাগর নহে, বোধহয় ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম ঐরূপ ছিল।

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির পিছনে ফিরিয়া না চাহিয়া একমনে পথ চলিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে দ্রৌপদী, সহদেব আর নকুলের জন্য শোক করিতে করিতে অর্জুনও পড়িয়া গেলেন। তাহাতে ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, মহাত্মা অর্জুন হাস্যচ্ছলেও কদাচ মিথ্যা কথা বলে নাই ; তাহার কেন পতন হইল?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'অর্জুন অহংকারপূর্বক বলিয়াছিল যে, সে এক দিনেই শত্রু সংহার করিতে পারিবে কিন্তু তাহা পারে নাই। সে অন্য বীরগণকে তুচ্ছ করিত। এইজন্যই তাহাকে পড়িতে হইল।'

এই বলিয়া যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্তে ভীম আর সেই কুকুরকে লইয়া চলিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে ভীমেরও শরীর অবশ হইয়া গেল। তিনি ভূপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, আমি আপনার প্রিয়পাত্র ; আমার কী অপরাধ হইয়াছিল?' ,

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'তুমি অন্যকে না দিয়া নিজে অপরিমিত আহার করিতে, আর তোমার তুল্য বলবান কেহ নাই বলিয়া অহংকার করিতে। ইহাই তোমার অপরাধ।'

এই বলিয়া ভীমের দিকেও না চাহিয়া যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্তে পথ চলিতে লাগিলেন। সেই কুকুর তখনো তাঁহার সঙ্গে ছিল। অনন্তর যুধিষ্ঠির আর অল্প দূর গমন করিলেই ইন্দ্র উজ্জ্বল রথে চড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'এই রথে উঠ, তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছি।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমার দ্রৌপদী এবং প্রিয় ভাইসকল পথে পড়িয়া আছে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমার স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা নাই।'

তাহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, উহারা তোমার পূর্বেই স্বর্গে গিয়াছে, উহাদের জন্য কেন দুঃখ করিতেছ? তুমি তোমার এই শরীর–সমেতই স্বর্গে গিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে।'

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'দেবরাজ, এই কুকুর আমাকে ভালোবাসিয়া এতদূর আমার সঙ্গে আসিয়াছে। ইহাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া স্বর্গে যাইব? সুতরাং দয়া করিয়া ইহাকেও আমার সঙ্গে আসিতে দিন।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'আজ তুমি স্বর্গে গিয়া দেবোচিত সুখলাভ করিবে ; আজ কেন একটা কুকুরের জন্য চিন্তিত হইতেছ? ওটা থাকুক, তুমি আইস।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'স্বর্গের সুখলাভ করিতে হইলে যদি আমার পরম ভক্ত কুকুরটিকে ত্যাগ করিতে হয়, তবে সে সুখে আমার প্রয়োজন নাই।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'যে কুকুরের সঙ্গে বাস করে সে স্বর্গে যাইতে পারে না সুতরাং শীঘ্র ওটাকে পরিত্যাগ কর।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'ও আমাকে ভালোবাসে ; সুতরাং আমি নিজের সুখের জন্য উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।'

ইন্দ্র বলিলেন, 'তুমি দ্রৌপদীকে আর তোমার ভাইদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, আর একটা কুকুরকে ছাড়িতে পারিবে না?'

যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমি তো উহাদিগকে পরিত্যাগ করি নাই, উহাদের মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত থাকাতে আমি কখনো উহাদিগকে ছাড়িয়া যাই নাই। মৃত্যুর পর উহাদিগকে ছাড়া না–ছাড়া আমার হাতে ছিল না, কাজেই কী করিব?'

তখন সেই কুকুর হঠাৎ তাহার পশুবেশ পরিত্যাগ পূর্বক সাক্ষাৎ ধর্মরূপে পরম স্নেহভরে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'বৎস, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই কুকুরের বেশে তোমার সঙ্গে আসিয়াছিলাম। তুমি যে তোমার ভক্ত কুকুরটির জন্য স্বর্গ ছাড়িতে প্রস্তুত হইয়াছ, ইহাতে বেশ বুঝিলাম, তোমার মতো ধার্মিক আর স্বর্গেও নাই। তুমি এই দেহেই স্বর্গে যাইতে পারিবে।'

তখন সকল দেবতারা মিলিয়া দিব্য রথে করিয়া মহানন্দে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে লইয়া গেলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র নারদ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর কেহই সশরীরে স্বর্গে আসিতে পারেন নাই। ইনিই সকল ধার্মিকের শ্রেষ্ঠ।'

নারদের কথা শেষ হইলে যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'আমার ভাইয়েরা যেখানে গিয়াছে, সেই স্থান ভালোই হউক আর মন্দই হউক, আমিও সেখানে যাইব। তাহাদিগকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে চাহি না।'

তাহা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন, 'মহারাজ, তুমি নিজ পুণ্যবলে এখানে আসিয়াছ, এইখানেই থাক। উহারা তোমার সমান পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে নাই, উহারা কেমন করিয়া আসিবে?'

যুধিষ্ঠির তথাপি বলিলেন, দ্রৌপদী আর আমার ভাইসকল সেখানে, আমি সেখানেই যাইতে চাহি। উহাদিগকে ছাড়িয়া এখানে থাকিতে কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছে না।'

স্বর্গারোহণপর্ব

যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়া দেখিলেন যে, দুর্যোধন সেখানে পরম সুখে বসিয়া আছেন কিন্তু ভীম, অর্জুন প্রভৃতি কেহই তথায় নাই। ইহাতে তিনি নিতান্ত আশ্চর্য এবং দুঃখিত হইলে নারদ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, দুর্যোধন ধর্মযুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন, আর তিনি ঘোর বিপদেও ভীত হন নাই ; এই পুণ্যেই তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে।

তখন যুধিষ্ঠির দেবতাদিগকে বলিলেন, 'হে দেবগণ, আমি তো এখানে কর্ণকে দেখিতে পাইতেছি না। যে সকল রাজা আমার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, তাঁহারাই বা এখন কোথায়? তাঁহারা কি স্বর্গে আসিতে পারেন নাই? তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি এ স্থানে কীরূপে থাকিব? কর্ণের জন্য আমার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইতেছে, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি এখানে থাকিতে পারিব না। উঁহারা যেখানে নাই সেখানে থাকিয়া আমার কী সুখ? উঁহারা যেখানে আছেন সেই স্থানই আমার স্বর্গ।'

একথায় দেবগণ বলিলেন, 'বৎস, তোমার যদি উহাদিগের নিকট যাইবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শীঘ্র সেখানে যাও। ইন্দ্র আমাদিগকে তোমার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে বলিয়াছেন, সুতরাং আমরা তাহা করিব।'

এই বলিয়া তাঁহারা একজন দেবদূতকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি শীঘ্র ইহাকে লইয়া ইহার আত্মীয়গণের সহিত দেখা করাও।'

দেবদূত তখনি যুধিষ্ঠিরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সে বড়ই ভীষণ পথ ; পাপীরা উহাতে চলা-ফেরা করে। মশা-মাছি-কীট-ভল্লুকাদিতে এই অস্থি-রক্ত-মাংসের কর্দম ও পূঁতিগন্ধে সেই ঘোর অন্ধকার পথ পরিপূর্ণ। চারিদিকে ভীষণ অগ্নি। লৌহচঞ্চু কাক ও গৃধিনীগণ দলে দলে তথায় উড়িয়া বেড়াইতেছে। পর্বতাকার সূচমুখ ভূতগণ তথায় ছুটাছুটি করিতেছে ; তাহাদের কোনোটা রক্তমাখা, কোনোটার হাত-পা কাটা, কোনোটার নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেখানকার নদীর জল আগুনের মতো গরম, গাছের পাতা ক্ষুরের মতো ধারালো। চারিদিকে লোহার কলসিতে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ভাজা হইতে হইতে পাপীরা চিৎকার করিতেছে!

কী ভয়ংকর স্থান! যুধিষ্ঠির তাহা দেখিয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, এ পথে আর কতদূর যাইতে হইবে?'

দেবদূত বলিলেন, 'মহারাজ, আপনার কষ্ট হইলে দেবতারা আপনাকে ফিরাইয়া লইতে বলিয়াছেন। সুতরাং যদি বলেন, এখান হইতে ফিরি।'

একথায় যুধিষ্ঠির সেখান হইতে ফিরিলেন, আর অমনি চারিদিক হইতে অতি কাতরস্বরে কাহারা বলিতে লাগিল, 'হে মহারাজ, দয়া করিয়া আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন! আপনার আগমনে সুন্দর বাতাস বহিয়া আমাদিগকে শীতল করিয়াছে! অনেক দিন পরে আপনাকে দেখিয়া আমাদের বড় সুখ হইতেছে, আপনি দয়া করিয়া আর একমুহূর্ত অপেক্ষা করুন।'

চারিদিক হইতে এইরূপ কাতরবাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের বড়ই দয়া হইল ; কিন্তু উহা কাহার শব্দ, কোথা হইতে আসিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন তিনি বলিলেন, 'হে দুঃখী লোকসকল, তোমরা কে? আর কী জন্য তোমরা কষ্ট পাইতেছ?'

যুধিষ্ঠির এই কথা কহিবামাত্র চারিদিক হইতে একসঙ্গে, 'আমি কর্ণ', 'আমি ভীম', 'আমি অর্জুন', 'আমি নকুল', 'আমি সহদেব', 'আমি দ্রৌপদী', 'আমরা আপনার পুত্রগণ', এইরূপে সকলে পরিচয় দিতে লাগিল। তখন যুধিষ্ঠির ভাবিলেন, 'হায়, কী কষ্ট! আমার পুণ্যবান প্রিয়তমেরা এমন কী পাপ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে এ স্থানে আসিতে হইল? আর দুষ্ট দুর্যোধনই বা এমন কী পুণ্য করিয়াছে যে, সে সবান্ধবে স্বর্গে আসিয়া সুখভোগ করিতে পাইল? এ অতি অবিচার।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির দেবদূতকে বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি যাঁহাদের দূত তাঁহাদিগকে বলুন যে, আমি এই স্থানেই থাকিলাম। আর আমি সেখানে যাইব না। আমার ভাইয়েরা আমাকে পাইয়া সুখী হইয়াছে।'

দেবদূত এ সকল কথা ইন্দ্রকে জানাইলে দেবতারা সকলে সেই ভয়ংকর স্থানে যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেখিতে দেখিতে সেখানকার সকল অন্ধকার, দুর্গন্ধ এবং ভয় দূর হইয়া সে স্থান স্বর্গের ন্যায়, সুন্দর হইয়া গেল।

তারপর ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'মহারাজ, দেবতারা তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর তোমাকে কষ্ট পাইতে হবে না ; তোমার পুণ্যের বলে সর্বাপেক্ষা উচ্চ ফল লাভ হইয়াছে। নরক দেখিতে হইল বলিয়া তুমি বিরক্ত হইও না। সকল রাজাকেই একবার নরক দেখিতে হয়। পাপ পুণ্য সকলেরই থাকে। যাহার পাপ অধিক, সে আগে অল্পকাল স্বর্গে থাকিয়া পরে নরক ভোগ করে। যাহার পুণ্য অধিক, সে আগে নরকে থাকিয়া শেষে স্বর্গ ভোগ করে। এইজন্যই তোমাকে আগে নরক দেখাইয়াছি। তুমি যে অশ্বত্থামা বধের কথা বলিয়া দ্রোণকে ফঁকি দিয়াছিলে, সেই পাপে তোমাকে নরক দেখিতে হইল। এরূপ অল্প অল্প পাপ ভীম, অর্জুন, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেরই ছিল ; তাই সকলকেই কিছু কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছে। কিন্তু এখন আর তাহাদের কোনো কষ্ট নাই ; তাহারা সকলেই স্বর্গে গিয়াছে। তোমার পথের রাজাদেরও সকলেরই স্বর্গলাভ হইয়াছে। এখন তুমি শোক পরিত্যাগপূর্বক আমার সঙ্গে আইস ; সকলকেই দেখিয়া সুখী হইবে। ঐ দেখ দেবনদী মন্দাকিনী বহিয়া যাইতেছে, উহার জলে স্নান করিলে আর তোমার শোক-তাপ-হিংসা-ক্রোধ প্রভৃতি কিছুই থাকিবে না।'

সকলের শেষে ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, 'বৎস, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। বার বার তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, তোমার তুল্য ধার্মিক আর নাই। তুমি তোমার ভাইদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গভোগ করিতে চাহ নাই, ইহাতে তোমার মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখন তুমি আমার সঙ্গে ঐ মন্দাকিনীর পবিত্র জলে স্নান কর।'

মন্দাকিনীর জলে স্নান করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের মানুষ-দেহ দূর হইয়া দেবতুল্য অপরূপ উজ্জ্বল মূর্তি দেখা দিল। তখন তিনি ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, কুন্তী, মাদ্রী, পাণ্ডু, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি আত্মীয়গণ এবং কৃষ্ণের সহিত মিলিয়া স্বর্গের অতুল আনন্দে মগ্ন হইলেন।

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র